দ্বিজেন্দ্র কাব্য-সঞ্চয়ন

দ্বিজেন্দ্র কাব্য-সঞ্চয়ন

শ্রীদিলীপকুমার রায়

ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাইভেট লিঃ
৯৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা - ৭

প্রথম প্রকাশ : ২৫শে বৈশাখ, ১৩৫২ বঙ্গাব্দ

আট টাকা



প্রচ্ছদশিল্পী : শ্রীসিদ্ধেশ্বর মিত্র

প্রকাশক : শ্রীজিতেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
৯৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৭

মুদ্রাকর : শ্রীননীমোহন সাহা, রূপশ্রী প্রেস (প্রাঃ) লিঃ
৯, এণ্টনী বাগান লেন, কলিকাতা-৯

উৎসর্গ

মহাষ্টমী
হরিকৃষ্ণ মন্দির : পুনা-৫

গোবিন্দগোপাল
স্নেহাস্পদেষু,

অনেক দিনের অনেক কথাই ফিরে ফিরে মনে আসে :
দেওঘরে সেই গান গাওয়া তোর সঙ্গে প্রতিদিন উছ্বাসে।
তোর মহাভাগ পিতৃদেবের নয়নে সেই অশ্রু ঝরা
শুনে আমাদের গান তাঁর বলা : "আহা, ভাবে-ভরা
কী মধুঝংকার! মনে হয়—স্বভাব-বৈরাগীই কেবল
কৃষ্ণকৃপায় এমন কণ্ঠ পায় ভক্তি-আবেগ-উছল!"
মনে পড়ে তাঁর মুখে সেই ভাগবতের কথা শোনা,
ধ্যানধারণার, গুরুপূজার, প্রেমের ব্যাখ্যা ও বন্দনা :
"গানের সুরের সঙ্গে যেদিন মিলবে বাঁশির ডাক উভরায়—
চিত্তকমল মেলবেই দল, মিটবে তৃষা তাঁর করুণায়।
অধরা নাথ সেধে ধরা দেন"—বলতেন তিনি হেসে—
"জ্ঞানের গরব-আঁধার ঘোচে আলোকনাথে ভালোবেসে।"
বলতেন এম্‌নি কতই কথা—শুনে পুলক জাগত প্রাণে,
আর, উজিয়ে উঠতাম সেই আমরা দুজন গানে গানে :

"মহাসিন্ধুর ওপার থেকে"···"চরণ ধ'রে আছি প'ড়ে"···
"আর কেন মা···" "পতিতোদ্ধারিণি গঙ্গে"···গাঢ় স্বরে···
"ভারত আমার, ভারত"···"ওকে গান গেয়ে যায় কেঁদে সারা"···
"গাল ভরা মা ডাকে" বাউল গাওয়া দোঁহে আত্মহারা···
"গিরিগোবর্ধন-ধারী গোকুলচারী"র প্রেমের দোলা
অবিস্মরণীয়া লীলা তান—আঁখরে ফুটিয়ে তোলা—

নেই বটে আর সেদিন—না না, তাই বা বলি কেমন ক'রে ?
বাইরে আলো নিভলে পরেও থাকে জেগে সে অন্তরে।
"কিছুই ধরায় হারায় না রে !"—গীতার ঠাকুর গেছেন ব'লে।
ঝরা পাতাও সার হ'য়ে ফল ফুলের ফসল ফুটিয়ে তোলে।
মরুক গে দার্শনিক কথা—বলছিলাম কি : সুরে তালে
তর্পণ যাঁর করতাম ভাই, আমরা দোঁহে সাঁঝ সকালে—
সেই সুরকার ভক্ত কবির কাব্য ও গান স্নেহভরে
আজকে দিতে চাই উপহার—তোর সুকুমার কমল করে।

ইতি—

স্নেহবদ্ধ দিলীপদা

সংকলকের নিবেদন

থেকে থেকে চিঠি পাই বন্ধুবান্ধবদের। তাঁরা দুঃখ করেন—দ্বিজেন্দ্রলাল যে একজন বড় কবি ছিলেন বাঙলা দেশে, আজও কাব্যরসিকদের মধ্যে সর্বজনস্বীকৃত হ'ল না! বলা বাহুল্য—এঁরা দ্বিজেন্দ্রলালের কাব্যে গভীর আনন্দ পান ব'লেই বাঙালীর মধ্যে তাঁর কবিপ্রতিভা ব্যাপকভাবে স্বীকৃত না হওয়ার দরুণ ব্যথিত হন। আমি নিজেও সময়ে সময়ে যে একটু আশ্চর্য হই নি তা নয়। কিন্তু শ্রীঅরবিন্দের সঙ্গে কাব্যের বিচার তথা কবির প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে বহু আলোচনার পরে একটু একটু ক'রে দেখতে শিখি যে প্রায় সব বড় কবির কপালেই স্বীকৃতির স্থায়ী জয়তিলক পরিয়েছে কাল। কেউ কেউ বলেন: "ভিন্নরুচির্হি লোকঃ—কাজেই কোনো কবির মহিমা সম্বন্ধেই বলা যায় না জোর ক'রে যে তাঁর কাব্যে সবাই রস পাবে।" সংশয়টা হয়ত ষোলো আনা ভিত্তিহীন নয়। আমার মনে আছে কৈশোরে "ভারতী"তে পড়েছিলাম তখনকার একটি খ্যাতনামা সমালোচকের মত যে, রবীন্দ্রনাথের মধ্যে কবিশক্তি আছে বটে কিন্তু তিনি ছন্দে কাঁচা। সমালোচক সম্ভবতঃ রবীন্দ্রনাথের মাত্রাবৃত্ত ও স্বরবৃত্ত ছন্দ পড়তে পারতেন না—কেন না সে-সময়ে মাত্রাবৃত্ত ও স্বরবৃত্ত ছন্দ কুলীন কাব্যে প্রতিষ্ঠা পায় নি। কিন্তু তার পরে কাব্যরসিকদের কান ছন্দে অনুশীলিত হবার সঙ্গে সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের অলোকসামান্য ছন্দপ্রতিভা আমাদের অন্তঃশ্রুতিকে জাগিয়ে মাত্রাবৃত্ত ও স্বরবৃত্ত ছন্দের মাধুর্যে মনকে রসিয়ে তুলেছে। মধুসূদনের অমিত্রাক্ষর সম্বন্ধেও এই কথা। তাঁর "মেঘনাথ বধ কাব্যে"র প্রবহমান অক্ষরবৃত্ত তাল পয়ার-পন্থীদের কানে দুঃসহ ঠেকত ব'লেই তাঁরা সে-সময়ে তাঁকে ছন্দে একজন পথিকৃৎ ব'লে শুধু যে চিনতে পারেন নি তাই নয়—"ছুছুন্দরী বধ কাব্য" লেখা হয়েছিল অমিত্রাক্ষরকে ব্যঙ্গ ক'রে। ইংরাজ কবিদের মধ্যেও দেখতে পাই অনেক বড় কবিই স্বীকৃত হন নি বহুদিন। জর্মনরা সগর্বেই বলে যে শেক্ষপীয়রকে তো প্রথম তাদের কাব্যকোবিদরাই আবিষ্কার করে। সেক্ষপীয়রের জীবদ্দশায় বড় কেউই তাঁর অলোকসামান্য কবিত্বের মর্মগ্রহণ করতে পারেন নি। কীট্‌সের অপরূপ কাব্য প'ড়েও সমালোচকেরা এত

নিন্দা করেছিলেন যে অভিমানী তরুণ কবির মনঃকষ্টে অকালমৃত্যু ঘটে, যাঁর জন্যে শেলি আক্ষেপ ক'রে সমালোচকদের তিরস্কার ক'রে তাঁর অপূর্ব শোক-কবিতা Adonais-এ লেখেন:—"Most musical of mourners! weep! weep again!" শেলি প্রায়ই বলতেন বাইরণের কবিত্বের পাশে তাঁর নিজের কবিতা নিষ্প্রভ মনে হয়। অথচ আজ কোথায় বাইরণ আর কোথায় শেলি! ব্লেকের কবিতা তাঁর মৃত্যুর শতাধিক বৎসর পরে সমাদৃত হয়। হাউসম্যান প্রমুখ শ্রেষ্ঠ ক্রিটিক দু' একজন অকুতোভয়ে এমন কথাও লিখেছেন যে, নিছক কবিশক্তিতে ব্লেক শেক্ষপীয়রের প্রতিস্পর্ধী। ডন্-এর (Donne) কবিতাও মাত্র হাল আমলে তার প্রাপ্য মর্যাদা পেয়েছে তাঁর তিরোধানের শতাধিক বৎসর পরে। এ রকম আরো বহু উদাহরণ দেওয়া যায়। শ্রেষ্ঠ কবিরা কেন রাতারাতি তাঁদের প্রাপ্য মর্যাদা পান না এই প্রশ্ন নিয়ে পঁচিশ বৎসর আগে শ্রীঅরবিন্দকে নানা প্রশ্ন করতাম ও তিনি দীর্ঘ পত্রে নানা গভীর ব্যাখ্যায় আমাকে সান্ত্বনা দিতেন। তাঁর শেষ সিদ্ধান্ত ছিল এই যে, বড় কবি খতিয়ে স্বীকৃত না হ'য়েই পারেন না—যদিও কাব্যরসিকদের কাব্যবোধে নানা কারণে জোয়ার ভাঁটা আসে। আরো অনেক বড় কবিই প্রথমে অনাদৃত হ'য়ে পরে জয়টীকা পেয়েছেন। তাঁর এসব সারগর্ভ পত্রের পূর্ণ উদ্ধৃতি দেওয়া এ-নিবেদনে সম্ভবও নয়, তার প্রয়োজনও নেই। তাই কেবল তাঁর দু-একটি কথা উদ্ধৃত ক'রেই ক্ষান্ত হব। একটি চিঠিতে তিনি লিখেছিলেন:

"This is the only thing one can do—especially when one is attempting a new creation—to go on with the work with such light and power as is given to you and leave the value of the work to be determined by the future. Contemporary judgments we know to be unreliable; there are only two judges whose verdict cannot be disputed: the world and time......in Tagore's phrase it is the universal man, *Visva Manava*......that fixes the value of its own works......finally, *whatever has real value in its own kind settles itself and finds its just place in the durable judgment of the world.*"

এর ভাগ্য এই যে, মানুষের রুচি অনেক ওঠাপড়ার পরে তবে একটা স্থায়ী রসবোধের নিরিখে পৌঁছয়—সুন্দর যাকে বলি তার সম্বন্ধে নানা মুনির নানা মত হ'লেও একটু একটু ক'রে দৃষ্টির আবিলতা কাটলে তবেই মানুষ অর্জন করে সেই অন্তর্দৃষ্টি যার প্রসাদে সে দেখতে পায়—কোথাকার জল থিতিয়ে কোথায় দাঁড়ালো।

শ্রীঅরবিন্দের গভীর কাব্যবোধের নির্দেশে ভাবতে ভাবতে শেষে আমি এই নৈশ্চিত্যে পৌঁছই—যে কথা ক্রোচে বলেছেন বড় গলা ক'রে—যে, সংসারে অসম্ভব একটি জিনিস—বড় প্রতিভার শতদল ফুটল অথচ তার মধুকর জুটল না কোনোদিনই।

এই প্রত্যয়ের তাগিদেই আমি পিতৃদেবের এই কাব্য-সঞ্চয়ন আজ পেশ করছি বাঙলার কাব্যরসিকদের কাছে। এই সঙ্গে বাঙলার কয়েকটি মনীষীর প্রবুদ্ধ প্রশস্তি জুড়ে দিলাম এই জন্যে যে, শ্রীঅরবিন্দের ভাষায়—

"the critic can help to open the mind to the kinds of beauty he himself sees and not only to discover but to appreciate at their full value certain elements that make them beautiful or give them what is most characteristic in their peculiar beauty."

এখানে একটা কথা বলব একটু ভয়ে ভয়েই। কথাটা এই যে, আমাদের দেশে বঙ্কিমচন্দ্র রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ দু' চারজন অসামান্য প্রতিভাধরের লেখায় ছাড়া যে যথার্থ সমালোচকের অন্তর্দৃষ্টি ও সহজবোধ ফুটে উঠতে দেখা যায় না, তার কারণ খুব দুর্বোধ্য নয়। আমাদের দেশে কবি ও কাব্যবোদ্ধা উভয়েই এখনো পর্যন্ত খানিকটা অনাদৃতই বলব—অর্থাৎ য়ুরোপের তুলনায়। তাই আমাদের দেশে এখনো পুরোপুরি স্বীকৃত হয়নি যে প্রকৃত কবির প্রতি কাব্যরসিকদের একটা ঋণ আছে; নৈলে দ্বিজেন্দ্রলাল অনেক আগেই বাঙলার একজন বড় কবি ব'লে প্রতিষ্ঠা পেতেন—যাকে ইংরাজিতে বলে major poet. আমার মনে আছে বছর পনর আগে একবার পিতৃদেবের এক স্মৃতিসভায় বহু মনীষীই পর পর তাঁর প্রতিভার তর্পণ করলেন তাঁকে হাস্যরসিক, দেশপ্রেমিক ও নাট্যকার উপাধি দিয়ে। কিন্তু

একজনও বললেন না—এক শরৎচন্দ্র ছাড়া—যে তিনি ছিলেন আরো বড় কবি, সুরকার ও গীতিকার। অতুলপ্রসাদের "বঙ্গভাষা" গানে একটি লাইনে আছে "হেম মধু বঙ্কিম ও নবীন" কিন্তু দ্বিজেন্দ্রলাল নির্বাসিত—যেখানে এমন কি হেমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্রও অভ্যর্থিত! রসবিচারে এমন ঠিকে-ভুল হ'তেই পারত না যদি কাব্যবোধে একটা প্রবুদ্ধ লোকমত আমাদের দেশে গ'ড়ে উঠত। দ্বিজেন্দ্রলালের প্রতি আমার পুত্রসুলভ স্বাভাবিক পক্ষপাত বশেই আমি তাঁকে প্রধান কবিদের অন্যতম মনে করি ও সেইজন্যেই আর পাঁচজনে আমার মতে সায় না দিলে দুঃখ পাই—কোনো কোনো ক্রিটিকের এ-কটাক্ষে আমি আঘাত পাই না একটুও, কারণ আমার এ-ধারণা যে অমূলক নয় তার প্রমাণ আছে—যথা রবীন্দ্রনাথের উক্তি (যা তিনি লিখেছিলেন শ্রীদেবকুমার রায় চৌধুরীর দ্বিজেন্দ্রজীবনীর ভূমিকায়): "দ্বিজেন্দ্রলাল যখন বাংলার পাঠক সাধারণের নিকট পরিচিত ছিলেন না তখন হইতেই তাঁহার কবিত্বে আমি গভীর আনন্দ পাইয়াছি এবং তাঁহার প্রতিভার মহিমা স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত হই নাই।…দ্বিজেন্দ্রলালের সম্বন্ধে আমার যে-পরিচয় স্মরণ করিয়া রাখিবার যোগ্য তাহা এই যে, আমি অন্তরের সহিত তাঁহার প্রতিভাকে শ্রদ্ধা করিয়াছি এবং আমার লেখায় বা আচরণে কখনো তাঁহার প্রতি অশ্রদ্ধা প্রকাশ করি নাই।"

কিন্তু প্রমাণ জড়ো করার প্রয়াস একদিক দিয়ে নিরর্থক, কেন না কোনো কবির কাব্যই বাইরের নজিরে কি সুপারিশে প্রতিষ্ঠা পায় না। বটে, কিন্তু সেই সঙ্গে আরো একটা কথা বলতেই হবে যে, বড় কবি, বড় সমালোচক, বড় মনীষীর রসবোধ আমাদের রসবোধকে চেতিয়ে তুলতে পারে যদি আমরা সাহিত্যকে সত্যি ভালোবাসতে শিখি। সেইজন্যেই বাংলাদেশের কতিপয় রসজ্ঞের প্রশস্তি এ-সংকলনের গোড়ায় সন্নিবিষ্ট করেছি প্রাণশক্তির মতন রসবোধও সংক্রামক ব'লে।

নিবেদনের বহর বাড়াব না দ্বিজেন্দ্রলালের কাব্যের গুণগান ক'রে—আরো এইজন্যে যে তাঁর কবিত্বের তর্পণ নিরপেক্ষ সমালোচকদের মুখেই বেশি শোভন। আমি শুধু শেষে আর একটি কথা ব'লেই ক্ষান্ত হব—যে-কথা আমার "স্মৃতিচারণ"-এ নানা ভাবেই ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বলেছি। কথাটা

কিছু নতুন নয়—তবে সমালোচকেরা প্রায়ই ভুলে যান ব'লেই পুনরুক্তি করতে হচ্ছে—যে, কোনো সাহিত্যিককে বিচার করতে হ'লে তাঁর শ্রেষ্ঠ সৃষ্টির জন্যেই তাঁকে বরণমালা দেওয়া বাঞ্ছনীয়। ইংরাজিতে বলে: "The greatness of a man is to be judged by the greatness of his greatest moments": একথা কবির সম্বন্ধেও ঘটে। তাই দ্বিজেন্দ্রলালের শ্রেষ্ঠ কবিতা সংকলনের এ-প্রয়াস।

এ কবিতাগুলির শ্রেণী বিভাগ করা হয়েছে এই ভাবে:

(১) দ্বিজেন্দ্রলালের শ্রেষ্ঠ হাসির গান

(২) " " ব্যঙ্গ কবিতা—আষাঢ়ে থেকে

(৩) " " কবিতা—মন্দ্র, আলেখ্য ও ত্রিবেণী থেকে

(৪) " " গান

(৫) সর্বশেষে সন্নিবিষ্ট করা হয়েছে তাঁর কবিত্বময় অমিত্রাক্ষর ওরফে নাট্যকাব্যের কয়েকটি দৃশ্য।

গানগুলি এইভাবে সাজানো হয়েছে:

(ক) পূজা (গ) প্রেম

(খ) দেশ (ঘ) প্রকৃতি

(ঙ) বিবিধ

এ সংকলন থেকে আশা করি একটি সত্য কাব্যরসিকদের কাছে সুস্পষ্ট হ'য়ে উঠবে—অর্থাৎ দ্বিজেন্দ্রলালের কবিশক্তির বিস্ময়কর বহুমুখিতা, স্বকীয়তা ও ওজঃশক্তি। বিশ্বকাব্য-সাহিত্যেও খুব কম কবির মধ্যেই এত বৈচিত্র্য ও গুণ-সমাবেশ দেখা যায়।

না, শেষের পরেও একটু পুনশ্চ আছে।

রবীন্দ্রনাথের একটি প্রায়োক্তি আজ সর্ববিদিত:—তিনি বলতেন—তাঁর শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি তাঁর গান। একথা দ্বিজেন্দ্রলাল সম্বন্ধেও সমান খাটে একই কারণে: দুজনেই স্বভাবে কবি আর রক্তে বাঙালী ছিলেন ব'লে। কথাটা একটু পরিষ্কার ক'রে বলি।

য়ুরোপে গানের যথেষ্ট প্রতিপত্তি থাকলেও সে দেশের আবহাওয়ায় কবিতার ফুলই বেশি সহজে ফোটে ও সমাদৃত হয়। এই জন্যেই য়ুরোপে গান

কখনো কোনো কবিরই শ্রেষ্ঠ কীর্তি ব'লে গণ্য হয় নি, কেন না য়ুরোপে সাহিত্যিক প্রতিভা (অন্ততঃ আজ পর্যন্ত) গানে নিজেকে তেমন খুঁজে পায় নি, যেমন পেয়েছে কাব্যে, নাটকে, প্রবন্ধে, সমালোচনায় ও উপন্যাসে। বাংলা দেশের স্বধর্ম অন্য। তাই সারা বিশ্বজগতে গানে বাঙলাদেশ অপ্রতিদ্বন্দ্বী বললে একটুও অত্যুক্তি হবে না। বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, জ্ঞানদাস, গোবিন্দ, দাস, শশিশেখর···প্রমুখ বরেণ্য বৈষ্ণব কবি থেকে সুরু ক'রে রামপ্রসাদ, কমলাকান্ত, নরেশচন্দ্র···বর্গীয় শক্তিসাধকেরা বাংলা গানের প্রাণশক্তিকে যে কত ধারায়ই উৎসারিত ক'রে এসেছেন ভাবতে বিস্মিত না হয়েই পারা যায় না। কত কীর্তন, কত বাউল, ভাটিয়ালি, সারি, গম্ভীরা, আগমনী, নিধুবাবুর টপ্পা, দাশরথি রায়ের পাঁচালি আরো কত রকমের নাম-না-জানা গান—এমন কি বৈঠকি গানও—যে সুজলা সুফলা বাংলাদেশের মাটিকে তাদের নিত্য-সিঞ্চনে উর্বর ক'রে রেখেছে তার ইয়ত্তা নেই। এই ঐতিহ্য সমৃদ্ধির জের টেনেই এ-যুগে বাঙলা গান বাংলার আধুনিক রেনেসাঁসে কবিত্বের চরম শিখরে উত্তীর্ণ হয়েছে রবীন্দ্রনাথ দ্বিজেন্দ্রলাল ও অতুলপ্রসাদের গানে নবজন্ম নিয়ে। এঁদের মধ্যে গীতিকার হিসেবে কে বড় কে ছোট সে বিচার এ-নিবেদনে অবান্তর ব'লে শুধু এইটুকু ব'লেই ইতি করব (যে কথা আজ বহু সুর-গীতজ্ঞই সানন্দে স্বীকার ক'রতে আরম্ভ করেছেন) যে বাঙলা দেশে দ্বিজেন্দ্রলালের গানের মধ্যে বাঙলার স্বাভাবিক গীতি ও সুর প্রতিভার মণিকাঞ্চন সংযোগ ঘটেছে। তাই মনে হয় যে, অদূর ভবিষ্যতে তাঁর গান বাঙলার শ্রেষ্ঠ লিরিক প্রতিভার অন্যতম কীর্তিস্তম্ভ ব'লে গণ্য হবে। ইতি—

মাঘী পূর্ণিমা

শ্রীদিলীপকুমার রায়

প্রাক্‌কথন

কবিশেখর শ্রীকালিদাস রায়

দ্বিজেন্দ্রলাল এ দেশে নাট্যকার ব'লেই প্রধানতঃ সর্বজনবিদিত। নাট্যকার হিসাবে যে তিনি অনন্যসাধারণ সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। বাঙলার নাট্যকলা-জগতে তিনি যুগান্তর এনেছিলেন। সে-কালের অধিকাংশ নাটকই ছিল অর্ধসৃষ্ট, বাকি অর্ধেকের যোগান দিত অভিনেতা অভিনেত্রীরা। নাট্যকার ও নটনটীদের সমবেত প্রয়াসে নাটকগুলি পূর্ণসৃষ্টিতে পরিণত হ'ত—এগুলির মধ্যে নাট্য-সাহিত্য ও অভিনয়বিদ্যা এ-দুই-এর কার কতটা দান তা ধরা যেত না। রঙ্গমঞ্চে ঐ নাটকগুলির অভিনয় দেখতে ভালোই লাগত ; কিন্তু প'ড়ে তেমন রস পাওয়া যেত না, কারণ সেগুলি রসোত্তীর্ণ সাহিত্য হয়ে উঠত না। দ্বিজেন্দ্রলালের নাটকগুলি পূর্ণ সৃষ্টি, শেকস্‌পীয়র বা কালিদাসের নাটকের মতো।

বিনা অভিনয়ের সাহায্যেই এ-নাটকগুলি সাহিত্য-রসিকদের উপভোগ্য। এর প্রধান কারণ—নাটকগুলি এক একখানি সরস কাব্য। আর একটি কারণ—নাটকগুলির মধ্যে সংস্কৃত নাটকের মধ্যে খচিত কবিত্বঘন শ্লোকাবলীর মতো গানগুলি সুরগৌরবে এবং কবিত্বমাধুর্যে সমৃদ্ধ। উৎকৃষ্ট অভিনয়ের দ্বারা এই নাটকগুলির যে-উৎকর্ষ সাধিত হয় তাহাতে রঙের উপর রসান চড়ানো হয়, সোনায় সোহাগা হয়।

কবি দ্বিজেন্দ্রলাল সম্বন্ধে বলতে গেলে তাঁর নাটকের কথাও বলতে হয় ব'লেই এ-কথার উল্লেখ করলাম। নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল যে কত বড় কবি ছিলেন তা সাধারণ লোকে ভেবেও দেখে নি। তাঁর গানগুলির মধ্যে এবং কবিতাগুলির মধ্যে যে অনন্যসাধারণ কবিত্বরস ওতঃপ্রোত ভাবে নিহিত আছে তা বিশ্লেষণ ক'রেও কেউ দেখায়নি।

বহুদিন পূর্বে রবীন্দ্রনাথ তাঁর আর্যগাথা, আষাঢ়ে ও মন্দ্রের সমালোচনা করেছিলেন। সে-সমালোচনা তাঁর "আধুনিক সাহিত্য" গ্রন্থে উপনিবদ্ধ থাকলেও খুব কম পাঠকেরই চোখে পড়েছে। রবীন্দ্রনাথ 'আষাঢ়ে' কাব্য-গ্রন্থের ছন্দ সম্বন্ধে বিশেষ ক'রে আলোচনা করেছেন। কবি নিজেই আষাঢ়ের

ভূমিকায় বলেছেন: "এ কবিতাগুলির ছন্দোবন্ধ অতীব শিথিল, ইহাকে সমিল গদ্য নামেই অভিহিত করা সংগত।" বলা বাহুল্য এ-ছন্দ কৌতুকরসের সম্পূর্ণ উপযোগী দ্বিজেন্দ্রলালের প্রবর্তিত একটি নতুন ছন্দ। পরে হাস্যরসের এই ধরনের কবিতা আর কেউ লেখেন নি—কাজেই এ ছন্দের বিনিয়োগও হয়নি। অনুকরণের দ্বারাও এর মর্যাদাহানি হয়নি এবং এ ছন্দ তাঁর অনন্য-সাধারণ বাহন। হাস্যরসের কবিতা আবৃত্তি করতে হ'লে যে অঙ্গ-ভঙ্গীর প্রয়োজন হয় সেই অঙ্গ-ভঙ্গীটা যেন কবিতার ছন্দেরই অঙ্গীভূত হয়ে আছে। গায়ক বা আবৃত্তি-কারক তদনুযায়ী অঙ্গ-ভঙ্গী করতে স্বভাবতই বাধ্য হয়। তার ফলে আবৃত্তিটা একটা সর্বাঙ্গসুন্দর সৃষ্টি হয়ে ওঠে।

রবীন্দ্রনাথ 'মন্দ্রের' মূল সুরটাই ধরিয়ে দিয়েছেন। যথাস্থলে মন্দ্র সম্বন্ধে আলোচনা করা যাবে।

দ্বিজেন্দ্রলাল কবিতা লিখেছেন নতুন টেকনিকে। এ-টেকনিক তাঁর সম্পূর্ণ স্বকীয়। এ-টেকনিক রবীন্দ্রপ্রভাবিত যুগে দ্বিজেন্দ্রলালকে স্বাতন্ত্র্য দান করেছে। তাঁর ভাষাও স্বকীয়। তাঁর দৃষ্টিভঙ্গীও অনন্যতন্ত্র।

দ্বিজেন্দ্রলালকে কোনো কবির শিষ্য বা অনুবর্তী বলা যায় না। তাঁর অনুবর্তী হয়ে হাসির গান কেউ কেউ লিখেছেন। কিন্তু অন্য রসের গান বা কবিতা কেউ লেখেননি। কাজেই এ-পথে তাঁর শিষ্য-পরম্পরা নেই। তাঁর সমসাময়িক কবিদেরও কোন প্রভাব তাঁর রচনায় পড়ে নি। কাজেই তাঁর সম্বন্ধে বলা যায় যে তিনি ছিলেন "Like a star when only one is shining in the sky" কিংবা "He was like a star that dwelt apart."

আত্মচরিত্র, মানসপ্রকৃতি, কাব্যাদর্শ, সেকালের সামাজিক চরিত্র ও আবেষ্টনী সম্বন্ধে দ্বিজেন্দ্রলালের দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্গে তাঁর কবিতার গভীর সম্পর্ক আছে ব'লে এ-সম্পর্কে কিছু বলতে হয়। দ্বিজেন্দ্রলাল ছিলেন তেজস্বী, সৎসাহসী, মার্জিতরুচি, অকপট, দেশভক্ত, স্বজাতিবৎসল, ভারতীয় সংস্কৃতিতে শ্রদ্ধাবান্, আত্মস্বাতন্ত্র্যবাদী এবং ঋজু মেরুদণ্ডের মানুষ। তিনি কোনোরূপ ভণ্ডামি, ন্যাকামি, পুরুষের মেয়েলি ভাব, কাপুরুষতা, ইতরতা ইত্যাদি সহ্য করতে পারতেন না।

তৎকালীন সমাজে চারিদিকে কাপট্য, অসারল্য, অনাচার, অসংগতি, দাম্ভিকতা, ইতরতা, বাক্যের সহিত আচরণের অসামঞ্জস্য,পরাণুচিকীর্ষা, স্বার্থের জন্য মনুষ্যত্ব বিসর্জন ইত্যাদির অজস্র নিদর্শন দেখে তাঁর মনে যেমন বিতৃষ্ণার ভাব জেগেছিল, তেমনি তাঁর দেশভক্ত মনে ক্ষোভ ও আক্ষেপ জন্মেছিল। তিনি সমাজ-সংস্কারকের ব্রত গ্রহণ করলে এসব নিয়ে প্রবন্ধ লিখতেন, সভায় সভায় বক্তৃতা ক'রে বেড়াতেন, নানা সংঘ সমিতি গড়তেন। তিনি জন্মসিদ্ধ কবি, তাই কবিতা লিখেছেন। গদ্যের গদা হাতে তিনি অভিযান করেন নি, গানের বাণ নিক্ষেপ করতে করতেই তাঁর প্রথম অসত্যের বিরুদ্ধে অভিযান। রঙ্গাত্মক মনোভাব তাঁর সহজাত। নদীয়া অঞ্চলের রঙ্গরসাত্মক ঐতিহ্যের সঙ্গে এর সম্পর্ক আছে। এই মনোভাবের সঙ্গে অসত্যের প্রতি বিতৃষ্ণাজাত ব্যঙ্গাত্মক মনোভাবের মিলনে তাঁর কবি-মনের পটভূমিকা রচিত হয়েছিল। তার ফলে বহু লিরিক জাতীয় নানা রসের কবিতাতেও রঙ্গব্যঙ্গের ছায়াপাত হয়েছে। বহু কারুণ্যরসের কবিতার মধ্যেও রঙ্গ-ব্যঙ্গের ভাব অনুস্যূত হয়েছে—যেমন রাজপুত জাতির পরাধীনতার গভীর বেদনাও রঙ্গ-ব্যঙ্গের মাধ্যমে আত্মপ্রকাশ করেছে। রঙ্গ-ব্যঙ্গের রচনা ছাড়া অন্য কবিতার রসাদর্শ সম্বন্ধে তাঁর ধারণা তাঁরই ভাষায় বলি—

> কাব্য নয়ক' ছন্দোবদ্ধ মিষ্ট শব্দের কথার হার,
> কাব্যে কবির হৃদয় নেই যার তাহার কাব্য শব্দসার।
> যেথায় ভাস্বর যেথায় মূর্ত ঝঙ্কারিত কবির প্রাণ,
> উৎসারিত মহাপ্রীতি—তাহাই কাব্য তাহাই গান।

অর্থাৎ যে-রচনায় কবির হৃদয়ের আতপ্ত স্পর্শ নেই, কবির প্রাণ যাতে পরিমূর্ত হয়নি, প্রেম যাতে উৎসারিত হয়নি, তা কবিতা নয়। বলা বাহুল্য হৃদয়-মাধুর্যবর্জিত কবিতা তিনি লিখতেন না; কোনো তত্ত্ব প্রকাশ করার বা কোনো তত্ত্বের ইঙ্গিত দেওয়ার জন্যও তিনি কবিতা লেখেন নি, তাঁর কবিতা তথ্যের ফিরিস্তিও নয়। তাই তাঁর কবিতা হয়েছে হৃদয়গম্য, কেবলমাত্র বুদ্ধিগম্য নয়। তাঁর ভাব বুঝতে বুদ্ধিকে গলদ্ঘর্ম হতে হয় না। মনন-বিলাসের নামে তিনি প্রহেলিকা রচনা করতেন না। Emotional

sentiment-(ভাবাবেগ) সঞ্চারই ছিল তাঁর লক্ষ্য, Intellectual sentiment—নিছক বুদ্ধিগত ভাব—তাঁর কবিতার লক্ষ্য ছিল না।

তাঁর কবিতায় লক্ষ্যার্থ বা ব্যঙ্গার্থ খুঁজতে হয় না। কবিতার উপভোগে বুদ্ধির ঘর্মপাত মর্মরসের হানিকর হয় ব'লেই তাঁর ধারণা ছিল। কবিতার বাচ্যার্থ যেখানে অস্পষ্ট, তাকে তিনি প্রহেলিকা মনে করতেন। তাই ব'লে তাঁর কবিতার বাচ্যার্থের ফাঁকে ফাঁকে ব্যঞ্জনার অভাব নেই। কিন্তু সে-ব্যঞ্জনা হৃদয়াতীত নয়। তিনি কবিতায় কুহেলিকা সৃষ্টি করবার পক্ষপাতী ছিলেন না।—তাঁর সব লেখাই প্রকাশ্য দিনের আলোকে উদ্ভাসিত। তিনি কবিতায় শুধু যে আবিলতা, দুর্বোধ্যতা, অস্বচ্ছতা ও অস্পষ্টতাকে দোষ মনে করতেন তাই নয়, প্রসাদগুণবর্জিত হৃদয়াবেগহীন রচনাকে তিনি কবিতা বলতেই রাজী ছিলেন না। তাঁর বিশ্বাস ছিল—দুর্বোধ্যতা কবির ভাব প্রকাশেরই অক্ষমতা, কিংবা কবি ইচ্ছা ক'রে গহনতার মায়া সৃষ্টি করবার জন্য কবিতাকে অস্বচ্ছ আবিল ক'রে রাখেন। দুর্বোধ্য কবিতাতে পাঠক যদি রস পায়, তা হলে বুঝতে হবে পাঠক নিজের মস্তিষ্ক ও হৃদয় থেকে অনেক কিছুর যোগান দিয়ে সে কবিতাকে পুনর্বিরচন ক'রে নিয়েছে। কাজেই সে-কবিতায় কবির চেয়ে পাঠকের দানই বেশি। কবিতার পুনর্বিরচিত রূপ হবে এক এক পাঠকের কাছে এক এক রকম। কাজেই প্রত্যেক পাঠকেরই কাছে তা হবে স্বতন্ত্র সৃষ্টি।

আলেখ্যের ভূমিকাতে তিনি বলেছেন: "এ পদ্যগুলি পদ্য না হোক, প্রহেলিকা নয়, এ গ্রন্থের কোনো কবিতা প'ড়ে তার মানে দশজন দশরকম বের ক'রে তাদের নিজেদের মধ্যে বিবাদ করার প্রয়োজন হবে না। কবিতাগুলির মানে যদি থাকে তবে এক রকমই আছে। কোনো কবিতার দুই একটি শ্লোক যদি বোঝা না যায়, সেখানে আমি বলবো যে সেটা আমার ভাষার দোষ, বৃহৎ ভাব দাবি করবো না। পরিশেষে এও ব'লে রাখি যে, আমার বর্ণিত বিষয়গুলি পার্থিব। আমি যে-ভাবের ধারণা করতে পারি, সেই ভাব সম্বন্ধেই লিখি—আর আমি নিজের কবিতার মানে নিজে বেশ বুঝতে পারি।" শেষ বাক্যটি বিশেষ অর্থগর্ভ।

এতে দ্বিজেন্দ্রলাল বলতে চেয়েছেন তিনি বাস্তববাদী, বাস্তব রসই তাঁর

কবিতার প্রাণ, যে-ভাব তাঁর নিজের কাছেই স্পষ্ট নয়—তা নিয়ে তিনি কবিতা লেখেন না—তিনি symbolic, mystic এমন কি allegorical কবিতাও লেখেন না। কী তিনি দিতে পেরেছেন তাই আমাদের বিচার করতে হবে। কি কি তাঁর লেখায় নেই, কি কি দেননি বা দিতে পারেন নি তা বিচার্য নয়।

দ্বিজেন্দ্রলালের মন্দ্র ও আলেখ্যের কবিতাগুলি যেন পদ্যাত্মক ভাষার ছন্দে আত্মগোপন ক'রে বলতে চেয়েছে —"না, না, তোমরা যাকে কবিতা বলো আমরা তা নই, আমরা কবিচিত্তের অবলুণ্ঠিত আবেগোচ্ছ্বাস মাত্র, দেখ আমাদের মধ্যে ছন্দের কারুকার্য নেই, ললিত পদবিন্যাস নেই, আলঙ্কারিক চাতুর্য নেই, মুক্তাফলের মতো এইগুলিতে তারল্য, লাবণ্য, মসৃণতা বা চিক্কণতা নেই।"

আপাতদৃষ্টিতে তাই মনে হ'লেও আসল রসজ্ঞের দৃষ্টিকে ঐ সকল কবিতার রসাঢ্যতা এড়িয়ে যেতে পারে না। কবিতাগুলির বহিরঙ্গ আপেলের মতো নয় বটে, কিন্তু আতা বা কাঁঠালের মতো তাদের রসগর্ভতা ধরা প'ড়ে যায়ই রসিকের কাছে। উপমা দিয়ে বলতে গেলে বলতে হয়—এ-কবিতাগুলি যেন শুচি শান্ত হিন্দু সংসারের মোটা রেশমী সূতায় বোনা লালপেড়ে শাড়ী-পরা, নিরাভরণ প্রৌঢ়া গৌরাঙ্গী গৃহলক্ষ্মী।

এই কবিতাগুলির মধ্যে একটা স্বাভাবিক আরণ্য-শ্রীর গরিমা আছে—উদ্যানিক পারিপাট্য বা শৃঙ্খলা নেই। ছন্দে, পদবিন্যাসে, মিত্রাক্ষরে, যতি-সংস্থানে—কোথাও বিন্দুমাত্র কৃত্রিম প্রয়াস নেই—সর্বত্রই যেন একটা অবলীলার ক্রিয়া। Decorative art বা অলংকৃত শিল্পের নিদর্শন এদের মধ্যে পাওয়া যায় না—Gothic art-এর উদাত্ত মহিমায় এরা স্বয়ংসিদ্ধ। কবিচিত্তের দুর্দম দুর্বার গতিবেগ রচনার মধ্য দিয়ে এমন দ্রুত সঞ্চরণ ক'রে চলেছে যে মনে হয় আশে-পাশে চাইবার, এমন কি পায়ের তলের পথের মাটির দিকে চাইবারও তার অবসর নেই।

কবিপ্রতিভার এমনি গভীর আত্মপ্রত্যয় ও নিঃসঙ্কোচ নিঃশঙ্কতা—যে, রস হতে রসান্তরে, ভাব হতে ভাবান্তরে, চিত্র হতে চিত্রান্তরে প্রয়াণে তার বিন্দুমাত্র কুণ্ঠা নেই। তাই একই কবিতায় বিবিধ রস ও ভাবের সমাবেশ হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথ বঙ্কিমচন্দ্রের হাস্যরস সম্বন্ধে বলেছেন—

"তিনিই প্রথম দৃষ্টান্তের দ্বারা প্রমাণ করাইয়া দেন যে এই হাস্যজ্যোতির সংস্পর্শে কোনো বিষয়ের গভীরতার গৌরব হ্রাস পায় না, কেবল তাহার সৌন্দর্য ও রমণীয়তার বৃদ্ধি হয়, তাহার সর্বাংশের প্রাণগতি যেন সুস্পষ্টরূপে দীপ্যমান্ হইয়া উঠে।"

বঙ্কিমচন্দ্র গদ্যে যা করেছেন, দ্বিজেন্দ্রলাল কবিতাতে তাই করেছেন। গুরুগম্ভীর বিষয়ের সঙ্গে ভাঁড়ামি চলে না, কিন্তু, নির্মল শুভ্র হাস্যরসের সমাবেশে বিষয়বস্তুর গুরুত্বের হানি হয় না।

"নবদ্বীপ" কবিতায় কবি নবদ্বীপের অতীত গৌরব ও মহিমার কীর্তন করেছেন বাগ্মিতার সহিত। সেই নবদ্বীপের আজ নৈতিক ও আধ্যাত্মিক অধঃপতন হয়েছে। কবি দুই চিত্র পাশাপাশি দেখিয়েছেন একই কবিতায়। অধঃপতিত অবস্থার বর্ণনায় রঙ্গরসের আমেজ আছে। তাতে নবদ্বীপের অসামান্য মহিমা বিন্দুমাত্র ক্ষুণ্ণ হয় নি।

সমুদ্রের সঙ্গে কবি রসালাপ করেছেন অনেকক্ষণ, তারপর তাঁর খেয়াল হয়েছে "বাপরে! কার সঙ্গে রসালাপ করছি।" তারপর কবি বলেছেন—

কিম্বা তুমি বুঝি কোন যোগিবর দূরে একমনা,
বিপুল ব্রহ্মাণ্ডে, কোন মহাযোগ করিছ সাধনা,
ধরি' তব বিশাল হৃদয়ে আকাশের গাঢ়তম
ঘননীল ছায়া খানি যোগিচিত্তে মোক্ষ-আশা সম
কভু তুমি ধ্যানরত মুদ্রিত নয়ন স্থির প্রভু,
সমুত্থিত মুখে তব মেঘমন্দ্রে বেদগান কভু!

এ যেন ভারতচন্দ্রের মতো মহাদেবকে নিয়ে রঙ্গরসিকতা ক'রে তার পরেই পরব্রহ্ম ব'লে স্তবগান—যেমন সুন্দর, তেমনি সুসঙ্গত।

'সুখমৃত্যু' কবিতাটির সুরু হয়েছে রঙ্গরসিকতায়—তারপর দিবাশেষের আলোক যেমন ধীরে ধীরে মিলিয়ে গিয়ে গোধূলির আলো-আঁধারির সৃষ্টি করে তেমনি ক'রে রঙ্গরসিকতা ধীরে ধীরে গভীর সত্যের উপলব্ধিতে পরিণত হয়েছে। কবির যাহা 'পরিহাস-বিজল্পিত' ছিল তা 'পরমার্থতা' লাভ

করেছে শেষ পর্যন্ত। তখন কবির মুখে যাহা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক তাই ব্যক্ত হয়েছে :

আর যদি পরমেশ এ-জগতে এই শেষ
এই ক্ষুদ্র জীবনের মৃত্যুই অবধি।
যদি নাই পরলোক, তবে কে করিবে শোক
মৃত্যুর অপর পারে আমি নাই যদি ?
আর যদি আমি থাকি তাহাতেই দুঃখ বা কি ?
মৃত্যু যদি সুখশূন্য, মৃত্যু দুঃখহীন।
বিনা সুখ দুঃখ ভার একাকার নির্বিকার
নির্ভয়ে হইয়া যাব পরব্রহ্মে লীন।

আশাবাদী কবি এই পরম প্রত্যয়ের মধ্যে যেন জীব-মুক্তির আস্বাদ লাভ করেছেন।

* * * *

বাংলা দেশের কবিদের মধ্যে মাইকেল ইংরাজিতে লিখে হাত পাকিয়ে বাংলায় কবিতা লেখেন, আর দ্বিজেন্দ্রলাল আগে ইংরাজিতে সর্বাঙ্গসুন্দর কবিতা লিখে তারপর বাংলায় লেখেন। এই সংকলনে তাঁর দুটি ইংরাজি কবিতা নিদর্শনস্বরূপ তোলা হয়েছে। একটি Krishna to Radha এর বাংলা অনুবাদও সংকলনে গৃহীত হয়েছে। পাঠক লক্ষ্য করবেন ইংরাজি কবিতার ভাব কিরূপ যথাযথভাবে বাংলা অনুবাদে সঞ্চারিত—শুধু তাই নয়, ইংরাজি কবিতার ছন্দের অনুরণনও এতে পাওয়া যায়। এই কবিতায় চারটি চরণে প্রেমের অপূর্ব সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে :

প্রেম পরিণয় নয়, পার্থিব আলয় নয়
তার গৃহ প্রভাতের উজ্জ্বল আকাশে।
মানে না সে ধন মান, দূরত্বের ব্যবধান
সঙ্গীত হইয়া যায় প্রেম যাহে হাসে।

ইহার ইংরাজি রূপ এই—

Love is marriage ; and it soars above
The worldly, finds a heaven in the orient
clouds of dawn ;
Love breaks the distant social bars of wealth
and rank,
Brings near the distant souls she harmonises
all she smiles upon.

এটি ব্রজলীলার কবিতা নয়, এর আকুতি ব্রজের নন্দন ছাড়িয়ে ব্রহ্মের দিকে যায়নি—বিশ্বময় ছড়িয়ে পড়েছে।

'জীবন পথের নবীন পান্থ', 'ঘুমন্ত শিশু', 'পুত্রকন্যার বিবাদ', 'মাতৃহারা' এই চারিটি কবিতা বাৎসল্য রসের।

বাৎসল্য রসের এমন অপূর্ব অভিব্যক্তি বাঙলা দেশের কোনো কবির আছে ব'লে আমি জানি না—বৈষ্ণব-পদাবলীতেও দুর্লভ। 'জীবন পথের নবীন পান্থ' কবিতায় পিতৃস্নেহের এই বাস্তব চিত্র আমাদের কল্পনায় প্রত্যক্ষবৎ হয়ে ওঠে। কবি তাঁর বিগলিত পিতৃহৃদয়কে একেবারে ঢেলে দিয়েছেন।

ব্যতিরেক অলঙ্কারের সাহায্যে কবি শিশুর হাসির মাধুর্যের যে পরিচয় দিয়েছেন শুধু সেই কয় লাইন এখানে উৎকলিত করি :

দেখেছি সন্ধ্যায় শান্ত হৈম করে রঞ্জিত মেঘের গরিমা দীপ্ত।
দেখেছি উষায় নীল সরোবরে অমল কমল শিশির লিপ্ত।
নিদাঘে নির্মেঘ প্রভাতের ছটা বসন্তের নব শ্যামল কান্তি
বর্ষায় বিদ্যুতে দীর্ঘ ঘনঘটা শরতে চন্দ্রের স্বপন ভ্রান্তি।
এ-বিশ্বে সৌন্দর্য যেই দিকে চাই রাশি রাশি রাশি হচ্ছে সৃষ্ট,
তেমন সৌন্দর্য কিন্তু দেখি নাই শিশুর হাসিটি যেমন মিষ্ট।

কবিতার ছন্দটি লঘু চৌপদী। যুক্তাক্ষরগুলিতেও একমাত্রা ধরা হয়েছে, তাতে একটা Rhythm এর সৃষ্টি হয়েছে। এই Rhythm শিশুর টলমল চলনের সঙ্গে মিলে গিয়েছে। প্রথম দুইছত্রে ছন্দে যে-সুর ধ্বনিত হয়েছে সেই সুরেই গোটা কবিতাটি পড়তে হবে।

'ঘুমন্ত শিশু' কবিত্বরসে আরো অপূর্ব। খাট, পালঙ্ক, বালিশ, বিছানা ছেড়ে শিশু বকুলতলায় খেলতে খেলতে ঘুমিয়ে গেছে—আলেখ্যটি সর্বাঙ্গ-সুন্দর হয়েছে—অপূর্ব পরিবেশ-সৃষ্টির গুণে।

পরিবেশটি এইরূপ—

মন্দীভূত ক'রে আরো শীতের সূর্যতাপে
বহে বাতাস, চুলগুলি তার সেই বাতাসে কাঁপে।…
বৎস সঙ্গে চরে ধেনু দূরে দলে দলে ;
বাজায় বেণু রাখাল বালক আম্রগাছের তলে ;
পথের গায়ে ইক্ষুছায়ে হরিণ ব'সে থাকে ;
যাচ্ছে ঘরে গ্রাম্য বধূ পূর্ণ কুম্ভ কাঁখে।…
বকুলগাছটি চৌকি দিচ্ছে মাথায় ধ'রে ছাতি ;
মাটির উপরে দিয়েছে কে শ্যামল শয্যা পাতি' !
চরণে তার গড়ায় পৃথ্বী উপরে নীল গগন,
মাঝখানে তার যাদু আমার গভীর নিদ্রামগন।

আমাদের সঙ্গে প্রকৃতির ব্যবধান খুব দূর, শিশুর সঙ্গেই ব্যবধান খুব সামান্য, সেই শিশুকে প্রকৃতির অঙ্কে ঘুমন্ত দেখে কবির অন্তরে ঘুমন্ত কবিত্ব জেগে উঠেছে। ধূলা খেলায় মলিনহস্ত ধূলামাখা শিশুর গায়ের সব ধূলা পিতৃস্নেহধারা ধৌত ক'রে দিচ্ছে। 'পুত্র কন্যার বিবাদ' কবিতায় পিতৃস্নেহের পটভূমিকায় ফুটে উঠেছে ক্ষুদ্র বালিকার ভ্রাতৃস্নেহের আলেখ্য। এর পরিবেশ গার্হস্থ্য সংসার, সে-পরিবেশের হৃদয়মাধুর্য এই আলেখ্যের পিতা, পুত্র ও কন্যাকে জীবন্ত করে তুলেছে।

কবিতাটির রসবস্তু ভ্রাতৃস্নেহের একটি অনন্যসাধারণ দৃষ্টান্তে মুগ্ধ পিতৃস্নেহে পরম পরিতৃপ্ত। এই দৃষ্টান্ত পেসিমিস্ট পিতাকে যেন অপ্‌টিমিস্ট ক'রে তুলেছে। 'মাতৃহারা' কবিতাটিতে পত্নীবিয়োগের বেদনাই স্থায়ী ভাব, শিশুপুত্রের প্রতি স্নেহ করুণা সঞ্চারী ভাব। এরূপ কারুণ্যঘন কবিতা বঙ্গ-সাহিত্যে পূর্বে কেহ লিখেছেন বলে জানি না। কবির উৎকৃষ্টতম লিরিকগুলি

রচিত হয়েছে তাঁর পারিবারিক জীবনের সুখ দুখ অবলম্বন ক'রে। কবির জীবনে করুণতম ঘটনা পত্নীবিয়োগ। তাঁর গভীর শোক শ্লোকত্ব লাভ করেছে বিপত্নীক, সোনার স্বপ্ন, মাতৃহারা, হতভাগ্য ইত্যাদি কবিতায়। সতীহারা শিবের তুষারশুভ্র অট্টহাস্য অশ্রুর জাহ্নবী ধারায় বিগলিত হয়ে যেন এই কবিতাগুলির মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে। পত্নীবিয়োগের পর থেকে কবি যেন কতকটা দুঃখবাদী হয়ে পড়েছিলেন। পরবর্তী অনেক কবিতায় এই দুঃখবাদের ছায়াপাত হয়েছিল।

'বিধবা' একটি অতিকরুণ আলেখ্য। এতে বিধবার মামুলি হা-হুতাশ আর্তনাদ কিছুই নেই। গভীর রাত্রি, পূর্ণিমার জ্যোৎস্নায় চারিদিক আলোকিত, সমস্ত জগৎ ঘুমোচ্ছে।

ঘুমায় সবাই বিশ্বচরাচরে।
কেবল দূরে, অতিদূরে,
ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে, মেঠো সুরে
উঠছে কোন্ এক হতভাগ্যের বাঁশি।

একটি রমণীর চোখে ঘুম নেই, সে-ই কেবল জানালার গরাদে ধরে মাঠের পানে চেয়ে আছে। কিন্তু সে কিছুই দেখছে না, শুধু তার "চর্মচক্ষু চেয়ে মাত্র আছে"—আর সে তার মর্মচক্ষু দিয়ে জীবনগ্রন্থখানি খুলে অতীতের পৃষ্ঠাগুলি পড়ছে। এমনি ক'রে শিশুকাল থেকে তার ষোলো বছরের কাহিনী বারবারই পড়ে যাচ্ছে। তার সম্মুখে—

মহাশূন্য দগ্ধ সে যে
জ্বলছে অন্ধকারী তেজে
অগ্নি নিয়ে খেলা করছে বায়ু,
নাইক বারি নাইক তরু
কেবল বালু, কেবল মরু
শুষ্ক তপ্ত দীর্ঘ পরমায়ু।

এ রমণী কে? এ রমণী একটি বিধবা। কবি বলেছেন—"আমার জননী রে": এই মাতৃ-আহ্বানেই কবির গভীর সহানুভূতি এতে পরিস্ফুট। কবি বিধাতার অবিচারে ক্ষুব্ধ হয়ে শেষে বলেছেন—

হায়রে মানুষ বিধির কৃত্য চোখের সামনে দেখছি নিত্য
তবু আমরা চক্ষু বুজে থাকি।
খোসামোদের মন্দির খুলে মিথ্যার কৃষ্ণ নিশান তুলে
উচ্চৈঃস্বরে দয়াল ব'লে ডাকি।

কবি অভিমানে ছলছল চোখে উপর দিকে চেয়ে জানাচ্ছেন তাঁর বেদনার বিদ্রোহ।

আর একটি স্মৃতিস্বপ্নের আলেখ্য নববধূ। এর জীবনের স্মৃতি-চিত্রটি মধুর। এটি বাঙালী হিন্দু নারীর আর একটি চিত্র-আলেখ্য। এটি বিধবা আলেখ্যের বিপরীত। শিশুকাল থেকে নববধূ তার অল্প পরিসরের জীবনে যে ভয়, সংশয়, উদ্বেগ, বিস্ময়, আশা, আকাঙ্ক্ষা, দুঃখ, সুখের লীলা চলেছে তারি স্মৃতি রোমন্থন ক'রে শেষ পর্যন্ত তৃপ্তির সঙ্গে বলতে পেরেছে—

এ দেহ মন দিয়েছি আমি তাঁহার পায় সঁপি'
জীবনে যেন মরণে যেন তাঁহারই নাম জপি।

নববধূর বিস্ময়ে-স্পন্দিতা স্মৃতিটিকে কবি এইভাবে বাণীরূপ দিয়েছেন:

আজিকে সেই পিতার সেই মাতার কাছ ছাড়ি'
কোথায় আজি কাহার সনে চলেছি কার বাড়ি?
চিনি না যারে দেখিনি যারে শুনিনি নাম কভু
তিনি আমার দেবতা আজি? তিনি আমার প্রভু?
তাঁহার সনে চলিয়া যাব? ছাড়িয়া যাব পিছু
এ ছার নারীজীবনে ছিল মধুর যাহা কিছু?

বিশ পঁচিশ বছর আগে পর্যন্ত প্রত্যেক বাঙালী বধূর প্রাণের কথা এই। এখনো বাঙলার পল্লীর বধূদের মনে বিবাহের পর প্রথম শ্বশুরবাড়ি যাত্রার সময় এই ভাবটি উদ্বেলিত হয়। বিয়েবাড়ির চিত্রটি নববধূর স্মৃতিতে চিত্রিত হয়েছে শুধু টুকরা টুকরা উড়ন্ত ভাসন্ত কথা দিয়ে। এতে দ্বিজেন্দ্রলালের চিত্র-অঙ্কন শক্তির আশ্চর্য স্বকীয়তার পরিচয় পাওয়া যায়:

কেহ বা বলে ময়দা কৈ, কেহ বা ডাকে শশী!
কেহ বা কহে কোথায় জল? কোথায় বারাণসী?
"সিঁদুর?" "আহা বাদ্যটাকে বাজাতে বলো রাজু!"
বাহিরে গোল "গেলাস কৈ?" কর্ত্তা কৈ? কেন?
"করো না চুপ" "মিষ্টি কই?" "বৃষ্টি হবে যেন।"
"আরে ও মতি ভেড়ের ভেড়ে।" "চেঁচাও কেন দাদা?"
"ফরাস বিছা।" "সরিয়ে রাখ পাতার এই গাদা।"
"তামাক কৈ?" "আসছে খুড়ো, থামাওনা এ-গোলে।"
"এখনো বর এল না?" "আহা এই যে এলো ব'লে!"

বর্ণনার টেকনিক একেবারে নতুন। এ যেন বাঙালী বধূর হাতে গাঁথা টুকরো টুকরো কাপড়ের নক্‌সী কাঁথা। যাই হোক—বাংলার এই নববধূ চ'লে গেল শিবিকায় চ'ড়ে, সঙ্গে নিয়ে গেল কবিদের মস্ত বড় একটা সম্বল। আজকের যুবজনেরা এসব পড়ে হাসবে। কারণ, তারা "বিংশী"কে বিয়ে করে। নববধূ তাদের চোখে অসভ্য বর্বরের ঘরের মেয়ে। তারা হাসে হাসুক, তবু এইসব কবিতার আবেদন চিরন্তন ও সার্বভৌম। রসই এই সব কবিতাকে চিরদিন বাঁচিয়ে রাখবে।

নববধূ কবিতাটির চরণগুলির পাঁচমাত্রার পূর্বে গঠিত। একটু টায়ে পড়তে হবে।

'ভক্ত' কবিতাটি সম্ভবতঃ বদান্যবর তারক পালিতের উদ্দেশ্যে রচিত। কবি তাঁর ছন্দকে দাতার চরণারবিন্দ জড়িয়ে ধরতে ব'লে বলছেন :

ব্যঙ্গ কবি আমি? ব্যঙ্গ করি শুধু? নিন্দা করি শুধু সকলে?
কভু না আসলে ভক্তি করি আমি, ঘৃণা করি শুধু নকলে।

নিজের অ্যাসল কবিব্রতের কথাই কবি এখানে বলেছেন।

'সত্যযুগ' একটা অদ্ভুত কবিতা—এটি অদ্ভুত রসেরও কবিতা। অদ্ভুত রসের স্থায়ীভাব বিস্ময়। আলঙ্কারিকগণ অদ্ভুত রসের ব্যাখ্যায় বলেছেন—এ রসচিত্ত-বিস্ফারণের ফল, কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয় তাঁরা যে সব উদাহরণ দিয়েছেন সেগুলিতে অদ্ভুতরসের অমর্যাদাই হয়েছে বলতে হবে। তাঁরা বিশ্বাত্মক

বিস্ময়ের কথা ভাবতে পারতেন না। যদি পারতেন তা'হলে গীতার বিশ্বরূপ-দর্শন ও অর্জুনের চিত্ত বিস্ফারণের শ্লোকগুলির দৃষ্টান্ত দিতেন।

বাংলার কাব্য সাহিত্যে অদ্ভুত রসের কবিতা দ্বিজেন্দ্রলালের সত্যযুগ। বিবর্তন বাদের ধারায় কবি এই কবিতা লিখেছেন। যে কবি "হাস্য ক'রে অর্দ্ধজীবন অপচয় করেছি" ব'লে আক্ষেপ করেছেন তিনিই তো এই সত্যযুগও লিখেছেন—তবে এ আক্ষেপ কেন?

বিস্ময় শুধু চিত্তের বিস্ফার আনে না, আমাদের মনে অসংখ্য প্রশ্ন জাগায়। এই প্রশ্নগুলিই অদ্ভুত রসের সঞ্চারী ভাব সূচনা করে, কবির এই প্রশ্নগুলি সার্বভৌমিক, সার্বযৌগিক মহামানবের চিরন্তন জিজ্ঞাস্য।

প্রশ্নের পর প্রশ্ন চিত্তের অস্বস্তিই বৃদ্ধি করে। প্রশ্নের উত্তর লাভের জন্য মানুষের চিত্ত অস্থির হয়ে ওঠে। এই থেকেই যত দার্শনিক ও আধ্যাত্মিক পথের সন্ধান সুরু। তাই জিজ্ঞাসুরা উপদেষ্টা, আচার্য, গুরু খুঁজে বেড়ায়। কেবল সাত্ত্বিক প্রকৃতির সাধক ও কবিরাই নিজেদের অন্তর থেকে সকল সমস্যার সমাধান পান। যুগে যুগে দেশে দেশে কবিরা তাই Millennium-এর বা সত্যযুগের স্বপ্ন দেখে চিত্তের প্রসন্নতা লাভ করেছেন। সাধক কবি দ্বিজেন্দ্রলালের সত্যযুগের শেষাংশ তারই প্রতিধ্বনি :

আমি দেখছি যেন দূরে, দূরত্বে অস্পষ্ট একটা আলোকিত স্থান।
যেখানে সৌন্দর্য উৎস উঠছে ও ঝঙ্কৃত হচ্ছে অবিশ্রান্ত গান।
গড়ছি মনে মনে একটা উজ্জ্বল সুন্দর ভবিষ্যৎ ব'সে আমরা কবি
যেমন মাতা মনে মনে গর্ভস্থ সন্তানের একটা গড়ে মুখচ্ছবি।
যেখানে এই পৃথিবীর এ-দুঃখজ্বালা বিষাদ বিরাগ রবে না এ ভবে,
যেখানে এই বর্তমানের অভাব ত্রুটি অপূর্ণতা পূর্ণ হয়ে যাবে।

আলোকে সঙ্গীতে পূর্ণ, আনন্দে উল্লাসে মুগ্ধ, বিজ্ঞানে মহৎ, স্বার্থত্যাগে স্বর্গীয়, সে গগনে গগনে ব্যাপ্ত মহাভবিষ্যৎ।

ত্রিবেণীর রমণীর মুখ কবিতায় (এ কবিতাটি বর্তমান সংকলনে আষাঢ়ের শেষে সন্নিবিষ্ট হয়েছে) আধ ঘোমটার মধুর সার্থকতার কথা বলতে গিয়ে একটি পরম সত্যের আভাষ দিয়েছেন :

যেইটুক থাকে বাকি   কল্পনায় গড়ে থাকি
ভাবী আশা দেখিবার রাখি জাগরূক।
পৃথিবীর সুখ প্রায়   অর্ধেক তো কল্পনায়
অপরাধ মাত্র তার বাস্তবিক সুখ।

ত্রিবেণীর প্রথম চুম্বন কবিতাটি একটি অপূর্ব কবিতা। প্রথম চুম্বনে "শত স্বর্গ কেন্দ্রীভূত"। কবি এই অনির্বচনীয় কাব্যের পরিবেশ ও শুভ জন্মলগ্নের পরিচয় দিয়ে বলেছেন—'নিহিত হৃদয় বাহিনী' যে অসীম, প্রথম প্রণয় তার পরম কাহিনী প্রকাশ করতে মানুষের ভাষা অক্ষম হ'লেও সে কাহিনী স্ফুরিত হয় একটি চুম্বনে। একটি শব্দিত চুম্বনের বিন্দুতে রাশি রাশি বাণী-তরঙ্গের সিন্ধু আধৃত হয়ে গেল।

সুন্দরী কে? কবিতায় কবি আদর্শ নারীরূপের একটি নিদর্শন দিয়েছেন:

সেই যে যাহার বক্ষে প্রীতি   চক্ষে যাহার সুখের স্মৃতি
বাক্যে যাহার কলগীতি, ঝরে পুণ্য শ্লোক।
মুখে পবিত্রতা রাশি   ওষ্ঠে যাহার সদাই হাসি
তাহার আবার অন্য রূপের কিসের আবশ্যক?

আদর্শ সুন্দরীর রূপ চর্মে নয় মর্মে—তাই নানা বিভাবে প্রকটিত হয় তার সর্বাঙ্গে। হ্রী-ই নারীর শ্রী, একথা তিনি আর একটি কবিতায় বলেছেন:

এত যে যুবতী এত যে সুন্দরী এত যে করেছ সজ্জাগো,
সবই বৃথা নেইক নারীর প্রধান ভূষণ সে নারীসুলভা লজ্জাগো!

'প্রবাসে' কবিতাটিতে কবি তাঁর সারা জীবনের সালতামামি পেশ করার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর কাব্য জীবনের উপজীব্যগুলির কথা সরসভাবে ব্যক্ত করেছেন। কবির ভাবজীবনের একটি পরিপূর্ণ আলেখ্যও এতে পাওয়া যায়। কবির নিসর্গ প্রীতি, হারানো মধুর দিনগুলির জন্য আকুলতা, বাল্যের সরল মাধুর্যের জন্য আকিঞ্চন, সৃষ্টিরহস্য বিষয়ে জিজ্ঞাসুতা, অপচিত জীবনের জন্য আক্ষেপ ইত্যাদির কথা বিবৃত ক'রে কবি শেষে বলেছেন:

চ'লে যা রে সুখের রাজ্য, দুখের রাজ্য নেমে আয়!
গলা ধ'রে কাঁদতে শিখি গভীর সমবেদনায়।
সুখের সঙ্গ ছেড়ে করি দুঃখের সঙ্গে সহবাস:
ইহাই আমার ব্রত হউক, ইহাই আমার অভিলাষ।

কবি তাঁর কাব্য-জীবনকে যেন তিন স্তরে ভাগ করেছেন। একটি হাসির গানের স্তর। একটি কারুণ্য-প্রধান (পৌরাণিক বা ঐতিহাসিক) নাট্যলোকের স্তর। আর একটি স্তরের পূর্বাভাষ তাঁর কাব্য-জীবনে স্ফুরিত হ'য়েও বিকশিত হ'তে পারেনি—কবির অকালে চিরবিদায় নেওয়ার দরুণ। এর সঙ্গে সঙ্গে আর একটি চিরসঙ্গী ছিল তাঁর—গান। এর মধ্যেও চারটি ভাগ করা যায়: হাসির গান, স্বদেশী গান, প্রেমের গান ও ভক্তির গান। এখন এদের কথা বলবার সময় এল—বিশেষ ক'রে তাঁর গীতিকার ও সুরকার-প্রতিভার কথা।

দ্বিজেন্দ্রলালের উদারকণ্ঠে মাধুর্য ছিল, কিন্তু তিনি ওস্তাদ গাইয়ে ছিলেন না। তিনি ছিলেন প্রথম শ্রেণীর সুরকার ও গীতি-রচয়িতা। তাঁর সকল গানের সুর তিনি নিজেই দিতেন। বাংলাদেশে কীর্তন, বাউল ও বৈঠকী গানের ওস্তাদের অভাব হয়নি, কিন্তু ঐ তিনশাখায় সুরকার কেউ ছিলেন না। এমন কি নিধুবাবুও শোরী মিঞার টপ্পার সুরই বাংলা গানে চালিয়েছেন। তিনি ছিলেন প্রথম শ্রেণীর গায়ক ও মধ্যম শ্রেণীর গীতিরচয়িতা, কিন্তু তিনি সুরকারও ছিলেন। এ দেশে দুজন সুরকারের আবির্ভাব হয়েছিল। একজন রবীন্দ্রনাথ, অন্যজন দ্বিজেন্দ্রলাল। এঁদের পরে অতুলপ্রসাদও একজন সুরকার।

সুরকার হিসাবে দ্বিজেন্দ্রলালের সুর-রচনার সূত্রপাত হয় আর্যগাথার কয়েকটি প্রেমের গানে। সুরকার হিসাবে তাঁর মৌলিক প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায় পরে তাঁর রচিত গানে। তাঁর হাসির গান শুনে সকলেই মুগ্ধ হতেন। কিন্তু তাঁর সুরের মৌলিকতার মূল্যমর্যাদা—সাধারণ শ্রোতাদের তো কথাই নেই—সেকালের গায়করাও বুঝতে পারেন নি।

প্রথম প্রথম তিনি ইংরাজি ও আইরিশ গানের তর্জমা করে সেই সব মূল গানের বিলাতী সুরই বাংলা গানে দিয়েছিলেন। এটা হলো সুর যোজনার নকল-নবিশি।

সুরকার হিসাবে তাঁর প্রতিভার উন্মেষ হয় প্রথমে হাসির গানে। পরে স্বদেশী গানে। শেষে প্রেম ভক্তির গানে তা পূর্ণ পরিণতি লাভ করে। এই সব গানে বাঙালীর হৃদয়ের সহজ মাধুর্যের সঙ্গে বিলাতি সুরের প্রাণ-প্রাচুর্য সম্মিলিত হয়ে সকলকে চমকিত করেছিল। নন্দলাল, পাঁচশো বছর, গীতার আবিষ্কার ইত্যাদি হাসির গানের সুরে এমন একটা সবল গতিপ্রবাহ পরিস্ফুট হ'ল যে সকলে বুঝতে পারল—এ দেশে এই সুরধারার প্রবর্তন সম্পূর্ণ নতুন। কবি নিজে যখন এই সব গান গাইতেন তখন হাসতে হাসতে সকলের বুকে পিঠে খিল ধরে যেত। তা কি শুধু কথার জন্যে? দরাজকণ্ঠে উদীরিত সুরের জন্যেই প্রধানতঃ। গানগুলি শুধু পড়লেই হাসি পায়। আবৃত্তি শুনলে সে হাসির উদ্দীপনা বাড়ে, কিন্তু এর আসল সুরে গাওয়া শুনলে হেসে গড়িয়ে পড়তে হয়। সুরকার কবি নিজে যখন গাইতেন তখন অট্টহাস্য রোধ করা কঠিন হ'ত। বাণী ও সুরের অপূর্ব সম্মেলন যে কী অদ্ভুত হাস্যরসের সৃষ্টি করতে পারে তা এ দেশে একেবারে অজ্ঞাত ছিল। দ্বিজেন্দ্রলালের এই সুররসসৃষ্টির শক্তি কর্ণের কবচ-কুণ্ডলের মতো ছিল সহজাত।

সাধারণ হাসির গানের মারফতে তাঁকে অসাধারণ রঙ্গব্যঙ্গের কবি বলে চিনলেও এই রসসৃষ্টির কতটা যে তাঁর সংযোজিত সুরের দান তা লোকে ধরতে পারে নি। সুরকার কাকে বলে—তাইত লোকে জানত না, সুরযোজনাতে যে নব নব উন্মেষশালিনী বুদ্ধির লীলা থাকতে পারে তা লোকে বুঝত না। তারা পুরাতন সুরের সন্তোষজনক পুনরাবৃত্তিকেই সাঙ্গীতিক প্রতিভার নিদর্শন মনে করত। সুরের সঙ্গে বাণীর এমন রাজযোটক মিল দ্বিজেন্দ্রলালের অনন্যসাধারণ প্রতিভার দ্বারাই সম্ভব হয়েছিল। কবি ও সুরকারের এই অর্ধনারীশ্বর মিলন দ্বিজেন্দ্রলালের প্রতিভাতেই আমরা দেখতে পাই পদে পদে।

বঙ্গ আমার জননী আমার—এই গানটি শুনে বাঙালী প্রথম বুঝল ঐ গানের কবিত্বটাই বড় নয়, তার চেয়ে ঢের বড় ওর সুর, যে সুর তারা আগে কখনো শোনেনি। গানের সুর যে হৃদয়কে এভাবে জাগিয়ে তাতিয়ে মাতিয়ে তুলতে পারে তা তারা কখনো কল্পনাও করেনি। এ-গান তার সুরবাহনসহ একদা প্রত্যাদেশের মতোই তাঁর কণ্ঠে আবির্ভূত হয়—যেন বাল্মীকির কণ্ঠে প্রথম অনুষ্টুপ ছন্দের মতো।

কবি প্রথমে লিখেছিলেন, "আমরা ঘুচাব মা তোর কালিমা, হৃদয়রক্ত করিয়া শেষ।" লোকেন পালিত, বরদাচরণ মিত্র ও দেবকুমার রায়চৌধুরীর অনুরোধে তিনি ঐ চরণটি বদলিয়ে লিখলেন—আমরা ঘুচাব মা তোর কালিমা, মানুষ আমরা, নহি তো মেষ! কারণ, সে-যুগে রক্তের কথা থাকলে সরকারের রক্ত গরম হয়ে উঠত। এই সুরে এই ছন্দে বরদাচরণ পরে একটি গান বেঁধেছিলেন; তাতে ছিল—"জননি, তোমার ব্যাঘ্র উদরে জনমে কেমনে মানুষ মেষ?" এ-গানটি বরদাবাবু তাঁর নিজের বাংলোয় আমাকে নিভৃতে শুনিয়েছিলেন। বলাবাহুল্য, একই কারণে তা তিনি প্রকাশ করেন নি। তখন তিনি বহরমপুরের জজ, আর আমি কলেজের ছাত্র।

দ্বিজেন্দ্রলালের এই গান বাংলার সহস্র সহস্র তরুণ হৃদয়কে শুধু যে অনুপ্রাণিত করেছিল তাই নয়, তরুণ হৃদয়কে জাতীয় সংগ্রামে, বহু দেশভক্তকে সর্বস্ব উৎসর্গ করতেও প্রণোদিত করেছিল।

এই গান দ্বিজেন্দ্রলালের কণ্ঠে একক আবির্ভূত হয় নি, তার পিছু পিছু এলো "ধনধান্যে পুষ্পেভরা," "যেদিন সুনীল জলধি হইতে উঠিলে জননী ভারতবর্ষ।" এলো "ভারত আমার ভারত আমার যেখানে মানব মেলিল নেত্র"—ইত্যাদি। যাক্, যা বলছিলাম।

বলছিলাম কি, কবি হিসাবে দ্বিজেন্দ্রলাল গান বেঁধেছেন একের পরে এক, আর সুরকার হিসাবে করেছেন তাতে প্রাণসঞ্চার। সুরকার হিসাবে তিনি কীর্তন, বাউল, খেয়াল, টপ্পা ও ধ্রুপদের অপূর্ব সমন্বয় সাধনও করেছেন, কিন্তু কখনো ভুলেও হিন্দুস্থানি ওস্তাদির কণ্ঠ-মল্লযুদ্ধের নকল করেন নি। দ্বিজেন্দ্রলালের পিতা ছিলেন হিন্দুস্থানি ওস্তাদি গানের কালোয়াৎ। উত্তরাধিকারসূত্রে দ্বিজেন্দ্রলাল পিতার সঙ্গীতানুরাগ পেয়েছিলেন। কিন্তু তিনি ছিলেন স্রষ্টা, তাই তাঁর পূর্বসূরীদের পুনরাবৃত্তি বা অনুকরণকে স্বধর্ম মনে করতেন না— তিনি হিন্দুস্তানি ওস্তাদি থেকে যতটুকু নেওয়ার নিয়েছিলেন বটে, কিন্তু তা'-ব'লে তাকেই তিনি প্রধান সম্বল করেন নি। তিনি বাংলার নিজস্ব সুরধারার সঙ্গে ওস্তাদি ধারা মিলিয়ে নতুন সুর সৃষ্টি করলেন এবং তাদের উপযুক্ত বাহনেরও সৃষ্টি করলেন। তাঁর সুরধুনীর মকরও তাঁরই আবিষ্কার।

দ্বিজেন্দ্রলালের উপযুক্ত পুত্র দিলীপকুমার তাঁর পিতার কতকগুলি গানের

ইংরাজিতে অনূদিত রূপকেও দ্বিজেন্দ্রলাল-প্রদত্ত সুরে গেয়েছেন। এখন ইউরোপীয়ান, আমেরিকানরাও অনায়াসে সেগুলি গাইতে পারেন। 'ধন ধান্যে পুষ্পেভরা,' 'বঙ্গ আমার জননী আমার'—এই সব গানের জর্মণ ও অন্যান্য ভাষায় অনূদিত রূপকে বাংলা রূপের মূল সুরে গাওয়া সম্ভব, তার কারণ—দ্বিজেন্দ্রলাল শুধু যে তাঁর গানে বিদেশী গানের ঠাট ও ভঙ্গির প্রবর্তন করেন তাই নয়—তার প্রাণশক্তিকেও পুরোপুরি আত্মসাৎ করবার সহজ কৌশলটি আয়ত্ত করেছিলেন।

হিন্দুস্থানী রাগকে তিনি বাংলা গানের আধারে নতুন ছাঁচে ঢেলেছেন। কয়েকটি গানের দৃষ্টান্ত দিই—

সেথা গিয়াছেন তিনি সমরে আনিতে জয়-গৌরব জিনি'

(ইমন ঠাটে)

প্রতিমা দিয়ে কি পূজিব তোমারে এ-বিশ্ব নিখিল তোমারি প্রতিমা

(জয়জয়ন্তী ঠাটে)

পতিতোদ্ধারিণি গঙ্গে (ভৈরবী ঠাটে)

নীল আকাশের অসীম ছেয়ে (দেশ ঠাটে)

ঘন তমসাবৃত অম্বর ধরণী (ভূপালী ঠাটে) ইত্যাদি

বাংলাদেশে সুরকাররূপে ওজস্বিতায়, পৌরুষ-সরলতায়, প্রাণপ্রাচুর্যে, ভাবাবেশের উদাত্ত অভিব্যক্তিতে দ্বিজেন্দ্রলাল অপ্রতিদ্বন্দ্বী।

দ্বিজেন্দ্রলাল কবিতা লিখে তাতে সুরযোজনা করেন নি। তিনি যত গান লিখেছেন সব গানই যেন গুন্ গুন্ করে গাইতে গাইতে লিখেছেন ব'লে মনে হয়। কখনো কখনো এমনও হয়েছে—যে কথা একবার বলেছিলেন শ্রীপ্রমথ চৌধুরী—আগে তাঁর কণ্ঠে এসেছে সুর, তারপর সুরকে তিনি দিয়েছেন বাণীরূপ। সুরের সঙ্গে বাণীর এমন রাজযোটকতা বাংলার খুব কম গানেই দেখা যায়।

বৈষ্ণব পদাবলী পড়তে যতই ভালো লাগুক, কীর্তনের সুরে ঐ পদাবলী না শুনলে ঐগুলি পরিপূর্ণভাবে উপভোগ্য হয় না। তেম্নি দ্বিজেন্দ্রলালের গানও সুগায়কের কণ্ঠে না শুনলে প্রাণ সম্পূর্ণভাবে রসতদ্গত হয় না।

আমার মনে আছে প্রথম যখন "আমার জন্মভূমি" গানটি পড়লাম—তখন "এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে নাকো তুমি"—এই চরণটিকে আমার গদ্যাত্মক মনে হয়েছিল। তারপর যখন ঐ গানটিকে বন্ধুবর গিরিজাশঙ্কর চক্রবর্তীর কণ্ঠে শুনলাম—তখন ঐ চরণটিকে কতই না মধুর লেগেছিল। ঠিক তেমনি যখন নাটকে প্রথম পড়ি: "সধবা অথবা বিধবা তোমার রহিবে উচ্চ শির"—তখন 'অথবা' এই অব্যয় পদটির প্রয়োগ আমার সুষ্ঠু মনে হয়নি। তারপর কোরাসে যখন গানটি শুনি তখন শব্দটির প্রয়োগের যথাযথতা বুঝতে পারলাম। তারপর যখন সুরে শুনলাম 'যখন সঘন গগন গরজে বরিষে করকা ধারা,' তখন ঐ উপরি উপরি তিনবার একই ধরনের উচ্চারণের শব্দবিন্যাসের সার্থকতা বুঝলাম—ঐ প্রথম তিনটি শব্দ কণ্ঠস্বরের ক্রমোত্থানের তিনটি ধাপ।

আমি ঐ সুরে তখন লিখি—"দ্যুলোক ভূলোক পুলকে আলোকে জননী আমার রাজে"—সে গান অষ্টম বার্ষিক সাহিত্য সম্মেলনের (কলিকাতা টাউন হলে অনুষ্ঠিত) মঙ্গলাচরণ সঙ্গীতরূপে কোরাসে গাওয়া হয়েছিল। তাতে যে শ্রোতাদের হৃদয় উদ্দীপ্ত হয়েছিল তার গৌরবটুকু প্রাপ্য ওর সুরকার দ্বিজেন্দ্রলালের। আমার গানের ভাষায় মাতিয়ে তোলার মতো কিছুই ছিল না। কাব্যাংশটা নামের তালিকামাত্র ব'লে আমি ওকে কোন গ্রন্থে ঠাঁই দিই নি।

সুরের সঙ্গে যুগলভাবে যে গান বাঁধা হয়, কেবল পাঠ ক'রে বা তার আবৃত্তি শুনে তার পরিপূর্ণ রস পাওয়া যায় না—যথা: "ঘন তমসাবৃত অম্বর ধরণী, গর্জে সিন্ধু বহিছে তরণী" বা "ঐ মহাসিন্ধুর ওপার থেকে কী সঙ্গীত ভেসে আসে।" এদের মধ্যে কয়েকটি সুকণ্ঠে শুনবার আগে ছাপার অক্ষরে পড়বার সময়ে ভালো লেগেছিল বটে, কিন্তু তাতে উল্লেখযোগ্য কিছু পাই নি। কিন্তু যখন ঐ গান রঙ্গমঞ্চে উদ্‌গীত হতে শুনলাম তখন দেহে মুহুর্মুহুঃ রোমাঞ্চ সঞ্চার হতে লাগল। উদ্‌গীত গান দুটি আমাকে একেবারে বহির্জগৎ ভুলিয়ে দিল—কোন্ লোকাতীত জগতে আমার চিত্ত যেন শেলির স্কাইলার্কের মতই উড়ে গেল।

'নীল আকাশের অসীম ছেয়ে ছড়িয়ে গেছে চাঁদের আলো' গানটির কারুণ্যঘন সুরও প্রাণকে ঠিক এম্‌নিই উদাস ক'রে দেয়, মনে হয় যেন

রণশ্রান্ত মহাবীরের কণ্ঠে মহাপথের শিবিরে চির শান্তির জন্য ব্যাকুল আবেদন।

পতিতোদ্ধারিণি গঙ্গে—গানটি প্রাকৃত চৌপাইয়া ছন্দে একেবারে নিখুঁত ভাবে সংস্কৃত ছন্দের হ্রস্ব দীর্ঘ মাত্রার মর্যাদা রক্ষা ক'রে রচিত। গ্রন্থনে কোথাও ত্রুটি নেই। যারা এ ছন্দ পড়তে অভ্যস্ত নয় তারা বার বার ছন্দোভঙ্গ করে। বিশেষতঃ নিম্নে লিখিত চরণ দুটিতে—৮+৮+৮+৪।

সমশত ধারা = ৮মাত্রা

অম্বর হইতে। সমশত ধারা। জ্যোতিঃ প্রপাত। তিমিরে।
বরিষ × শ্রবণে। তব জল কলরব। বরিষ সুপ্তি মম। নয়নে।

২য় চরণে শ্র এর আগে বরিষ শব্দের ষ-এর অ-কার দীর্ঘ পাচ্ছে সংস্কৃত ছন্দের নিয়মানুসারে।

অতএব উপরে চিহ্নিত স্থলে একটি ক'রে মাত্রা পাওয়া যাচ্ছে। এ-তথ্যটি সকলের জানা নেই, সেজন্য ছন্দঃ পতন ক'রে বসে পড়বার সময়। জ্যোতিঃ প্রপাত ৮ মাত্রায় গ্রথিত, "জ্যো" তথা "পা" দীর্ঘ স্বর হওয়ার দরুণ দ্বিমাত্রিক ব'লে। সংস্কৃত ছন্দোবিৎরা সবাই জানেন যে সংস্কৃতে আ ঈ ঊ এ ঐ ও ঔ—এ সাতটি স্বর দ্বিমাত্রিক। এ তথ্য আমার জানা ছিল—তবু আমি চরণ দুটিকে কৃচ্ছ্রপাঠ্য মনে করেছিলাম—তারপর ঐ গান যখন উদ্‌গীত হতে শুনলাম তখন আমার কানে চরণ দুটিকে সবচেয়ে Rhythmic মনে হ'লো। এ গান শুনে আমার মনে হ'ল—গ্রীষ্মের মধ্যদিনের তাপদগ্ধ দেহ যেন গঙ্গাস্নান ক'রে উঠল। মনে হ'ল ভক্তির আকর্ষণী যেন মূর্তিমতী গঙ্গামাতাকে টেনে আনল আমাদের সম্মুখে।

পত্নী-বিয়োগের পর থেকে তিনি নিজেও সহধর্মিণীর অনুগমন করবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলেন—এ গানে তাঁর শেষ জীবনের আবেদন আছে। তিনি জাহ্নবী সলিলে জীবনের সকল দাহ জুড়াতে চেয়েছিলেন।

পরিহরি ভব সুখ দুঃখ যখন মা শায়িত অন্তিম শয়নে
বরিষ শ্রবণে তব জল-কলরব বরিষ সুপ্তি মম নয়নে।

দিলীপকুমারের কাছে মহামতি পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য এ গানটি

শুনতে শুনতে অশ্রুবিসর্জন করতেন ও বলতেন : "প্রতি হিন্দুর এ-গানটি গাওয়া উচিত।"

দ্বিজেন্দ্রলালের বহুগানই কবিতা হিসাবেও সার্থক সৃষ্টি। সুকণ্ঠে উদ্‌গীত না হ'লেও সেগুলির স্বতন্ত্র রসমূল্য যথেষ্ট। সেগুলিও উদ্‌গীত হলে তাদের রঙের উপর রসান চড়ানো হয়; পড়বার সময়ে আমরা মুগ্ধ হই; কিন্তু সুকণ্ঠে কিম্বা কোরাসে উদ্‌গীত হ'লে যে-উন্মাদনার সৃষ্টি হয় তাতে সর্বাঙ্গে যেন কোলাহল প'ড়ে যায়—মন প্রাণ নেচে উঠে, সুপ্তশক্তি জেগে ওঠে, শিরায় শিরায় আগুন লেগে যায়। মনে পড়ে কবির সেই বাণী :

"জাগিয়ে দে লাগিয়ে দে নাচিয়ে দে মাতিয়ে দে।"

সঙ্গীতের এই প্রাণোচ্ছল শক্তি আমাদের দেশে ছিল না। দ্বিজেন্দ্রলাল এই প্রাণশক্তি ইউরোপীয় সঙ্গীত থেকে আত্মসাৎ করে বাংলা গানে সঞ্চার করেছেন। এই গীতগুলির অধিকাংশই কোরাস গর্ভগীত। এই গানগুলি যখন নানা রঙ্গমঞ্চে গাওয়া হ'ত তাতে উদাত্ত গম্ভীর পরিবেশের সৃষ্টি হ'ত। যে-সভামণ্ডপে গাওয়া হ'ত সে-মণ্ডপ যেন গম্বুজ তলের মত গম গম করত, যে পথে গাওয়া হ'ত সে পথ যেন সুরগঙ্গায় পরিণত হ'ত, যথা :

বঙ্গ আমার জননী আমার ধাত্রী আমার, আমার দেশ।
যে দিন সুনীল জলধি হইতে উঠিলে জননী ভারতবর্ষ।
ভারত আমার ভারত আমার যেখানে মানব মেলিল নেত্র।
আজি গো তোমার চরণে জননী আনিয়া অর্ঘ্য করি মা দান।
মেবার পাহাড় মেবার পাহাড় যুঝেছিল যেথা প্রতাপবীর।
ভেঙে গেছে মোর স্বপ্নের ঘোর ছিঁড়ে গেছে মোর বীণার তার।
ধনধান্যে পুষ্পেভরা আমাদের এই বসুন্ধরা।...ইত্যাদি

এই গানগুলি প্রত্যেকটিই এ দেশে জাতীয় ভাব উদ্দীপনায় যে সহায়তা করেছে বঙ্কিমের বন্দেমাতরম্ ছাড়া অন্য কোন গান তা করেনি। আমাদের স্বাধীনতা-সংগ্রামে বাংলা গীতিসাহিত্যের যদি কোন অবদান থাকে তবে তার বেশির ভাগ কীর্তির শিরোপা প্রাপ্য এই সকল গানের রচয়িতার।

"ধনধান্যে" গানটি ছাড়া এই শ্রেণীর সব গান লঘু চৌপদী ছন্দে রচিত।

সুরের আয়ত পরিসরের সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখবার জন্যই এই দীর্ঘপরিসরের ছন্দ গৃহীত হয়েছে।

"যেদিন সুনীল" ও "ভারত আমার" এই গান-দু'টির প্রত্যেক চরণটির শেষে যুক্তাক্ষর প্রয়োগ করায় সুবিধা হয়েছে। পূর্বে কোন চৌপদীতে রচিত গানের চরণান্তে এইরূপ যুক্তাক্ষর দেখা যায় নি। গানগুলির কবিত্বের আশ্রয়রস—উদাত্ত ভাবের দেশানুরাগ।

"আজি গো তোমার" গানটিতে মাতৃভাষার সেবায় আত্মোৎসর্গের সংকল্প দেশানুরাগেরই আর একটি রূপ। যে-মেবারের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য ভারতের দেশভক্তদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি হৃদয়-রক্তপাত করেছে "মেবার পাহাড়" গানটিতে সেই মেবারের গৌরব কীর্তন করা হয়েছে বাষ্পগদগদ কণ্ঠে। "ভেঙে গেছে মোর" গানটিতে সেই মেবারের দুর্গতির জন্য বুকফাটা হাহাকার ভারতের আকাশে কারুণ্যের মেঘ সঞ্চার করেছে।

"ধনধান্যে" গানটিতে কবির দেশপ্রীতি দেশের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ও মাধুর্যকে আশ্রয় করেছে। কেবল দেশের মানুষই নয়, দেশের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য যে কবিকে কতটা মোহিত করেছে এ গানটিতে সে-ছবি বড় সুন্দর ফুটে উঠেছে।

এই ভাবে দেশের মহিমময় রূপগৌরব, প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, প্রাচীন জ্ঞান-গৌরব, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য, ভাষা ও সাহিত্য, প্রাচীন ইতিহাসের শৌর্যগরিমা ও বীরবৃন্দের আত্মোৎসর্গ সমস্তই কবির দেশভক্তিমূলক গানের প্রেরণার উপজীব্য হয়েছে। দ্বিজেন্দ্রলালের বাকি সব গান যদি লুপ্ত হয় তবু এই গানগুলি জাতি যতদিন জীবিত থাকবে ততদিন তার জীবনে শক্তি সঞ্চার করবে।

এই গানগুলির সুর বেশ সরল বটে; কিন্তু এদের সুরের উত্থানপতনের সঞ্চলন খুব সহজ নয়। বিলাতি সুরে যাকে বলে movement, তা দ্বিজেন্দ্রলালই প্রথম এদেশের সুরে প্রবর্তন করেন। আমাদের দেশে সুরের বিস্তার হয় সচরাচর ধীরে সুস্থে, উদ্দীপনা বা উন্মাদনায় নয়। দ্বিজেন্দ্রলালই লক্ষ্য করেন—উন্মাদনার বা মাতামাতিরও সার্থকতা আছে—এতে স্বরগ্রামের পরিধি বা পরিসর বিস্তৃত হয় এবং এতে সুরের মধ্যে নতুন প্রাণ সঞ্চার হয়।

এই গানগুলিতে দ্বিজেন্দ্রলাল, কেবল উন্মাদনা নয় সুর সঞ্চরণের পরিসরও বাড়িয়ে দিয়েছেন। এই সকল গানেই সুরকার হিসাবে কবির প্রতিভার প্রকৃষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। ওস্তাদ গায়কেরা নতুন তান সৃষ্টি করলেও ঠিক নতুন সুরভঙ্গীর সৃষ্টি করতে পারেন না। দু' একজন বাঙালী গায়কই নতুন সুরভঙ্গীর সৃষ্টি করতে পেরেছেন বটে, যেমন—সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার ও লালচাঁদ বড়াল। কিন্তু তাঁদের সুরসংযোগেও সুরের লীলাখেলা অব্যাহত হ'লেও সুরের অন্তর্নিহিত অপরিহার্য বিন্যাসটি নেই। তাঁরা প্রতি গানের সুরকে ব্যাখ্যা করেছেন—কোনো সম্পূর্ণ নতুন সুরের সৃষ্টি করেন নি। এইজন্যে সুরকারের কৃতিত্ব গায়কের চেয়ে উঁচুদরের। গায়ককে যদি contractor উপাধি দেওয়া যায় তাহ'লে সুরকারকে বলা যেতে পারে architect.

ইউরোপে সুরকার বীটোফন্, ওয়াগনার, চাইকভস্কি, শূবার্ট, ব্রাহ্‌ম্, শূমান্, শোপ্যাঁ ইত্যাদির তুলনায় কারুসো, বাতিস্তিনি, মেলবা প্রমুখ গায়ক গায়িকাদের মর্যাদা অনেক কম। এঁরা সুরকার, গায়করা সুরের ভাষ্যকার, প্রকাশক ও প্রচারক। উক্ত সুরকারেরা কবি ছিলেন না। দ্বিজেন্দ্রলাল একাধারে কবি ও সুরকার দুইই।

আমাদের অলঙ্কারশাস্ত্রে হাস্যরসকে নবরসের মধ্যে ধরা হয়েছে, কিন্তু এর স্থান খুব নীচে। একে শূদ্ররস মনে করা হয়, সেজন্য সংস্কৃত নাটকে হাস্যরসের বিলাস দেখানো হয়েছে পেটুক বিদূষকের ও নিম্নশ্রেণীর পাত্রপাত্রীদের অভিনয়ে। দ্বিজেন্দ্রলালই এত কাল পরে ঐ শূদ্ররসকে ভদ্ররসে উন্নীত করে দ্বিজত্ব দান করেছেন।

সংস্কৃত নাটকে যেখানে হাস্যরসের কথা আছে সেখানেই খাদ্যরসের কথা। সে সব প'ড়ে হাসি পায় না। সংস্কৃত নাটকে অঙ্গ-বিকৃতি ও হাবভাবের দ্বারাই হাস্যোদ্রেক করা হতো। আমাদের প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে ধামালী শ্রেণীর গানের পালায় রসকলহের মধ্যে ছিটেফোঁটা হাস্যরস পাওয়া যায়।

উৎকৃষ্ট পদাবলীতে রঙ্গরসের ঠাঁই নেই। নিকৃষ্ট শ্রেণীর পদাবলীতে শ্রীকৃষ্ণের দৈবজ্ঞবেশ, বৈদ্যবেশ, নাপিতানী বেশ ইত্যাদি ছদ্মরূপের কল্পনা করে একটু আধটু হাসাবার চেষ্টা হয়েছে। চণ্ডীমঙ্গলে ভাঁড়ু দত্তের ও মুরারি শীলের

আচরণে সামান্য হাস্যরসের সৃষ্টির চেষ্টা হয়েছিল, কিন্তু তাদের এমনি দুর্জন বানানো হয়েছে যে তাতে ক'রে হাসি চাপা পড়ে গিয়েছে।

অন্নদামঙ্গলে ভারতচন্দ্র বরং মাঝে মাঝে হাসাতে পেরেছেন—বোধ হয় সেটা দ্বিজেন্দ্রলালের জন্মভূমি কৃষ্ণনগরেরই প্রভাব।

লোকসাহিত্যে হাস্যরস অবশ্যই আছে, কিন্তু তা সভ্যজনের উপভোগ্য নয়। তাতে আছে সঙের খেলা, ভাঁড়ামি, অশ্লীলতা এবং গালাগালি। প্রাকৃতজনসমাজে এসব হাস্যরসের রচনা ব'লে গণ্য হয়েছিল। এই কদর্যতা চরমে উঠেছিল কবির লড়াইয়ে ও খেউড়ে। এই শ্রেণীর লোক সাহিত্যের মধ্যে একমাত্র দাশুরায়ের পাঁচালীতে শ্লেষযমকের জাঁকজমকে একপ্রকার হাস্যরসের সৃষ্টি হয়েছিল। তাতে ভদ্রসমাজ কিছু হাসির খোরাক পেয়েছিল।

তারপর এলেন ঈশ্বরগুপ্ত। তাঁর রচনায় গ্রাম্য সাহিত্য ও নাগরিক সাহিত্যের ধারার মিলন ঘটেছে। কাজেই তাঁর কৌতুক রচনায় গ্রাম্যতা ও নাগরিক মজলিশী ভাবেরও সমন্বয় ঘটেছে। তার ফলে নগরের সুশিক্ষিত লেখকরাও কৌতুকরসসৃষ্টিতে তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করতে পেরেছিলেন। তাঁর প্রধান শিষ্য দীনবন্ধু মিত্র। ইনি গুরুর ধারারই অনুসরণ করেছেন তাঁর 'জামাই বারিক', 'সধবার একাদশী' ইত্যাদি নাটকে এবং কতকটা স্থূলভাবে হ'লেও গুরুকে অতিক্রম ক'রে গেছেন হাস্যরসসৃষ্টিতে। আলালের ঘরের দুলাল ও হুতোম পেঁচার নক্সার হাস্যরস গ্রাম্যতাদুষ্ট। গুপ্ত কবির অন্যতর শিষ্য বঙ্কিমই "হংসৈর্যথা ক্ষীরমিবাম্বুমধ্যাৎ" ঈশ্বরগুপ্তের মজলিশী ভাবের কৌতুক ধারাটিকে বেছে নিয়েছেন। বঙ্কিমচন্দ্র ঈশ্বর গুপ্তের রচনার অশ্লীলতা সম্বন্ধে খুব বড় একটা কষ্টকল্পিত কৈফিয়ৎ দিয়েছেন এবং তাঁর গ্রাম্য ভাবকে প্রবন্ধে কতকটা সমর্থন করেছেন বটে, কিন্তু তিনি নিজে অশ্লীলতা বা গ্রাম্যতা বর্জন ক'রেই চলেছিলেন। তাঁর কমলাকান্তের দপ্তরে রঙ্গরস কিছু কিছু থাকলেও সাধারণতঃ ব্যঙ্গ ও শ্লেষেরই প্রাবল্য।

রবীন্দ্রনাথ বঙ্কিমের হাস্যরস সম্বন্ধে বলেছেন—"নির্মল শুভ্র সংযত হাস্য বঙ্কিমই সর্বপ্রথমে বঙ্গ সাহিত্যে আনয়ন করেন।"

বঙ্কিমচন্দ্রের পর হাস্যরসসৃষ্টিতে জ্যোতিরিন্দ্রবাবুর নাম করা যেতে পারে। তবে তিনি এর উপর বেশি জোর দেন নি। বরং ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

গদ্যে পদ্যে কিছু কৌতুকরসসৃষ্টি করেছেন। মাইকেল থেকে প্রহসনের ধারা দীনবন্ধুর মধ্য দিয়ে অমৃতলালে এসে পৌঁছুল। কৌতুকরসসৃষ্টিতে অমৃতলালের দান কম নয়। রবীন্দ্রনাথেরও কবিতা ও প্রহসনেও কৌতুকরস সৃষ্টির অবদান অল্প নয়। তা ছাড়া, তাঁর নানা রচনার মধ্যে দিয়ে কৌতুকরস ফল্গুধারার মত প্রবাহিত। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের কৌতুককলা একটু সূক্ষ্ম ধরনের। চিরকুমারসভার হাস্যরসের সময়ে সময়ে ভাষ্যের প্রয়োজন হয়।

ত্রৈলোক্য মুখোপাধ্যায়, তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, যোগেন্দ্রনাথ বসু ইত্যাদির কথাসাহিত্যের মধ্য দিয়ে হাস্যরস ধারা কেদারনাথ, প্রভাতকুমার, শরৎচন্দ্র ও রাজশেখর বসু প্রভৃতির রচনায় নেমে এসেছে।

কবিতার হাস্যরসধারা ক্ষীণস্রোতে নিদাঘতটিনীর মতো ব'য়ে আসছিল। দ্বিজেন্দ্রলালের কবিতায় সেই ধারা শ্রাবণের উচ্ছল প্লাবনে পরিণত হয়েছে। দ্বিজেন্দ্রলালের কবিতাতে কেবল বঙ্গসাহিত্য নয়, ভারতীয় সাহিত্যই কৌতুক-ধারায় চরম শ্রীবৃদ্ধি লাভ করেছে।

তাঁর জন্মস্থানের সঙ্গেও এর যোগ আছে। Volcanic eruption-এর যেমন একটা Zone—মণ্ডলী—আছে, এদেশে হাস্যরসের Eruption-এরও তেমনি একটা Zone আছে। এই মণ্ডলীর ভূখণ্ডই বঙ্গরাজ্যের অঙ্গীভূত রঙ্গরাজ্য। খিদিরপুর, জোড়াসাঁকো, বাগবাজার থেকে নৈহাটি, কাঁচড়াপাড়া হয়ে নদীয়া জেলায় প্রবেশ করতে হবে। গোটা জেলাটা পরিক্রমা ক'রে তারপর পদ্মাপার হ'য়ে পাবনা জেলায় যেতে হবে। সেখান থেকে রাজসাহী হয়ে পদ্মা পার হয়ে মুর্শিদাবাদে এসে জঙ্গীপুরে গঙ্গা পার হতে হবে। পশ্চিম পারে গঙ্গাটিকুরি, কাটোয়া মহকুমা, কালনা মহকুমা, নবদ্বীপ হয়ে হুগলীর দেবানন্দপুর পর্যন্ত মোটামুটি সীমা ধরলে রঙ্গরাজ্যের চৌহদ্দী পাওয়া যাবে। এই রঙ্গরাজ্যের মধ্যে কৌতুকরসের প্রায় সব সাহিত্যিকদের জন্মভূমি ও পিতৃভূমি পাওয়া যাবে। এই রাজ্যের রাজধানী কৃষ্ণনগর এবং দ্বিজেন্দ্রলাল একসময় এই রাজ্যে একছত্রাধিপতি রাজা ছিলেন।

আমি যে সব হাস্যরসিক লেখকদের নাম করেছি তাঁদের রচনায় হাস্যরসের কোনো না কোনো একটা দিকের অল্প-বিস্তর দন্তবিকাশ হয়েছে। কিন্তু হাস্যকৌতুক রসের যত প্রকার প্রকরণ থাকতে পারে দ্বিজেন্দ্রলালের রচনায়

সমস্তই বর্তমান আছে। Wit, humour, irony, sarcasm, invective, comic sketch, parody ইত্যাদি সকল প্রকরণেরই সমাবেশ আছে দ্বিজেন্দ্রলালের রচনায়।

কবির ব্যঙ্গের পাত্র কোন ব্যক্তিবিশেষ নয়—সম্প্রদায়বিশেষ কিম্বা সমাজবিশেষ। তিনি যাদের নিয়ে ব্যঙ্গ করেছেন অর্থাৎ যাদের আচরণ দেখে হাসি চাপতে পারেন নি, রঙ্গের রঙে ও ব্যঙ্গের রেখায় যাদের চিত্র এঁকেছেন, তাদের একটা তালিকাও দিয়েছেন, 'বলি তো হাসব না'

গানে—

বলিত হাসবো না হাসি রাখতে চাই তো চেপে,
কিন্তু এ ব্যাপার দেখে থেকে থেকে যেতে হয় যে ক্ষেপে ॥
সাহেব পদাহত থতমত অঞ্চলস্থ স্ত্রীর,
ভূত-ভয়-গ্রস্ত পগারস্থ মস্ত মস্ত বীর,
যবে সব কলম ধরে গলার জোরে দেশোদ্ধারে যায়,
তখন আমার হাসির চোটে বাঁচাই মোটে হয়ে ওঠে দায়।
যবে নিয়ে উড়ো তর্ক শাস্ত্রিবর্গ টিকি দীর্ঘ নাড়ে,
একটু গ্যানো পড়ে কেহ চড়ে বিজ্ঞানেরই ঘাড়ে,
করতে একঘরের মস্ত বন্দোবস্ত ব্যস্ত কোন ভায়া,
তখন আমি হাসি জোরে গুম্ফ ভ'রে ছেড়ে প্রাণের মায়া।
যবে কেউ বিলেত থেকে ফেরে বেঁকে প্রায়শ্চিত্ত করে,
যবে কেউ মতিভ্রান্ত ভেড়াকান্ত ধর্ম ভাঙে গড়ে,
যবে কেউ প্রবীণ ভণ্ড মহাষণ্ড পরেন হরির মালা,
তখন ভাই নাহি ক্ষেপে হাসি চেপে রাখতে পারে কোন (শালা)?

দ্বিজেন্দ্রলালের যৌবনকালে এক শ্রেণীর Reformed Hindu-দের প্রাদুর্ভাব হয়েছিল। এঁরা ইংরাজি লেখাপড়া শিখে উচ্চপদস্থ হয়েছিলেন, এঁরা ছিলেন অনাচারী, হিন্দু আচার অনুষ্ঠান কিছুই মানতেন না, অথচ হিন্দুত্বের গৌরব করতেন। এঁরা সাহেবি সমাজের ও হিন্দুসমাজের দুই সমাজের যা কিছু সুযোগসুবিধা দুইই ভোগ করতে চাইতেন। শশধর

তর্কচুড়ামণি সেকালে হিন্দুদের কোনো কোনো আচার ব্যবহারের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দিতেন, এঁরা হিন্দুদের স্বপক্ষে সেগুলি প্রয়োগ করতেন। এই শ্রেণীর ভণ্ড কপট ভোগসর্বস্ব হীনচরিত্র মেরুদণ্ডহীন জীবদের দ্বিজেন্দ্রলাল ব্যঙ্গবাণে জর্জরিত করেছেন।

যারা গোপনে অখাদ্য খায় কিন্তু সমাজে স্বীকার করে না; ইংরাজি ও বাংলায় খিচুড়ি বানিয়ে কথা বলে; অবিমিশ্র বাংলা বা অবিমিশ্র ইংরাজি বলতে পারে না; যারা শুধু গরম গরম বক্তৃতা ক'রে দেশকে স্বাধীন করতে চায়; যে সাহেবগুলো তাদের উপাস্য—তাদেরি চটায়; যারা queer amalgam of শশধর Huxley and Goose; যারা কেবল নতুন কিছু একটা করবার জন্য অকারণে চিরপ্রচলিত ধারাকে বদলাতে চায়; যারা নিজেদের ঘরের মেয়েদের কেবল মেমসাহেব সাজাতে চায় না—তাদের ছুরিকাঁটাও ধরায়; যাদের চরিত্রবল নেই; ধর্মমতের দৃঢ়তা নেই, লোভে, ভয়ে কিম্বা স্বার্থের খাতিরে যাদের "বদলে যায় মতটা, ছেড়ে দেয় পথটা;" যারা বিন্দুমাত্র ত্যাগ স্বীকার না ক'রে তাকিয়া ঠেস দিয়ে দেশের সেবা করতে যায় এবং সেই দেশসেবার অজুহাতে নিজেদের সাংসারিক বা সামাজিক কর্তব্য পালন করে না—কপটধর্মের দোহাই দিয়ে নিজেদের স্বার্থ সিদ্ধি করে; যে-সব অপদার্থ মানুষ শূন্যগর্ভ আস্ফালন করে; স্তাবক মোসাহেবদের কাছে বাহবা পেয়ে আত্মপ্রসাদে গদ্‌গদ হয়; যাদের বড় হবার সাধ আছে কিন্তু সাধ্যও নেই, সাধনাও নেই—কবি নানা কবিতায় তাদেরই ব্যঙ্গ করেছেন। এই ব্যঙ্গের ব্যঞ্জনাভরা সরস বিবৃতিই আমাদের হাসায়।

কবি প্রকৃতিতে দেশভক্ত স্বজাতিবৎসল; স্বজাতিকে ভালবাসেন ব'লেই তিনি তার দুর্বলতার জন্যে ব্যথা পান, স্বজাতিকে আঘাত ক'রে চেতাতে বা ঘা মেরে মৃতকল্প জাতিকে বাঁচাতে চান। এই আঘাত তাঁর হাতে গদার রূপ ধরে নি—অব্যর্থ ধানুকীর ব্যঙ্গশায়কের রূপ ধরেছে। 'নন্দলালে' বাঙালী চরিত্রের যে আভাস ছিল, 'আষাঢ়ের' বাঙালী-মহিমায় তাহা পূর্ণাঙ্গ রূপ ধরেছে। কী গভীর আক্ষেপই না কবিতাটির অন্তরালে ফল্গুধারার মত প্রবাহিত হচ্ছে।

তারা গায় সবে "জয় সীতারাম" আজো শুনি যেথা যাই গো।
তোমাদের গান "জয় শ্রীরাধিকে ওগো দুটি ভিক্ষা পাই গো ॥

সাধারণ হিন্দুরা তখন গীতার ধার ধারত না, গীতার নামই শুনেছিল। মুসলমানদের কোরান আছে, খৃষ্টানদের বাইবেল আছে, হিন্দুর কী আছে? বেদের নাম করা চলে না। কারণ, উচ্চশিক্ষিতেরাও বেদের নামটাই শুধু শুনেছিল—তাও Vedas ব'লে। কাজেই আমাদের ধর্মশাস্ত্র কী, সাহেবরা জিজ্ঞাসা করলে গীতার নাম করার রেওয়াজ হয়েছিল। এজন্যই গীতার আবিষ্কার হ'ল। শিক্ষিত লোকেরা গীতা নিয়ে খুব বাড়াবাড়ি করত, কিন্তু গীতার গূঢ় তত্ত্বের মধ্যে কেউ প্রবেশও করত না। গীতোক্ত ধর্মও কেউ পালন করত না। গীতার গৌরবটাই মুখে প্রচার করত। এক বর্ণ না বুঝেও কেউ কেউ গীতা আবৃত্তিও করত। এই শ্রেণীর ধর্মধ্বজদের ব্যঙ্গ করতেই দ্বিজেন্দ্রলাল "গীতার আবিষ্কার" লেখেন।

গীতায় বীরধর্মের মহিমাই ব্যক্ত হয়েছে। অথচ গীতা নাম নিয়ে বাড়াবাড়ি ও আস্ফালন করত কারা?—

দেখি যদি গৌর মূর্তির রক্তবর্ণ আঁখি
অমনি প্রাণের ভয়ে ওগো বাবা ব'লে ডাকি।
পালাই ছুটি ঊর্ধ্বশ্বাসে যেন বাঘে খেলে,
চাদর এবং পরিবারে সমভাবে ফেলে।

এইরূপ আচরণ যাদের সেই বীরচূড়ামণিরাই গীতার দোহাই দিত।

যে-সব অনাচারীরা যৌবনে অনেক কুকর্ম ক'রে বৃদ্ধ বয়সে নতুন সুযোগ-সুবিধার প্রত্যাশায় ভক্ত হিন্দুর ভেখ ধারণ করত—তাদের কবি ব্যঙ্গ করছেন 'হিন্দু' কবিতায়—

এবার হয়েছি হিন্দু করুণাসিন্ধু গোবিন্দজীকে ভজি হে।
এখন করি দিবারাতি-দুপুরে ডাকাতি (শ্যাম) প্রেম সুধারসে মজি হে।

কবির জাতীয় ধর্মে নিষ্ঠা ছিল অবিচল। তাঁর ধর্মসম্বন্ধীয় যত ব্যঙ্গবিদ্রূপ সবই আসল হিন্দুধর্মের বিকৃত রূপের উদ্দেশে।

ধর্মের বা ধর্মনিষ্ঠার আবরণে কপটতাকেই তিনি কশাঘাত করেছেন বারবার। যারা মনে করে—"ভীরুতাটি আধ্যাত্মিক আর কুঁড়েমিটা ধর্ম"—তাদের তিনি অব্যাহতি দেন নি। দ্বিজেন্দ্রলালের ছিল প্রগতিশীল মনোভাব, সেজন্য তিনি আসল ধর্মকে বজায় রেখে কুসংস্কারগুলিকে দূর করে দেশের ধর্মাচারকে অনিন্দ্য ও দোষমুক্ত করতে চেয়েছিলেন।

তিনি স্ত্রীকে "ছুরিকাঁটা ধরাতে কিম্বা দিদিমাকে জ্যাকেট কামিজ পরাতে" চান নি বটে কিন্তু নারীকে চিরদিন অন্দরে বন্দী করে রাখা, শিক্ষা-লাভে বঞ্চিত করে রাখার প্রথা, অনুমোদন করেন নি।

দ্বিজেন্দ্রলালও বিলাত গিয়েছিলেন কিন্তু সাহেব ব'নে যাননি,—তিনি মনে প্রাণে খাঁটি বাঙালীই ছিলেন। যারা দুবছর বিলাতে লেখাপড়া শিখে ফিরে এসে সাহেব ব'নে যেত—তাদের তিনি কৃপাদৃষ্টিতে দেখতেন; যারা দু'বছরের মধ্যেই সারা জীবনের শিক্ষাদীক্ষা, অভ্যাস, সংস্কৃতি সব ভুলে যেত, মাতৃভাষায় কথা বলতে লজ্জা পেত, সমাজ, ধর্ম, ঐতিহ্য সবই বিসর্জন করত, তাদের আচরণের এই অসঙ্গতিকে ব্যঙ্গ না ক'রে পারতেন না। তাঁর বিলাত-ফের্তা কবিতাটিতে তীব্র ব্যঙ্গে তাদের অদ্ভুত রূপান্তরটি ফুটেছে:

আমরা বিলিতি ধরণে হাসি
আমরা ফরাসি ধরণে কাসি
আমরা পা ফাঁক করিয়া সিগারেট খেতে বড্ডই ভালবাসি।

এদের আবার কেউ কেউ ফিরে এসে প্রায়শ্চিত্ত করে—তা যে হস্তি-স্নানবৎ তা লক্ষ্য ক'রে কবি হাসি চাপতে পারেন নাই।

বিলেত-ফেরতাদের আমূল রূপান্তর দেখে কবির হাসি পায়; কিন্তু সাধারণ লোকে ভাবে কি জানি কি অদ্ভুত দেশ সে—সেখানে গেলে মানুষের ভোল এমনি বদ্‌লে যায়, কবি তাদের উদ্দেশ ক'রে প্রকারান্তরে ঐ নকল সাহেবদেরই ব্যঙ্গ করেছেন,—

বিলেত দেশটা মাটির সেটা সোনার রূপার নয়,
তার আকাশেতে সূয্যি ওঠে মেঘে বৃষ্টি হয়।

এই যে রূপান্তর তার জন্য বিলাত দায়ী নয়, দায়ী বিলাত-ফেরতাদের বানরীয়

মনোবৃত্তি ও অনুচিকীর্ষা (হনুচিকীর্ষা ?)। জানি না দ্বিজেন্দ্রলালের কথার আঘাত তাদের দর্জিদত্ত বর্ম এবং গণ্ডারীয় চর্ম ভেদ করতে পেরেছিল কি না।

সত্যনিষ্ঠ কবি শুধু নকল সাহেবদেরই ব্যঙ্গ করেননি—গোঁড়া কুসংস্কারী কপটাচারী টিকিধারীদের নিয়েও সমান হাসাহাসি করেছেন। যারা শাস্ত্রজ্ঞ হয়ে শাস্ত্র মেনে চলে না, অথচ শাস্ত্রের দোহাই পাড়ে আর শাস্ত্রকে শস্ত্ররূপে পরিণত করে, স্বার্থসিদ্ধির জন্যে নিরীহ সরল মানুষদের শাস্ত্রের শাসনে বশে রেখে আধিপত্য করে, তারা তাঁর ব্যঙ্গের লক্ষ্য হয়েছে। আবার ম্লেচ্ছাচারের সুযোগ, স্বাচ্ছন্দ্য ও হিন্দুয়ানির সুযোগ সুবিধা দুইই যারা ভোগ করতে চায়—দুনৌকায় দুই পা রেখে যারা আস্ফালন করে, তাদেরও তীব্রতর ব্যঙ্গ বাণে বিদ্ধ করেছেন।

বাঙালী জাতির মূঢ়তা, রূঢ়তা, ক্রূরতা, ভীরুতা, ইতরতা, তাঁকে বড় পীড়া দিত। তাদের চেতাবার জন্যও তাঁকে অবিরত ব্যঙ্গশর হানতে হয়েছে।

যারা বাঙালীর নামে শূন্যগর্ভ আস্ফালন করে, যারা নিজেদের জাতীয় দুর্বলতার কথা ভুলে বাঙালীর যৎসামান্য কৃতিত্বকেই খুব বড় ব'লে প্রচার এবং গর্ব করে, নানা বিজাতীয় উপদ্রবের মধ্যেও বাঙালীর শুধু টিঁকে থাকাটাকেই যথেষ্ট মনে করে, বাঙালীর ব্যাঙের আধুলির গর্বের আর সীমা সমাপ্তি নেই যাদের মুখে, তাদেরই এই অসঙ্গতিকে সত্যনিষ্ঠ কবি ব্যঙ্গ করেছেন। বলা বাহুল্য, উক্তিতে কবির গভীর বেদনাই কৌতুকের মতো প্রতীয়মান।

ব্যঙ্গ প্রকরণের মধ্যে একশ্রেণীর কবিতায় কবি গভীর বেদনাধারাকে হাস্যের ফেনিলোচ্ছলতা দিয়ে গোপন করেছেন। যে বেদনা too deep for tears অনেক সময় তা প্রকাশ পায় হাস্যে। এই হাসি—দুর্বল মানুষের আত্মগ্লানির আত্মধিক্কারের করুণ হাসি ঃ

পাঁচশ' বছর এমনি ক'রে আসছি সয়ে সমুদায়,
এটা কি আর সইবে না ক দু'ঘা বেশী জুতার ঘায় ?
সেটা নিয়ে মিছে ভাবা দিবি দুঘা দে না বাবা,
দুঘা বেশী দুঘা কমে এমনি কি আসে যায় ?
মোরা বেটা মোরা পাজি—যা বলিস তাই আছি রাজি
রাজার নন্দিনী প্যারী যা বলিস তাই শোভা পায় ॥

পশুবলে নির্যাতিত বীরজাতির আক্ষেপ এতে কৌতুকের রূপ ধরেছে। নিজের মনের আসল ভাব গোপন ক'রে প্রবলকে উপাসনা করতে হয়—তার চেয়ে হাসির ব্যাপার আর কী আছে ?

আমরা সব রাজভক্ত রাজভক্ত ব'লে চেঁচাই উচ্চরবে,
কারণ সেটার যতই অভাব ততই সেটা বলতে হবে।
আমাদের ভক্তি যা-এ মানের প্রাণের পেটের দায়ে,
দেখে সে-রক্ত আঁখি ভক্তি যা তা ছুটে পালায়।
সাধে কি বাবা বলি গুঁতোর চোটে বাবা বলায় !

দুর্বলের উপর প্রবলের উৎপীড়নের বিরুদ্ধে ব্যঙ্গহাস্য যে কত শাণিত কত মর্মভেদী হতে পারে তা রসিকতার ছদ্মে কবি দেখিয়েছেন—বর্তমান প্রগতিবাদের চরম কথারই এতে ইঙ্গিত রয়েছে।

এতদিন সকল দেশের ধনী অভিজাত ও উচ্চপদস্থ মানুষগুলো ও বিদেশী শাসক জাতির লোকেরা দরিদ্রের প্রতি যে আচরণ করত—'আমি যদি পিঠে তোর ঐ'—কবিতায় তারই দৃষ্টান্ত দিয়ে কবি তাদের মনোভাবকে এই কবিতায় দাম্ভিক প্রবল উৎপীড়কের মুখের ভাষায় অপূর্ব বাণীরূপ দিয়েছেন :

আমি যদি পিঠে তোর ঐ লাথি একটা মারিই রাগে,
তোর তো আস্পর্ধা বড়—পিঠে যে তোর ব্যথা লাগে !
আমার লাথি খেয়ে কাঁদা ন্যাকামি নয় ? শুয়োর গাধা !
দেখছি যে তোর পিঠের চামড়া ভরে গেছে জুতোর দাগে।
বরং উচিত—আগে আমার পায়ে হাত তোর বুলিয়ে দেওয়া,
পরে ধীরে ধীরে নিজের পিঠের দাগটা মুছে নেওয়া।
পরে বলা ভক্তিভরে : "প্রভু, অনুগ্রহ ক'রে
পৃষ্ঠে তো মেরেছ লাথি—মারো দেখি পুরো ভাগে।
দেখি সেটা কেমন লাগে !

আষাঢ়ে কাব্যের "কর্ণবিমর্দন কাহিনী" একটি অপূর্ব কবিতা। সংস্কৃত পজ্‌ঝটিকা ছন্দে মোহমুদ্গরের অনুসরণে এইরূপ রসঘন কবিতা পূর্বেও কেহ লেখেন নি—পরেও কেউ লেখেন নি। এ-ধরনের কবিতা অসামান্য ছন্দোজ্ঞান

না থাকলে কেউ লিখতে পারেন না। এ-কবিতা সংস্কৃতজ্ঞ শিক্ষিত পাঠকদের জন্য। এর কৌতুকরস ব্যঙ্গাত্মক বিষয়বস্তুর উপর ততটা নির্ভর করছে না, যতটা নির্ভর করছে পদগুম্ফন ও বাগ্‌বিন্যাসের উপর—

প্রথম চরণ :—'জানো না কি কদাচন মূঢ়' পড়লেই মোহমুদ্গরের 'মূঢ় জহীহি ধনাগম তৃষ্ণাং' মনে পড়বে। "যখন পরাজয় খলু অনিবার্য। আসি হি পুরুষানুক্রম ভৃত্য"—ইত্যাদি চরণে খলু, হি ইত্যাদি সংস্কৃত অব্যয়শব্দ প্রয়োগে হাস্যরস উৎসারিত হয়েছে।

যদি বল সেটা শ্যালী ভিন্ন
অপর কার নয় আদর চিহ্ন,
তবু যদি সাহিব অল্পে স্বল্পে
টানে—হয় তা মধুর বিকল্পে
কর্ণাকর্ষণ অতিশয় তুচ্ছ,
যা কর সাহিব নাড়িব পুচ্ছ…

এই কয় চরণে কবিতার শ্লেষ-ধিক্কারটি ফুটেছে চমৎকার। কর্ণমর্দনকে বরণীয় প্রমাণ করতে কবি যে ধাপে ধাপে এগিয়েছেন তাতে উচ্চ শ্রেণীর আর্ট দেখা যায়।

এ-শ্রেণীর কবিতায় দীর্ঘ স্বরের দীর্ঘ উচ্চারণ না করলে ছন্দঃপতন হবে, এর প্রতি পর্বে চার মাত্রা নির্দিষ্ট : ৪+৪+৪+৪

কা তব। কান্তা। কস্তে। পুত্রঃ।
কর্ণ বি। মর্দন। মর্ম কি। গূঢ়।
হুজুর হু। জুর বলি। জীবন। মরণে।
একে। বারে। মাথা। ঘোরে।
লেখা। সোজা। গদ্যে। পদ্যে।

পরাধীন জীবনের একটা তুচ্ছ কথাকে সংস্কৃত ছন্দের উচ্চ-গ্রামের মর্যাদা দেওয়ার অসঙ্গতিই এখানে হাস্যরসকে গাঢ় ক'রে তুলেছে।

"কলিযজ্ঞ" আর একটি সংস্কৃত ছন্দে রচিত ব্যঙ্গ কবিতা। এর ছন্দ অনুষ্টুপ। এই কবিতাতেও বাক্যবিন্যাস্ ও শব্দগুম্ফনে প্রচুর কৌতুকরস উপচিত হয়েছে, যেমন :

১। প্যাণ্ডেলের তলে আজি ইংরাজীতে খদী (খই) ফুটে।

২। কেবল বক্তৃতা জোরে করে রাজ্য চ বৈ তু হি।

৩। শাস্ত্রীয় কি অশাস্ত্রীয় কচুপোড়া হি ভক্ষণ।

"বাঙালী মহিমা" কবিতায়

বাঙালী মহিমা কীর্তিকলাপ কাহিনী যদি
শুন মন দিয়া বাবা, পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে।

এ কবিতাটির কেবল প্রকাশভঙ্গী নয়, বিষয়বস্তুও সমান কৌতুকাবহ।

দ্বিজেন্দ্রলালের স্বজাতিপ্রীতি মূলতঃ দুটি ধারায় প্রবাহিত। একটি ধারায় জাতীয়তাবোধের উদ্দীপন, অন্য ধারায় জাতীয় জীবনের দোষত্রুটিগুলিকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখানো এবং সেই সঙ্গে বলা—'আবার তোরা মানুষ হ'। এই চোখে আঙুল দিয়ে দেখানোর জন্যই তাঁকে স্বজাতি বিদূষণ করতে হয়েছে রঙ্গেব্যঙ্গে। এক সময় বাঙালী শুধু বক্তৃতার জোরে দেশোদ্ধার করতে চেয়েছিল—এবং সেই বক্তৃতাবিদ্যায় অসাধারণ পারদর্শিতাও দেখিয়েছিল। কবি সেই বক্তৃতার আস্ফালনকে ব্যঙ্গ করেছেন এই কবিতায়। যে জাতির মধ্যে এখনো জাতীয় সমস্যা উঠে—

শাস্ত্রীয় কি অশাস্ত্রীয় কচুপোড়া হি ভক্ষণ—সেই জাতির পক্ষেই বক্তৃতার জোরে দেশোদ্ধারের জন্য প্রয়াস ও প্রত্যাশা সম্ভব।

স্বজাতিবিদূষণ আত্মবিদূষণেরই তুল্য, কাজেই রসিক লোকেরা এইরূপ ব্যঙ্গরচনায় কোন দেশে দোষ ধরে না।

"ভট্টপল্লীতে সভা"—কবিতায় কবি বাঙ্গালী চরিত্রের আর একটি বৈশিষ্ট্য নিয়ে ব্যঙ্গ করেছেন। তুচ্ছ বিষয় নিয়ে উড়ো তর্ক করা এবং তর্কে বিদ্যাবত্তা প্রকাশ ও অতিরিক্ত উত্তেজনা প্রকাশ বাঙ্গালী-চরিত্রের একটা লক্ষণ। লিঃ-ষজ্ঞে এক শ্রেণীর শিক্ষিত সমাজ তাঁর ব্যঙ্গের লক্ষ্য হয়েছে। 'শাস্ত্রীয় কি অশাস্ত্রীয় কচুপোড়া হি ভক্ষণ' এবং 'পাত্রাধার তৈল কিংবা তৈলাধার পাত্র' বাঙালী শিক্ষিত লোকেদের কাছেও দুই-ই গুরুতর সমস্যা।

"হরিনাথের শ্বশুরবাড়ী যাত্রা", "অদল বদল" ইত্যাদি হাস্যরসের কাহিনীমূলক কবিতা। এই শ্রেণীর কবিতা পূর্বে কখনও লেখা হয়নি বাংলা ভাষায়, পরেও আর হয়নি।

অবিশ্রান্ত কৌতুক রসধারার কলকল্লোল অত্যন্ত দ্রুতবেগে কাহিনীর পরিখাত দিয়ে বয়ে চলেছে। এই সকল কাহিনী-কবিতায় প্রধানতঃ হাস্যরস উচ্ছ্বসিত হয়েছে—কৌতুকাবহ পরিস্থিতি থেকে। এইরূপ পরিস্থিতি সৃজন একটা যেন পৃথক আর্ট। এই আর্ট চিত্রাত্মক। এসব হ'ল রঙ্গরসের রচনা, এতে ব্যঙ্গধারাও মিশ্রিত হয়েছে মাঝে মাঝে। ব্যঙ্গরসের অভিব্যক্তিতে আমরা হাসি মনে মনে। এগুলিতে আমাদের সর্বাঙ্গ চঞ্চল হয়ে ওঠে—এ হাস্যবেগ সংবরণ করা কঠিন।

এই সব কবিতার প্রত্যেক চরণ এমনভাবে রচিত, যা কৌতুক রসের পোষকতা করে। একটিও নীরস চরণ দেখা যায় না।

যদৃচ্ছাক্রমে কতকগুলি চরণ উদ্ধৃত করি ঃ—

১। আরও শুনেছিলাম তোমার বর্ধমানে সাকিম,
আরও শুনেছিলাম যেন তুমি একটা হাকিম।
বল্লেন গোপী, হাঁ হাঁ আমি কাছাকাছি তাই,
ডেপুটির এক শালার আমি পিসতুত ভাই।

২। উনি আবার জজ বদমায়েস পাজি, আরে থেলে যা!
নিজে চুরি করে নালিশ—যা বেটা যা জেলে যা।

৩। তাঁর এ সব কসুর
ইন্দোঃ কিরণেষ্বিবাংক যেত সবই ঢেকে,
খরচ হ'ত না-ত দিতে কারু পকেট থেকে।
(কুমারসম্ভবের একোহি দোষো গুণসন্নিপাতে
নিমজ্জতীন্দোঃ কিরণেষ্বিবাংকঃ এই চরণের অংশটি—
কৌতুকরসে পরিষিক্ত হয়েছে এখানে।)

৪। এখন বুড়োর হাতের উপর ব'সে ব'সে রয়ে
ঝুলছিল সময়টা যেন বেশি ভারী হয়ে।
কল্লেন তখন ভদ্রলোকটি মনস্থ অগত্যা
সময়টাকে নিয়মমত করিবারে হত্যা।
(ইংরাজি ইডিয়মের বাংলা তর্জমা দিয়ে কৌতুক সৃষ্টি)।

৫। বেটা ষণ্ডামার্ক বজ্জাৎ আবার বলে জামাই, এঃ
অর্ধেক দাড়ি গেল কোথা ? ফেলেছি তা কামাইয়ে।

৬। চাদরখানি বুকে বাঁধা পরা হয়নি খুলে
কি জানি কেউ পাছে তার যে নীচে আছে
ষ্টার প্যাটার্ণ সোনার চেন তা দেখতে যায় বা ভুলে।

ব্যঙ্গকবিতা রচনায় দ্বিজেন্দ্রলাল যদি হ'ন সিদ্ধ, তবে রঙ্গকবিতা রচনায় তিনি সিদ্ধতর। ব্যঙ্গরচনায় কবি কাপট্য, ইতরতা, কাপুরুষতা ইত্যাদিকে ব্যঙ্গ করেছেন—আর রঙ্গকবিতাগুলির উপজীব্য অসঙ্গতি। রঙ্গরচনাগুলিতে জ্বালা নেই, বিদ্রূপ নেই, কোন শ্রেণী বা গোষ্ঠীর প্রতি বিদ্বেষ বা ঘৃণা নেই। এইগুলি নির্মল অবিমিশ্র হাস্যরসের উৎস।

রঙ্গ-প্রকরণের কবিতাগুলির মধ্যে তানসান-বিক্রমাদিত্য সংবাদ একটি উল্লেখযোগ্য। কেবল অসঙ্গতভাবে বাক্যবিন্যাসের দ্বারা এখানে তিনি রঙ্গরসের সৃষ্টি করেছেন। তথাকথিত প্রেম, বিরহ ইত্যাদি নিয়েই তিনি অনেক রঙ্গরসের কবিতা লিখেছেন।

ইংরাজি বাংলায় মিশ্রিত প্রেমতত্ত্ব, চাষী যুবকের মুখের ভাষায় রচিত প্রেমাকুলতা (চাষার প্রেম ও চাষার বিরহ), বিরহতত্ত্ব, বিরহ যাপন ইত্যাদি কবিতার রঙ্গরস বিশেষরূপ উপভোগ্য। দ্বিজেন্দ্রলাল রসের কবি হলেও তথাকথিত প্রেমের যে পনরো আনাই মোহ ছাড়া কিছু নয়, তাই বুঝতেন। তাই 'প্রণয়ের ইতিহাসে' মোহভঙ্গের একটি চমৎকার বাণীরূপ দিয়েছেন—

শঙ্কা হ'ত প্রিয়া পাছে কখন ক'রে অভিমান
উর্বশীর ন্যায় পেখম তুলে হাওয়ার সঙ্গে মিশে যান।
নকল-নবিশ প্রেমের পেশায় হয়ে রৈতাম বিভোর নেশায়,.
প্রাণের সঙ্গে দিয়ে কে সায় খাম্বাজ সঙ্গে বেহাগ মেশায়,
মরি আহা আহা রে !
ভাবলাম বাহা বাহা রে !
দেখলাম পরে চাঁদের করে নেহাৎ প্রিয়া তৈরি নন।
বচনসুধায় যায় না ক্ষুধা, বরং শেষে জ্বালাতন।

যদি একটু দাবাখেলায় আসতে দেরি রাত্তিরবেলায়
অম্‌নি তর্ক গুরু চেলায় পালাই তাঁর বকুনির ঠেলায়
পগারে কি পাহাড়ে !
ভাবলাম বাহা বাহা রে !

কবিরা বিরহ নিয়ে কী হা-হুতাশই না করেছেন ! আর অশ্রুর বন্যা বইয়ে দিয়েছেন ! আমাদের কবি মনে করেন—বিরহের বাঁধন-হারা কাঁদন দিয়ে বড় বাড়াবাড়ি হয়েছে। আমাদের কবি একটি গানে তাই বলেছেন—'বিরহ আহুতি ভিন্ন প্রেমের আগুন জ্বলে না।' তাই যদি হয় তবে বিরহদুঃখ নিয়ে এত আহা উহু কেন ? বিরহ একটা দুঃখ বটে, তবে কতকটা সখের দুঃখ। তা নিয়ে অনায়াসে রঙ্গ করা যায়। যেমন—

বিরহ এমন নিদারুণ যে—
এখন ক্ষুধা পেলেই খাই আর ঘুম পেলেই ঘুমোই।
রোচেনাক মুখে কিছু পাঁঠার ঝোল আর লুচি বই।

কেবল পুরুষের পক্ষ থেকেই নয়, নারীর পক্ষ থেকেও বিরহ নিয়ে কবি রঙ্গ করেছেন 'বসন্তবর্ণনা' কবিতায়।

পতি কাছে নাই পতি বিনা আর কে আছে নারীর সম্বল,
কাঁচা আঁব দুটো পেড়ে আন সখি গুড় দিয়ে রাঁধি অম্বল।
হেরি যে বিশ্ব শূন্যময়, নে
খেয়ে নিয়ে শুধু বিরহ শয়নে,
পড়িগে অর্ধমুদিত নয়নে
গোলেবকাওলি গ্রন্থ ॥
নিয়ে আয় সখি বরফ না হলে মরি যে মলয় বাতাসে।
নিয়ে আয় পাখা এল নাক পতি আজ যে মাসের সাতাশে।
নিয়ে আয় পান তাস আন ছাই,
বিরহের এত জ্বালা ম'রে যাই !
দাঁড়াইয়ে কেন হাসিস লো ভাই,
বাহির করিয়ে দন্ত !

এই রঙ্গলীলার মধ্যে বিরহ সম্বন্ধে Poetic convention—সঙ্গতি রীতিকেও ব্যঙ্গ করা হয়েছে।

রঙ্গ রচনার মধ্যে উল্লেখযোগ্য 'এমন ধর্ম নাই', 'স্ত্রীর উমেদার', 'যেমনটি চাই তেমন হয় না', 'প্রাণান্ত', 'বিষ্যুৎবারের বারবেলা', 'বিলেত', 'সন্দেশ'। রঙ্গলীলার কবিতায় বিষয়বস্তুটাই বড় নয়, বাচনভঙ্গীটাই বড়। হাস্যরস-সৃষ্টির টেকনিকটা না বুঝলে পরিপূর্ণ রসসম্ভোগ করা সম্ভব নয়। ছন্দও কৌতুক-সৃষ্টিতে কম সাহায্য করেনি—মিলের তো কথাই নেই—অপ্রত্যাশিত মিলের কৌশল খুবই কৌতুকাবহ। অপ্রত্যাশিত শব্দের আবির্ভাবে যে চমকের সৃষ্টি হয়—তাও রসের পুষ্টিতে সহায়তা করেছে।

আমাদের লোকসাহিত্যে 'রাধা ও কৃষ্ণ'কে নিয়ে রচিত শুক-সারীর বিবাদের কবিতা আছে। এই রসকলহের ঢঙ একটা conventional form-এ দাঁড়িয়ে গেছে—সেই ফর্মের, সেই ভাষার ও সেই ভাবের চমৎকার প্যারডি কৃষ্ণরাধিকা সংবাদ। এ হ'ল অবিমিশ্র রঙ্গরচনা, কিন্তু এতেও ব্যঙ্গের মিশ্রণ আছে—পরের গুণপনার ব্যাখ্যান কোন মানুষেরই সহ্য হয় না, নিজের স্তব শুনে সবাই খুশী হয়—এমন কি প্রেমিক প্রেমিকার সম্পর্কের মধ্যেও এই দুর্বলতা আছে। কবি তাকেই ব্যঙ্গ করেছেন। চমৎকার এর উপসংহার—

কৃষ্ণ বলে এমন বর্ণ দেখিনি ত কভু!
আর রাধা বলে হাঁ আজ সাবান মাখিনি ত তবু,
নইলে আরো সাদা।
কৃষ্ণ বলে তোমার কাছে রতি কোথায় লাগে?
আর রাধা বলে এসব কথা বললেই হ'ত আগে—
গোল ত মিটেই যেত।

মিল দেওয়ার চাতুর্য দ্বিজেন্দ্রলালের অনন্যসাধারণ। অপ্রত্যাশিত দুর্লভ মিলের চমক যে কিরূপ কৌতুকরসের সৃষ্টি করতে পারে—তা দ্বিজেন্দ্রলালের আগে কেউ উপলব্ধি করেন নি। শুধু মিল নয়, যমক অনুপ্রাসের কৌশলের প্রয়োগেও তিনি হাস্যরসের সৃষ্টি করেছেন। কতকগুলি দৃষ্টান্ত দিই—

পক্ষীর মাংস লক্ষ্মীর মতো ছেলে বেলায় খাননি কে ?
ভবনদীর পারে গিয়ে বিড়াল বসেছেন আহ্নিকে।

*　　　*　　　*

গদ্য পদ্য লিখছে সবাই কিনছে নাক কিন্তু কেই।
কাটছে বটে পোকায় কিন্তু আলমারি কি সিন্দুকেই।

*　　　*　　　*

রাধাকৃষ্ণ রঙ্গমঞ্চে নাচছেন গিয়ে আনন্দে।
ব্যাখ্যা করছেন হিন্দুধর্ম হরিঘোষ আর প্রাণধন দে।

*　　　*　　　*

কাচিৎ ভগ্নী সহ দীক্ষিত হব উক্ত ধর্মে
এমম সময় বিয়ে হয়ে গেল হিন্দু ফর্মে ॥

*　　　*　　　*

নৌকা ফীসন ডুবিছে ভীষণ রেলে কলিসন হয়।

*　　　*　　　*

পরে মিলে আমার আটটা মামায় বাবার সেই আটশালায়
হ'তে না হ'তে বড় দিয়ে চড় পাঠিয়ে দিল পাঠশালায় ॥

স্বচ্ছন্দ অবলীলায় যখন প্রথম শ্রেণীর মিল ঘন ঘন এসে পড়ে, তখনও মিলের অনায়াস চাতুর্য ও কৃতিত্ব দেখে আমরা কৌতুক অনুভব করি। যেমন—

বরং শেষে মাথার রতন লেপ্টে রৈলেন আঠার মতন
বিফল চেষ্টা বিফল যতন স্বর্গ হ'তে হলো পতন
রচে ছিলাম যাহারে
ভাবলাম বাহা বাহা রে।

*　　　*　　　*

আমরা বিলাত-ফেরতা ক' ভাই
আমরা সাহেব সেজেছি সবাই,
তাই, কি করি নাচার স্বদেশী আচার
করিয়াছি সব জবাই।

আমরা ছেড়েছি টিকির আদর,
আমরা ছেড়েছি ধুতি ও চাদর,
আমরা হ্যাটবুট আর কোটপ্যাণ্ট পরে
সেজেছি বিলাতী বাঁদর।

*　　　*　　　*

কোকিল কালো ভোমরা কালো
আমরা কালো তোমরা কালো
মুচি মিস্ত্রী ডোমরা কালো॥

*　　　*　　　*

পত্নীর চাইতে কুমীর ভালো—বলে সর্ব শাস্ত্রী।
কুমীর ধরলে ছাড়ে, তবু, ধরলে ছাড়ে না স্ত্রী।

*　　　*　　　*

আষাঢ়ের কবিতাগুলিতেও মিলের চাতুর্যের মধ্যে হাস্যের প্রেরণা য়েছে। কতকগুলি দৃষ্টান্ত—

১। শুনলেন এই কথাগুলো বদন ক'রে ব্যাদান
কি কর্বেন আর? বেঞ্চে বসে স্ত্রীয়ের জন্যে হ্যাদান।

২। গালাগালি? মশায় আপনার মক্কেল অতি শুয়োর,
কোলা ব্যাং ওর যাওয়া উচিত ভিতরেতে কুয়োর।

৩। বৃদ্ধ জজ! কাদম্বিনীই তোমার যোগ্য ভার্যা,
গোপীকৃষ্ণ, সুশীলাই তোমার স্ত্রী, আর যার যা
অন্য দাবি ডিস্‌মিস্‌···

৪। কি হয়েছি দেখ হায় এ দেহ কি রহে?
তোমারি বিরহে প্রভু তোমার বিরহে।

৫। বোধ হয় রূপের তরাসে পাছে কারো জ্বর আসে।

৬। ধন্য বুদ্ধিবল! যুদ্ধে কভু শির দেও নি কারেও বন্ধকী:
যদি বাহুবল অভাব—বুদ্ধিতে পুষিয়ে নিয়েছ, মন্দ কি!

কবল মিলের চাতুর্য নয়, প্রত্যেক চরণে পদবিন্যাসের সূক্ষ্ম ধরনের চাতুর্য

আছে। সেগুলি যাদের চোখে পড়ে তারাই পরিপূর্ণ উপভোগ করে। গানে বা আবৃত্তিতে সেগুলির উপর emphasis (জোর) দিলে তবেই শ্রোতার অবধান আকৃষ্ট হয়।

এবার আমাকে থামতে হয়। দ্বিজেন্দ্রলালের কথা ফুরিয়েও ফুরোয় না। আমার কবি-জীবনের প্রথম যৌবনের উপাস্য কবি—দ্বিজেন্দ্রলাল। তাঁর জীবদ্দশায় আমার কুন্দ-কিশলয় ছাড়া কোন কবিতার বই বেরোয় নি। তখনকার লেখা তো নেহাৎ কাঁচা। রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন—"তোমার এই কাঁচা বয়সের লেখার উপর বেশি নির্ভর কোরো না।" আমার পরম সুহৃৎ দেবকুমার আমাকে সঙ্গে ক'রে নিয়ে গিয়েছিলেন দ্বিজেন্দ্রলালের চরণমূলে। দ্বিজেন্দ্রলালও ঠিক এই কথাই বলেছিলেন—"নিরুৎসাহ হয়ো না—সাধনা করো, সিদ্ধিলাভ করবে।" একেই আমি তাঁর আশীর্বাদ মনে ক'রে সুরধাম থেকে ফিরেছিলাম।

তারপর বেশী দিন তিনি জীবিত ছিলেন না। ভারতবর্ষ প্রকাশের আগে আমার "নন্দপুরচন্দ্র বিনা বৃন্দাবন অন্ধকার" কবিতাটি পাঠিয়েছিলাম। পণ্ডিত অমূল্য বিদ্যাভূষণের মুখে শুনেছিলাম তাঁর সে-কবিতাটি ভালো লেগেছিল এবং ভারতবর্ষের প্রথম সংখ্যার জন্য নির্বাচন ক'রে গিয়েছিলেন। বেতালভট্ট উপনামে হাসির কবিতা ও গান আমি লিখি। আমার রঙ্গব্যঙ্গের রচনায় দ্বিজেন্দ্রলালই আমার গুরু। এরচনা আমার যৎসামান্য গুরুদক্ষিণা। তাঁর সঙ্গে যখন আমার চাক্ষুষ পরিচয় তখন তাঁর জীবনে সায়াহ্নকাল।

তাঁর শেষ জীবনের অনেক কবিতায় বিদায় পূরবীর সুর তখন বাজছিল—নিদর্শনস্বরূপ তাঁর শেষ জীবনে রচিত একটি দশপদী এখানে উদ্ধৃত করি। এতে তিনি সবার কাছ থেকে বিদায় নিয়েছেন—

করেছি কর্তব্য যাহা, সেইটুকুই আমার যাহা জমা।
করেছি অন্যায় যাহা, সেইটুকুই খরচ, দিও বাদ।
তোমাদের যেটুকু দিয়েছি দুঃখ, কোরো ভাই ক্ষমা।
তোমাদের যেটুকু দিয়েছি সুখ, কোরো আশীর্বাদ।

তোমাদের মধ্যে আমি আসিনি ক করতে বিসম্বাদ,
কেড়ে নিতে কারো অংশ, দিতে কারো মনে দুঃখ ভাই!
দুঃখ যদি দিয়ে থাকি ভ্রান্তিবশে—ক্ষম' অপরাধ।
বিনিময়ে দুঃখ যদি পেয়ে থাকি, কোনো দুঃখ নাই।
জমার চেয়ে খরচ বেশি হ'য়ে থাকে, তোমরা দোষী নহ।
জমা যদি বেশি থাকে—তোমাদেরি সেটা অনুগ্রহ।

দ্বিজেন্দ্রলাল

নারায়ণ চৌধুরী

১

কবি নাট্যকার গীতিকার ও সুরকার দ্বিজেন্দ্রলাল রায় বাংলা সাহিত্য ও সঙ্গীত জগতের একজন দিক্‌পাল। কিন্তু তাঁর প্রতিভার সম্যক্ সমাদর তাঁর জীবদ্দশায় হ'য়েছে ব'লে আমাদের বোধ হয় না। কতকগুলি পারিপার্শ্বিক কারণে দ্বিজেন্দ্রলালের জনপ্রিয়তা তদানীন্তন কালে ব্যাহত হয়েছিল। সুখের বিষয় কালের অগ্রগতির ফলে পুরাতন বাধা ধীরে ধীরে অপসৃত হয়ে যাচ্ছে এবং কবি-নাট্যকার-সঙ্গীতজ্ঞ দ্বিজেন্দ্রলালের প্রকৃত শক্তির রূপটি দেশবাসীর চক্ষে প্রতিভাসিত হয়ে উঠছে। আমাদের সাহিত্যরসিক ও সমালোচক সম্প্রদায়ের মধ্যে যে দ্বিজেন্দ্রলাল সম্পর্কে একটা নূতন চেতনা দেখা দিয়েছে তার প্রমাণ গত কিছুকাল থেকে দ্বিজেন্দ্রলালের বিষয়ে আলোচনা-সমালোচনার বহুলতা। এ জিনিষ পূর্বে ছিল না। আমাদের পূর্ববর্তীরা দ্বিজেন্দ্রলালের প্রতিভার যথোচিত আদর না ক'রে তাঁর প্রতি যে-অবিচার করেছেন, এখনকার দ্বিজেন্দ্র-আলোচনার ধারার মধ্যে সেই অবিচারের শোধনের মনোভাবটি একটু চেষ্টা করলেই ধরতে-ছুঁতে পারা যায়। এটি আশার লক্ষণ সন্দেহ নেই। বিলম্ব হ'লেও আমরা-যে আমাদের সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গৌরবের স্থল দ্বিজেন্দ্রলালের ক্ষমতার প্রকৃত মূল্যায়ন ও স্বীকৃতি দানে অগ্রসর হয়েছি এ আধুনিক কালের দায়িত্ববোধেরই সূচনা করে।

২

দ্বিজেন্দ্রলালের শ্রেষ্ঠ পরিচয় তিনি কবি। যদিও তিনি দেশবাসীর নিকট প্রধানতঃ নাট্যকার রূপেই পরিচিত, তা হলেও তাঁর সমগ্র লেখক-ব্যক্তিত্বকে ছাপিয়ে উঠেছে তাঁর কবি-পরিচয়। এ নিছক কাব্যরচনার পরিমাণ বা কাব্যের ভালমন্দ বিচারের কথা নয়; এ হ'ল মানস-গঠনের বিচার। মনোভঙ্গীর দিক দিয়ে দ্বিজেন্দ্রলাল ছিলেন প্রথমতঃ ও প্রধানতঃ কবি। তাঁর

এই কবি-সত্তা তাঁর সকল রচনার মধ্যেই অনুস্যূত হয়ে আছে—তা সে কাব্যই হোক আর নাটকই হোক আর সঙ্গীতই হোক। তাঁর ঐতিহাসিক নাটক-গুলির সাফল্যের একটা প্রধান সূত্র সেগুলির অন্তরস্থ গভীর রোমান্টিক ভাবাবেগ—আর এই ভাবাবেগ যে নাট্যকারের সহজাত কবি-সত্তা থেকে উদ্ভূত, সে কথা বলাই বাহুল্য। দ্বিজেন্দ্রলালের নাটকে ঘটনার ঝনৎকার থাকলেও তাদের অন্তরালে একটি সূক্ষ্ম কবিত্বের সুর অলক্ষ্য নয়। তাঁর অঙ্কিত নাট্য চরিত্রগুলির অন্তর্দ্বন্দ্ব আর ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে মানব-জীবন আর মানবমন সম্পর্কে কবিজনোচিত রহস্যবোধেরই পরিপ্রকাশ ঘটেছে। কোন কোন সমালোচক বলেন, দ্বিজেন্দ্রলালের নাট্যরচনায় উচ্ছ্বাস আছে, আতিশয্য আছে। কথাটা হয়তো সত্য, কিন্তু এই সত্য স্মরণ কালে এ-কথাও আমাদের বিস্মৃত হওয়া উচিত নয় যে, এই উচ্ছ্বাস বা আতিশয্যের মূলে আছে নাট্যকারের মজ্জাগত কবিস্বভাব। রোমান্টিক আবেগ বা অনুভূতির প্রাবল্য কবি-স্বভাবে দূষ্য নয়, যদিও তা কোনো কোনো মহলে ভাবব্যতিরেক অন্যায় চিহ্নিত হবার সম্ভাবনা আছে। সে যাই হোক, দ্বিজেন্দ্রলালের রচনাবলীতে কাব্যসুরভি বিকীর্ণ হয়ে আছে, আর এটি যে তাঁর সমস্ত প্রকার রচনার একটি প্রধান আকর্ষণ সে কথা স্বীকার ক'রে নিলে দ্বিজেন্দ্র-রচনার সমাদর আরও সহজ হতে পারে।

কেউ কেউ বলেন কবি হিসাবে দ্বিজেন্দ্রলালের হাসির গানগুলিই সবচেয়ে সার্থক রচনা। এ কথা কবির কাব্যের প্রকৃত মূল্যায়ন নয়। হাসির গান দ্বিজেন্দ্রলালের কাব্য-প্রতিভার একটি বিশিষ্ট দিক সন্দেহ নেই এবং এ ক্ষেত্রে বাংলা কাব্য-সাহিত্যে তিনি অনন্য মর্যাদার অধিকারী সে কথাও নিঃসন্দেহ; তাই বলে শুধুমাত্র হাসির গানের মানদণ্ডে দ্বিজেন্দ্রলালের কাব্যশক্তির বিচার করতে গেলে তাঁর প্রতিভাকে নিতান্ত সংকুচিত করে দেখা হয়। দ্বিজেন্দ্রলাল এ-জাতীয় সমালোচনার যোগ্য প্রত্যুত্তর নিজের ভাষাতেই দিয়ে গেছেন এই ভাবে—

হাস্য শুধু আমার সখা? অশ্রু আমার কেহই নয়?
হাস্য করে অর্ধজীবন করেছি ত অপচয়।
চলে যা রে সুখের রাজ্য, দুঃখের রাজ্য নেমে আয়।
গলা ধরে কাঁদতে শিখি গভীর সহবেদনায়;

এ কথা তিনিই লিখতে পারেন যিনি কেবলমাত্র আমোদ-প্রয়াসী সুখ-ব্যবসায়ী নয়; যাঁর মন গভীরত্বের সন্ধানী; যিনি দুঃখের গহনে তলিয়ে গিয়ে জীবন-রহস্যের মর্মোদ্ঘাটনে সচেষ্ট; সর্বোপরি যাঁর প্রাণ মানব-বেদনায় কাতর। দ্বিজেন্দ্রলালের গভীর মানবপ্রীতি তাঁকে নিছক সুখপ্রয়াসী জীবনের স্তর থেকে ঊর্ধ্বলোকে উন্নীত করেছে। কবির প্রাণে মানবদুঃখবোধ কত প্রগাঢ় ছিল, সমুন্নত জীবনাদর্শের মহিমার প্রতি সম্ভ্রমচেতনা কত বদ্ধমূল ছিল, নীচের দুটি কাব্য-পংক্তিতেই তার নিঃসংশয় প্রমাণ মেলে :

পরের দুঃখে কাঁদতে শেখা—তাহাই শুধু পরম নয়!
মহৎ দেখে কাঁদতে জানা—তবেই কাঁদা ধন্য হয়।

এক দুই লাইনের শব্দ-সমাবেশের মধ্যে এমন এক গভীর ভাবের দ্যোতনা প্রকাশ পেয়েছে, যা শুধু মহদভিপ্রায়যুক্ত দরদী কবির রচনা-মুখেই উচ্চারিত হওয়া সম্ভব। হাস্যমাত্রসার হাল্কা চটুল লেখনীর কাজ নয় এরকম গূঢ়-গম্ভীর অনুভূতি শুদ্ধ ভাবকে শব্দায়িত করে।

কিংবা 'ত্রিবেণী' কাব্যের এই কবিতাংশটিও এই সঙ্গে মিলিয়ে বিচার করে দেখা যেতে পারে—

ছিলাম সেদিন শ্লেষস্মিত,
উচ্চকণ্ঠ, ধর্মে অবিশ্বাসী, গর্বস্ফীত,
উচ্ছৃঙ্খল। আজি হইয়াছি চিন্তা-নত,
জীবনের গূঢ়তত্ত্ব-জিজ্ঞাসু নিয়ত।
গান গাই নিম্নতর ঠাটে, কম্প্র, ধীর,
ম্লান, ব্যথাপ্লুত, অশ্রুগদ্গদ, গম্ভীর।

এখানেও সেই একই ভাবের দ্যোতনা আমরা লক্ষ্য করি। কবির মনোজগতের বিবর্তন ও রূপান্তরের ইতিহাস এই কটি চরণে সার্থকভাবে বিবৃত আছে। কবিকে শুধুমাত্র 'শ্লেষস্মিত' মনে করলে তাঁর সৃজনীব্যক্তিত্বের আংশিক পরিচয়মাত্র লওয়া হয়। অথবা 'আলেখ্য' কাব্যের "সত্যযুগ" কবিতার একটি অংশ লওয়া যাক।

স্তব্ধ রাত্রির অন্ধকারে জলন্ত নক্ষত্রপুঞ্জে চেয়ে দেখি দূরে,
ভাবি এত মহাজ্যোতি কি মহৎ উদ্দেশে উর্ধ্বে মহাশূন্যে ঘুরে ?
কোথায় সীমা পরিব্যাপ্তির ? কি স্বচ্ছ কি স্তব্ধ-আকাশ
কি গাঢ় ! কি আলো !
আচ্ছা—ঐ যে মহাশূন্যের কতখানি অন্ধকার ? আর কতখানি আলো ?

এই কবিতাংশের মধ্যেও একটা বিশুদ্ধ ভাবের মহিমা, কল্পনার গাম্ভীর্য প্রকাশ পেয়েছে, যা উচ্চপর্যায়ের কবিত্ব-শক্তির দ্যোতক। এর ছন্দোভঙ্গীর মধ্যে কিছুটা হাল্কা ছাঁদ থাকলেও থাকতে পারে, তবে ভাবের গাম্ভীর্যে সেই লঘুতার পূরণও শোধন হয়েছে।

এইরকম আরও নানা কবিতাংশ থেকে প্রমাণ দেওয়া যায় যে, পরিণত জীবনে কবির ভাবজগতে এক গভীর পরিবর্তন সংসাধিত হয়েছিল। প্রথম যৌবনের আবেগোচ্ছ্বাস, ভাবের উদ্দামতা ও হাস্যের উচ্ছলতা পরিণত বয়সের চিন্তা ও বেদনার প্রলেপে অনেকটাই সংহৃত ও পরিম্লান হয়ে এসেছিল। পরের দুঃখে দুঃখানুভবের মহৎ মানবীয় দীক্ষায় তাঁর কবি-ব্যক্তিত্বের গোত্রবদল হয়েছিল বলা চলে। কবির যে-সকল গান সুরযোজনার ঐশ্বর্যের দিক্ ছাড়াও বাণীর সম্পদে বিশেষভাবে গরীয়ান্—সেগুলির ভাব পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে তার মধ্যে কল্পনার বলিষ্ঠতা আর গাম্ভীর্যটাই সমধিক বলবৎ, হাসির গানের শ্লেষভঙ্গিমা আর হাস্যস্ফীতি তাদের ভিতর চেষ্টা করলেও খুঁজে পাওয়া যাবে না। "ঐ নীলাকাশের অসীম ছেয়ে ছড়িয়ে গেছে চাঁদের আলো" গানের কাব্যমাধুর্য অথবা "ঐ মহাসিন্ধুর ওপার হতে কী সঙ্গীত এক ভেসে আসে" গানের উদার ও গম্ভীর কল্পনা দ্বিজেন্দ্র-লালের কবিসত্তার গভীর-গম্ভীর প্রশান্তির মহিমাটিকেই বিশেষভাবে স্মরণ করিয়ে দেয়। প্রত্যেক মহান্ কবির ব্যক্তিত্বের মধ্যেই অনেকগুলি খণ্ড-ব্যক্তিত্ব একসঙ্গে বিধৃত থাকে। এই ক্ষেত্রে এক খণ্ড-ব্যক্তিত্ব অপর খণ্ড-ব্যক্তিত্বের পরিপূরক হয়ে দেখা দেয় এবং সব মিলিয়ে এক অখণ্ড বা পূর্ণ ব্যক্তিত্ব গড়ে ওঠে। যে রবীন্দ্রনাথ বলাকা বা পূরবীর উচ্চভাবমণ্ডিত চিন্তাসমৃদ্ধ কবিতাগুলি রচনা করেছেন তিনিই আবার 'খাপছাড়া'র উদ্ভট ছড়াগুলি লিখেছেন। 'গীতাঞ্জলি' ও 'পলাতকা'র কল্পনা আর প্রকাশ-শৈলীতে আকাশ-

পাতাল পার্থক্য। 'শিশু' ও 'শিশু ভোলানাথে'র কাব্যকারকে 'প্রান্তিক' আর 'সেঁজুতির' কাব্যকারের মধ্যে চিনে নেওয়া কঠিন। তা ব'লে এই সব রচনার রচনাকাররা কেউ বিভিন্ন ব্যক্তি নন; একই অখণ্ড ব্যক্তিত্বের অংশ-মাত্র। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নামধেয় এক গোটা কবি-ব্যক্তিত্ব নানা ধরনের রচনায় নানাভাবে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছেন। একই বিরাট সূর্যের জ্যোতি নিয়ে খণ্ড-বিচ্ছিন্ন অনেকগুলি গ্রহের সৃষ্টি হয়েছে। বিচ্ছিন্ন গ্রহগুলির আলোর প্রকৃতিতে তারতম্য থাকলেও এবং তার ফলে তাদের ভিতর পৃথক্ পৃথক্ ধরনের জল-হাওয়ার উদ্ভব হলেও যে মূল আলো থেকে তাদের বিচ্ছুরণ তার স্বকীয় বৈশিষ্ট্য, মহিমা আর ঔজ্জ্বল্যকে এক মুহূর্তের জন্যও ভুল করবার যো নেই। রবীন্দ্রনাথ সব মিলিয়ে এক মহান্ স্রষ্টা ও দ্রষ্টা পুরুষের ভূমিকায় সমাসীন।

দ্বিজেন্দ্রলাল সম্পর্কেও ওই কথা। হাসির গানের কবিতায় তাঁর দক্ষতা অনস্বীকার্য, কিন্তু ভুললে চলবে না যে ওই একই গানের রচয়িতার লেখনীমুখে বহু বহু কাব্যসমৃদ্ধ উদাত্ত-গম্ভীর গানও জন্মলাভ করেছে। দ্বিজেন্দ্রলালের কাব্যপ্রতিভাকে বিচার করতে হলে তাকে সামগ্রিকভাবে বিচার করতে হবে এবং এই সামগ্রিক বিচারে ধরা পড়বে দ্বিজেন্দ্রলাল মূলতঃ ওজঃগুণ ও বীর্যবত্তার কবি, হাল্কা হাসির ফুরফুরেপনায় গা এলিয়ে দেওয়ার ম'ত একদেশদর্শী চটুল কবি নন। 'আর্যগাথা'য় তাঁর জাতীয় ভাবোদ্দীপক কবিতাগুলিতে তরল বিদ্রূপ বা শ্লেষের নামগন্ধও নেই, আছে এক নবীন প্রাণের সুগভীর দেশাত্মবোধের গূঢ় দ্যোতনাময় আন্তরিকতা। এ সকল রচনায় কাঁচা বয়সের ছাপ আছে, তা হলেও তাদের জাতীয়তাবাদী অভীপ্সার ঐকান্তিকতায় চিত্ত অনুপ্রাণিত হয়। প্রথম জীবনের এই সকল স্বদেশপ্রেমাত্মক কবিতার সূত্র ধরে পরবর্তী জীবনে দ্বিজেন্দ্রলাল যে সকল স্বদেশী সঙ্গীত রচনা করেছিলেন তার ভিতর একই রকমের গাঢ় দেশপ্রেমের আকুতি ফুটে উঠেছে। উপরন্তু তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে ওজঃগুণ, দার্ঢ্য, ভাব ও শব্দচয়নের বলিষ্ঠতা। সুরযোজনায়ও একটা গভীর বীর্যবত্তার উদ্ভাস ফুটে উঠেছে।

এই সব নানা বৈশিষ্ট্য পর্যালোচনা করলে আমরা কিছুতেই দ্বিজেন্দ্রলালকে আমুদে বা হাস্যমাত্র সম্বল বা তরল মনোভাবাপন্ন কবি বলতে পারি না।

ক্লাসিকালধর্মী কবির গাম্ভীর্য, বলিষ্ঠতা ও বীর্যবত্তা তাতে পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান ছিল।

কাব্যগত মানসধর্মে তিনি যে ক্লাসিকালধর্মী ছিলেন আরও একটা ব্যাপারে তার প্রমাণ পাওয়া যায়। সে হল কবিতার ফর্ম বা গঠনশৈলী সম্পর্কে তাঁর পরিচ্ছন্নতা-বোধ। কাব্যে অস্পষ্টতার তিনি ঘোরতর বিরোধী ছিলেন। ফর্মের পরিচ্ছন্নতা তথা ঔজ্জ্বল্যের আদর্শের প্রতি যাঁর নিষ্ঠা আছে তিনি অস্পষ্টতার কোনক্রমেই সমর্থক হতে পারেন না। সকলেই জানেন কাব্যে স্পষ্টতা-অস্পষ্টতার প্রশ্নে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে একদা দ্বিজেন্দ্রলালের মতদ্বৈধ হয়েছিল। এই মতদ্বৈধ দু'জনার কবি-স্বভাবের মূলগত পার্থক্য থেকে উদ্ভূত বললেও চলে। দ্বিজেন্দ্রলাল রবীন্দ্রনাথের প্রায় সমসাময়িক। দু'জনারই জন্ম অভিজাত সম্পন্ন পরিবারে, তৎকালীন অভিজাত পরিবারের রীতি অনুযায়ী শিক্ষা-দীক্ষার ধারাটাও মোটামুটি একই খাতে প্রবাহিত হয়েছিল বলা যায়। কিন্তু অনুরূপ আবেষ্টনী আর সমাজ-পরিবেশের মধ্যে বড় হলেও তাঁদের দু'জনার কাব্যশক্তির বিকাশ এক ধারায় হয়নি। রবীন্দ্রনাথ মুখ্যত: গীতিকবি, দ্বিজেন্দ্রলালও অংশতঃ তা-ই, কিন্তু দ্বিজেন্দ্রলালের গীতি-ভাবনার মধ্যে অস্পষ্ট নীহারিকাসঞ্জাত ভাববাষ্পের স্থান নিতান্ত সংকুচিত। দুয়ের মনোভঙ্গীর পার্থক্যের জন্য এরকমটি ঘটেছে। একের কাব্যভাবনা অন্তর্লীন আত্মমুখিনতায় মগ্ন; অপরের মন মূলতঃ বহির্মুখী। রবীন্দ্রনাথের মরমী সাধনা তাঁকে অতীন্দ্রিয়ের জগতে সুদৃঢ় প্রতিষ্ঠা দান করেছে। দ্বিজেন্দ্রলালের কাব্যে আমরা মরমী কিংবা ইন্দ্রিয়াতীত অনুভূতির সুর তেমন পাই না। ইহমুখিনতা অর্থাৎ এই ধরা-ছোঁয়ার পৃথিবীর প্রতি গভীর প্রেমের সরসতার দ্বারা দ্বিজেন্দ্রলালের কাব্য নিষিক্ত, এবং যে পরিমাণে তিনি মর্ত্য মাটির কায়ার প্রেমে বদ্ধ ছিলেন, ঠিক সেই পরিমাণেই তাঁর কাব্য অস্পষ্টতার কুয়াশা থেকে মুক্ত ছিল। জীবনে অথবা কাব্যে দ্বিজেন্দ্রলালের হেঁয়ালির প্রতি আসক্তি ছিল না। তাঁর মন খাপখোলা তলোয়ারের মতই উন্মুক্ত, স্বচ্ছ, উজ্জ্বল। তিনি সহজাতভাবে কবিস্বভাববিশিষ্ট মানুষ হলেও তাঁর মধ্যে আধুনিক যুগোচিত যুক্তিপ্রীতি ও বিচারপরায়ণতার কিছু অসদ্ভাব ছিল না, আর সেই যুক্তি ও বিচারকে তিনি তাঁর কাব্যের মধ্যেও

গ্রথিত করতে চেয়েছিলেন। কবিতার ধর্ম গদ্যের ধর্ম থেকে আলাদা হলেও কবিতারও যে একটা নিজস্ব লজিক আছে এ-কথা তিনি মানতেন, আর এই নীতি তিনি তাঁর কাব্যে আগাগোড়া অনুসরণ করবার চেষ্টা করে গেছেন। ফর্মের স্বচ্ছতা ও পরিচ্ছন্নতার প্রতি ক্লাসিকালধর্মী কবিসুলভ নিষ্ঠাই তাঁর এই মানস-বৈশিষ্ট্যের কারণ।

তদুপরি, আধ্যাত্মিকতা আর ভক্তিরসের প্রতি দ্বিজেন্দ্রলালের প্রাণের টান খুব গভীর ছিল—এমন কথাও বলা যায় না। এই দিক্ দিয়েও রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে দ্বিজেন্দ্রলালের মনোভঙ্গীর তফাৎ ছিল বলে মনে হয়। কবি-পুত্র দিলীপকুমার তাঁর স্মৃতিচারণ গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে (উপক্রমণিকা, পৃঃ ২৭) লিখেছেন যে, শেষ জীবনে দ্বিজেন্দ্রলালের মন ভক্তির দিকে মোড় নিয়েছিল এবং এ কথার নিদর্শনস্বরূপ তিনি দ্বিজেন্দ্রলালের কয়েকটি ভক্তিরসাত্মক গানের উল্লেখ করেছেন—যথা, প্রতিমা দিয়ে কী পূজিব তোমারে, আর কেন মা ডাকছ আমায়, চরণ ধরে আছি পড়ে, এবার তোরে চিনেছি মা, ইত্যাদি। এ উক্তি যথার্থ হলেও দ্বিজেন্দ্রলালের মানস-গঠন—যা তাঁর কাব্যে ও সাহিত্যে প্রতিফলিত হয়েছিল—মোটামুটিভাবে পর্যালোচনা ক'রে আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি যে, অধ্যাত্মবাদ ও ভক্তিবাদের প্রতি তাঁর প্রাণে সহজ-স্বতঃস্ফূর্ত কোনো আকর্ষণ ছিল না, বরং যুক্তিবাদের দ্বারা কর্ষিত তাঁর সংশয়ী মনে ইহমুখিনতার টানটাই সমধিক প্রবল ছিল। মর্ত্য পৃথিবীর প্রেমে তাঁর চিত্ত ভরপুর ছিল। ভক্তিবাদে তাঁর বিশ্বাস যে খুব দৃঢ়মূল ছিল না তার আরও একটা প্রমাণ—তিনি অলৌকিকতায় আদৌ আস্থাশীল ছিলেন না। ভক্তির সঙ্গে অলৌকিকতার সম্পর্ক অতিশয় নিকট। ভক্তির দৃষ্টিতে প্রমাণাভাবাৎ কিছুই অসিদ্ধ হয় না। ; ভক্তি নিজেই নিজের প্রমাণ। অধ্যাত্মরসও এমনি স্বয়ং-নির্ভর স্বয়ং-সম্পূর্ণ আত্মলীন একটি অনুভূতি। সে জগতেও প্রত্যক্ষ প্রমাণের কোন দাম নেই। কিন্তু দ্বিজেন্দ্রলালের মনের গড়ন বরাবরই যুক্তিঘেঁষা ছিল ব'লে তাঁর চিন্তায় ভাবনায় প্রত্যক্ষ প্রমাণের অপেক্ষা রাখতেন এবং প্রত্যক্ষ প্রমাণ ব্যতিরেকে কোন-কিছুকে সত্য বলে গ্রহণ করতে তাঁর চিত্তের সায় ছিল না। এ কথার প্রমাণ তাঁর পৌরাণিক নাটকগুলি। দ্বিজেন্দ্রলাল পৌরাণিক কাহিনী অবলম্বনে তিনটি নাটক রচনা

করেছিলেন—পাষাণী (১৯০০), সীতা (১৯০৮) ও ভীষ্ম (১৯১৪)। এই তিনটি নাটকেই আধ্যাত্মিক ভাবরস ও ভক্তিরস ফুটিয়ে তোলার যথেষ্ট অবকাশ ছিল। কিন্তু নাট্যকার সেদিকে অগ্রসর না হয়ে আধুনিককালীন যুক্তিবাদ ও বিচারপরায়ণতাকেই সমধিক মর্যাদা দিয়েছেন। বর্তমান যুগোচিত চিন্তার আলোকে পুরাণ-কাহিনীর ব্যাখ্যা করেছেন তিনি। রামায়ণ-মহাভারতে এবং পুরাণে অলৌকিকতার স্থান যথেষ্ট, কিন্তু দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁর নাটকে অলৌকিক ঘটনা-মাহাত্ম্যকে সযত্নে বর্জন করেছেন। এটি তাঁর আধুনিককালীন বিচারবাদের দ্বারা পরিমার্জিত যুক্তিনিষ্ঠ মনেরই পরিচায়ক। অলৌকিকতার প্রতি এই বিমুখতায় দ্বিজেন্দ্রলাল সমসাময়িক অন্যান্য নাট্যকারদের থেকে পৃথক হয়ে আছেন। বস্তুতঃ একাধিক পৌরাণিক নাটকের রচয়িতা গিরিশচন্দ্রের নাট্যঐতিহ্য থেকে দ্বিজেন্দ্রলালের নাট্যধারার এখানেই মৌলিক ভেদ। ক্ষীরোদপ্রসাদের সঙ্গেও দ্বিজেন্দ্রলালের এই ক্ষেত্রে অনেকখানি পার্থক্য। রবীন্দ্রকাব্যের ভক্তিরস যেমন দ্বিজেন্দ্রলালের রচনায় তাদৃশ মাত্রায় পাওয়া যায় না, তেমনি গিরিশচন্দ্র কিংবা ক্ষীরোদপ্রসাদের অলৌকিকত্বে প্রীতিরও সেখানে একান্ত অসদ্ভাব। মোটমুটিভাবে বলতে গেলে, দ্বিজেন্দ্রলালের শিল্পীমন ছিল জীবনপ্রেমে ভরপুর, ইন্দ্রিয়ানুভূতি-নির্ভর, ধরা-ছোঁয়ার বস্তুজগতে সংসক্ত। তাঁর কাব্যগ্রন্থগুলিকে মর্ত্য সৌন্দর্যের ঐকান্তিক রোমান্টিক ধ্যান ভিন্ন অন্য কোন আখ্যা দেওয়া যায় না। রূপরসগন্ধশব্দ-স্পর্শময় পৃথিবীর বিচিত্র রূপসম্ভার কবিচিত্তকে গভীরভাবে আকর্ষণ করেছে। জাগতিক সৌন্দর্যের প্রতি এই তন্ময়তা, এই আত্মলীনতা কবিকে রোমান্টিক কবিদের স্বগোত্র ক'রে তুলেছে, যদিও পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে তাঁর মনে যুক্তি আর বিচারের প্রভাবও বড় কম ছিল না। রোমান্টিকবর্গের কবি হলেও ফর্মের স্পষ্টতা ও পরিচ্ছন্নতার প্রতি কবিচিত্তের যে স্বাভাবিক ঝোঁক তা কবির এই শেষোক্ত বৈশিষ্ট্য থেকেই উদ্ভূত হয়েছিল। এই দুই বিপরীত গুণের সহাবস্থান সেই কবির মধ্যেই সম্ভব হয় যাঁর দৃষ্টিভঙ্গীর ভিতর ক্লাসিসিজম্ ও রোমান্টিসিজম্ এই দুই ধারারই সমন্বয় ঘটেছে। দ্বিজেন্দ্রলালের কাব্যে এমনিতর সমন্বয়ই আমরা দেখতে পাই। এই বিরল সমন্বয়ের প্রসাদ দ্বারা যে কবির রচনা ধন্য হয়েছে, তাঁর কাব্যের আর মার নেই।

দ্বিজেন্দ্রলালের মানসিক গঠনে কালোচিত সমাজচেতনাও বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করা যায়। দ্বিজেন্দ্রলালের হাসির গানগুলিতে প্রচলিত রীতি-নীতি আদব-কায়দা আচার-অভ্যাসের বিরুদ্ধে যে ক্ষুরধার সমালোচনা দেখতে পাওয়া যায় তা এই সমাজ-চেতনা থেকেই উদ্ভূত। এবং এই সমালোচনার কেন্দ্রমূলে আছে তাঁর সুগভীর দেশাত্মবোধ ও জাতীয়তার আদর্শের প্রতি অবিচল নিষ্ঠা। কবি দ্বিজেন্দ্রলাল জাতীয়তাবাদের একজন প্রধান ঋত্বিক ছিলেন। আমাদের দেশের যে কয়জন লেখক জাতীয়তাবাদী অভীপ্সা ও দেশপ্রেমকে তাঁদের রচনার প্রধান উপজীব্য স্বরূপ গ্রহণ করে লেখনী চালনা করেছিলেন, দ্বিজেন্দ্রলালকে তাঁদের অগ্রগণ্য সারির একজন বলা যায়। দ্বিজেন্দ্রলালের 'আর্যগাথা' কাব্য, তাঁর হাসির গান, তাঁর ঐতিহাসিক নাটক, তাঁর স্বদেশী সঙ্গীত—সব কিছু এ কথার নিঃসংশয় প্রমাণ বহন করে। দ্বিজেন্দ্রকাব্যে দেশপ্রেম বিশদ ভাবে আলোচনার যোগ্য একটি বিষয়। মদীয় 'বাংলার সংস্কৃতি' গ্রন্থে এ সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা করবার চেষ্টা করেছি। যোগ্যতর ব্যক্তিরা বিষয়টিকে আরও পরিস্ফুট করে তুলতে পারেন।

৩

দ্বিজেন্দ্রলাল বাংলার সাহিত্য-সংসারে বিশেষভাবে পরিচিত তাঁর নাটক-গুলির জন্য। এখানে তাঁর নাট্য-সাহিত্যের একটি মোটামুটি পরিচয় লওয়ার চেষ্টা করা যেতে পারে।

দ্বিজেন্দ্রলালের নাটকগুলির মধ্যে এই ক'টি নাটক সমধিক পরিচিত—প্রতাপসিংহ (১৯০৫), দুর্গাদাস (১৯০৬), নূরজাহান (১৯০৮), মেবার পতন (১৯০৮), সাজাহান (১৯০৯) ও চন্দ্রগুপ্ত (১৯১১)। তাছাড়া তাঁর পরিণত বয়সের রচনা—পরপারে (১৯১২) ও বঙ্গনারী (প্রকাশকাল ১৯১৬—দ্বিজেন্দ্রলালের মৃত্যুর তিন বৎসর পরে) এই দুটি সামাজিক নাটকও মোটামুটি জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। এদের ভিতর সাজাহান নাটকটিকে দ্বিজেন্দ্রলালের সবচেয়ে সার্থক নাট্যরচনা বলা যায়। তার পরে মেবার পতন, দুর্গাদাস, নূরজাহান, চন্দ্রগুপ্ত প্রভৃতির নাম করা যায়। বিষয়বস্তুর দিক্ থেকে

ঐতিহাসিক নাটকগুলিকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়। এক, রাজপুত-মুঘল ইতিহাস বিষয়ক, দুই, প্রাচীন ভারতের ইতিহাস বিষয়ক। শেষোক্ত পর্যায়ে মাত্র দুখানি নাটক তিনি লিখেছিলেন—চন্দ্রগুপ্ত ও সিংহল বিজয় (১৯১৫—মৃত্যুর পরে প্রকাশিত)। এর মধ্যে রাজপুত-মুঘল ইতিহাস বিষয়ক নাটক-গুলিই রচনা-নৈপুণ্যের দিক্ থেকে সমধিক সার্থকতা প্রাপ্ত হয়েছে। তার একটা কারণ, এই ক্ষেত্রে তিনি তাঁর কল্পনাশক্তির ব্যবহার ক্ষুণ্ণ না ক'রেও ইতি-হাসের তথ্য মোটামুটি বিশ্বস্ততার সঙ্গে অনুসরণ করতে পেরেছেন, প্রাচীন ভারতের নাটকে তাঁর সে-সুবিধা ছিল না। চন্দ্রগুপ্ত এবং সিংহল-বিজয় উভয় নাটকেই কল্পনার অতিপ্রাধান্য ঘটেছে এবং যে-পরিমাণে তাতে এই দোষ ঘটেছে সেই পরিমাণেই তাদের নাটকীয় কাহিনীর প্রতীতিযোগ্যতায় হানি হয়েছে। বিরল উপকরণের ভিত্তির উপর নাটক দাঁড় করানোর ফলে এই দুটি নাটকের বাস্তবতা দানা বাঁধতে পারে নি। তা হলেও দর্শক-সাধারণের নিকট চন্দ্রগুপ্ত নাটকের একটা অপ্রতিরোধ্য আকর্ষণ আছে ভিন্নতর কারণে। চাণক্য চরিত্রের প্রখর ব্যক্তিত্ব এই আকর্ষণের মূল হেতু। একদিকে কূটনীতিজ্ঞ চাণক্যের নির্বিবেক রাষ্ট্রপরিচালন-নৈপুণ্য, অন্যদিকে তাঁর বুভুক্ষু পিতৃহৃদয়ের স্নেহকাতরতার সংঘাতে নাটকের ভিতর একটা আবেগ-তীক্ষ্ণ স্পন্দমান নাটকীয় পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছে। সেই সঙ্গে যুক্ত হয়েছে নাটকীয় সম্ভাবনায় থমথমে অ্যান্টিগোনাসের আত্মপরিচয় লাভের প্রবল ব্যাকুলতার রূপায়ণমূলক দৃশ্য। যদিও সঙ্গে সঙ্গে স্বীকার করা ভালো যে, চাণক্যের আর অ্যান্টিগোনাসের আখ্যায়িকার মধ্যে সঙ্গতি-সূত্র কোথাও নেই, সেই সূত্র যোজনার চেষ্টাও নাটকে পরিলক্ষিত হয় না।

সাজাহান নাটক মনস্তত্ত্বের রূপায়ণ-মূলক রচনার একটি সুন্দর উদাহরণ। এতে পিতা-পুত্রের মানসিক সংঘাতের দ্বন্দ্ব অতি নিপুণ ভাবে চিত্রিত হয়েছে। সাজাহানের বৃদ্ধ বয়সের ও বন্দিদশায় মর্মযাতনার চিত্রায়ণে যেমন আছে অসাধারণ নাটকীয় লিপিনৈপুণ্য, তেমনি ঔরংজীবের প্রতি মনোভাবে বৃদ্ধ সম্রাটের মানসক্রিয়ায় বিচিত্র এক মিশ্র অনুভূতির অভিব্যক্তি ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। ঔরংজীবের ক্রুর নিষ্ঠুরতার প্রতি ক্ষমাহীন হয়েও এক অদ্ভুত মনস্তত্ত্বের দ্বারা চালিত হয়ে সম্রাট্ যুগপৎ পুত্রবৎসলতায়ও কাতর। ঔরংজীবের মধ্যেও

বিচিত্র অন্তর্দ্বন্দ্বের আলোড়ন। পিয়ারার আপাত হাস্য-পরিহাসের অন্তরালে ঔরংজীবের নানা কার্যের প্রচ্ছন্ন অথচ সুতীক্ষ্ণ সমালোচনা নিহিত। পিয়ারার সংলাপের বহিরঙ্গের এক অর্থ, অন্তরঙ্গের এক অর্থ। এই সব একাধিক লক্ষণ বিচার ক'রে দ্বিজেন্দ্রলালের—সাজাহান নাটকটিকে মনস্তত্ত্বপ্রধান আধুনিক নাটকের একটি সার্থক দৃষ্টান্তস্থল বলা যেতে পারে।

নূরজাহান নাটকটিকেও একই গোত্রের রচনা বলা যায়। এখানেও মনস্তাত্ত্বিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ারই প্রাধান্য। স্বামী শের আফগানের হত্যাকারী যুবরাজ সেলিমের প্রতি প্রতিহিংসাবৃত্তি কী ক'রে ধীরে ধীরে সম্রাট জাহাঙ্গীরের কাছে আত্মসমর্পণে রূপান্তরিত হল তারই এক মনস্তাত্ত্বিক আলোছায়াময় রূপালেখ্য নূরজাহানের চরিত্র। চার বৎসরের বৈধব্যদশা নূরজাহানের জীবনে এক বিচিত্র আলো-আঁধারির সৃষ্টি করেছে। তারপর সম্রাজ্ঞীরূপে তাঁর সম্পূর্ণ ভিন্নরূপ। এই ভূমিকায় ইন্দ্রিয়পরতন্ত্র এক অলস বিলাসী সম্রাটের ভোগজীবনের উপর অবাধ প্রভুত্বের গৌরব ও বিরুদ্ধবাদীদের দমন করে রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে একচ্ছত্র কর্তৃত্ব স্থাপনের ক্রূর-কুটিল লিপ্সাটাই বড় হয়ে উঠেছে। বৈধব্যের বিরহের শুভ্রতা এই পর্বে ক্ষমতালুব্ধতার কলুষ-কালিমায় সম্পূর্ণ মলিন হয়ে গেছে। নূরজাহান চরিত্রের এই রূপান্তর নাটকের এক প্রধান কেন্দ্রগত বিষয়।

প্রতাপসিংহ, দুর্গাদাস, মেবার পতন তিনটি নাটকই মুঘল সাম্রাজ্য-বিস্তার-চেষ্টার বিরুদ্ধে রাজপুত শৌর্যবীর্যের কাহিনী। মুঘল আক্রমণের বিরুদ্ধে রাজপুত জাতীয়তার প্রতিরোধ তিনটি নাটকেই একটা প্রবল স্বাদেশিকতার চেতনার আবহ সৃষ্টি করেছে। দেশপ্রেম এই তিন নাটকের প্রধান উপজীব্য বলা যায়। বিশেষ করে প্রতাপসিংহ ও মেবার পতন নাটকে এই দেশাত্মিকা বুদ্ধি সবিশেষ পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। কিন্তু মেবার-পতন নাটকের বৈশিষ্ট্য মাত্র এই লক্ষণেই সীমিত নয়। সেখানে কবি জাতীয়তাবাদী অভীপ্সার রূপায়ণের পাশে বিশ্বমৈত্রীর আদর্শটিকেও রূপায়িত করেছেন এবং বিশ্বমৈত্রীর আদর্শই যে শ্রেষ্ঠতর আদর্শ এই সিদ্ধান্ত প্রতিপন্ন করবার চেষ্টা করেছেন। মানসী চরিত্রটিকে এই ভাবের বাহিকা রূপে আঁকা হয়েছে। সত্যবতীর কণ্ঠে জাতীয়তার চারণগান; মানসীর চক্ষে

আন্তর্জাতিক সৌভ্রাত্র আর বিশ্বপ্রেমের স্বপ্ন। মেবার পতন নাটক ১৯০৮ সনে লেখা। এই সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করলে, বিশ্বমৈত্রীর আদর্শ প্রচার বাংলা নাটকের পক্ষে তো বটেই, বাংলা সাহিত্যের পক্ষেও এক অভিনব ব্যাপার। বঙ্গভঙ্গের স্রোতোমুখে-ভেসে-আসা জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের আলোড়নের দ্বারা মথিত-সংক্ষুব্ধ বাংলাদেশের মানসভূমিতে আন্তর্জাতিক আদর্শের বীজ তো পরের কথা, সর্বভারতীয়তার বীজও তখন ভাল করে উপ্ত হয় নি। সেই হিসাবে দ্বিজেন্দ্রলালকে একটা বলিষ্ঠ প্রাগ্রসর ভাবের অগ্রপথিক বলা যায়। তিনি যে যুগের তুলনায় অনেক অগ্রবর্তী হয়ে চিন্তা করতে পেছপাও ছিলেন না, মেবার-পতন নাটকের মানসী চরিত্রের পরিকল্পনাই তার প্রমাণ। মানসী সত্যবতীকে উদ্দেশ করে এক জায়গায় বলছে—"যেমন স্বার্থ চাইতে জাতীয়ত্ব বড়, তেমনি জাতীয়ত্বের চেয়ে মনুষ্যত্ব বড়। জাতীয়ত্ব যদি মনুষ্যত্বের বিরোধী হয় তো মনুষ্যত্বের মহাসমুদ্রে জাতীয়ত্ব বিলীন হয়ে যাক! দেশের স্বাধীনতা ডুবে যাক—এ জাতি আবার মানুষ হোক।"

এই উক্তির অন্তর্নিহিত তাৎপর্যের মধ্যে যে কী অসাধারণ বৈপ্লবিকতার বাণী সুগুপ্ত আছে তা পরবর্তী কালের চিন্তার বিবর্তনের ইতিহাস আলোচনা করলেই আমরা বুঝতে পারব। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—"সব ঠাঁই মোর ঘর আছে, আমি সেই ঘর মরি খুঁজিয়া। দেশে দেশে মোর দেশ আছে, আমি সেই দেশ লব বুঝিয়া।" অথবা, "বিশ্বজগৎ আমারে মাগিলে কে মোর আত্মপর।" এ সব বিশ্বাত্মিকাবুদ্ধি প্রণোদিত আন্তর্জাতিক আদর্শেরই কথা এবং এ সব পংক্তি যদিও বিংশ শতকের গোড়াতেই রচিত হয়েছিল তা হ'লেও এ সব কবিতা পুস্তকাকারে প্রচারিত হয় মেবার-পতন নাটক প্রকাশের অন্ততঃ ছ'বছর পরে। রবীন্দ্রনাথের জীবনে জাতীয়তাবাদী উগ্র স্বাতন্ত্র্যচেতনার বন্ধন থেকে মুক্তি এই পর্বে সংসাধিত হয়। তীব্র স্বাজাতিকতার অহমিকার সম্পূর্ণ বিলোপ-সাধন ও বিশ্বমৈত্রীর আদর্শের উদার-মুক্ত আঙিনায় আশ্রয় গ্রহণ আরও পরেকার ঘটনা। এই সুমহান আদর্শ রবীন্দ্রনাথের জীবনে বাস্তব রূপলাভ করে ১৯২১ সনে শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্য বিদ্যালয়কে বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরকরণের মধ্য দিয়ে। একই সময়ে কিংবা তারও কিছু পরে

মহাত্মা গান্ধীও অনুরূপ ভাবের কথা বলতে থাকেন। "আমাকে যদি স্বরাজ এবং সত্যের মধ্যে বাছাই করতে হয় তবে আমি সত্যকেই বেছে নেব।" এটি গান্ধীজীর উক্তি। সত্য বলতে, এখানে সর্বাঙ্গীণ মনুষ্যত্বের আদর্শের দ্বারা ধৃত বিশ্বমৈত্রীর কথাই বলা হয়েছে। এই কথা মানসীর উক্তির হুবহু প্রতিরূপ বলা যেতে পারে। এই সব পরবর্তী ভাবনা ও ঘটনার বিচার করলে আমরা বুঝতে পারব দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁর মেবার পতন নাটকে যুগের তুলনায় কী অসাধারণ বৈপ্লবিক বাণীবাহী ভাবধারাই না পরিবেশন করেছেন! সত্য বলতে কি, দ্বিজেন্দ্রলালের সময়কার মানস-পরিবেশ, তাঁর শিক্ষাদীক্ষা ও রুচিপ্রবণতা, তাঁর কবিজীবনে জাতীয়তাবাদী ভাবের আবেশ ও আচ্ছন্নতা বিচার করলে দ্বিজেন্দ্রলালের পক্ষে এবংবিধ আদর্শের প্রচারণা এক এক সময় অবিশ্বাস্য বলে মনে হয়। অথচ ঘটনাটি অবাস্তবও নয়, অবিশ্বাস্যও নয়। মেবার পতন নাটকের মানসী চরিত্রের বিভিন্ন উক্তির মধ্যে এই ভাবধারার জ্বলন্ত স্বাক্ষর মুদ্রিত রয়েছে।

দ্বিজেন্দ্রলালের নাট্যসাহিত্য সম্পর্কে সুবিস্তৃত আলোচনার অবকাশ আছে। এখানে তৎপক্ষে পরিসরের একান্ত অভাব। সুতরাং আমি শুধু এখানে দ্বিজেন্দ্র-নাট্য-সাহিত্যের রেখাঙ্কন ক'রেই নিবৃত্ত হলাম। যাঁরা এ বিষয়ে বিশদ জানতে চান তাঁদের ডক্টর রথীন্দ্রনাথ রায় কৃত 'দ্বিজেন্দ্রলাল: কবি ও নাট্যকার' গ্রন্থটি পাঠ করতে অনুরোধ করি। এই গ্রন্থে দ্বিজেন্দ্রলালের নাটকাবলীর সুবিস্তৃত আলোচনা আছে।

৪

দ্বিজেন্দ্রলালের সঙ্গীত দ্বিজেন্দ্র-শিল্পি-ব্যক্তিত্বের একটি বিশিষ্ট সমৃদ্ধ দিক্। এই ক্ষেত্রেও তাঁর যথাপ্রাপ্য সম্মান তাঁকে দেওয়া হয়েছে কিনা সন্দেহ। সঙ্গীতে তাঁর দান অতুলনীয় বললেও চলে। সে সম্বন্ধে সম্যক্ আলোচনা করতে হলে একটি স্বতন্ত্র প্রবন্ধের দরকার। এখানে তার সুযোগ নেই। কাজেই আমরা শুধু এখানে দ্বিজেন্দ্রলালের সাঙ্গীতিক প্রতিভা সম্বন্ধে মোটামুটি ভাবে কিছু আলোচনা করার চেষ্টা করব।

দ্বিজেন্দ্রলালের সঙ্গীত সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে দিলীপকুমার একাধিক জায়গায় তাঁর পিতৃদেবকে প্রধানতঃ 'স্বরকার' আখ্যায় আখ্যাত করেছেন। 'স্মৃতিচারণে'র উপক্রমণিকায় তিনি লিখেছেন, দ্বিজেন্দ্রলাল গায়ক হিসাবে খ্যাতিমান্ ছিলেন; কিন্তু তার চেয়ে অনেক বড় ছিলেন স্বরকার হিসাবে। তিনি একজন অসামান্য স্বরকার ছিলেন।

এ কথা যথার্থ। সঙ্গীত-জগতে দ্বিজেন্দ্রলালের সৃষ্টিক্ষমতার প্রকৃত পরিচয় কণ্ঠশিল্পী হিসাবে নয়, স্বরকার অর্থাৎ composer হিসাবে। স্বররচনার ক্ষমতাই হচ্ছে সঙ্গীতের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় ক্ষমতা। এ জিনিস আমাদের দেশে এখনও আমরা ভাল করে উপলব্ধি করতে পারি নি। তা যদি পারতাম তা হলে দ্বিজেন্দ্রলালকে একজন প্রথম শ্রেণীর সাঙ্গীতিক স্রষ্টা পুরুষ রূপে মাথায় করে রাখতাম। ইউরোপে স্বরকারের যে সম্মান, কণ্ঠসঙ্গীতকার বা বাদকের সম্মান তার সিকির সিকিও নয়। এ রেওয়াজ এখনও আমাদের দেশে তেমন ক'রে চালু হয় নি, হ'লে ভাল হ'ত। অন্ততঃ সে ক্ষেত্রে মুড়ি মিছরির এক দর হাঁকবার প্রবণতা সঙ্গীত মহল থেকে লোপ পেত। আমাদের দেশে স্বরকারের আপেক্ষিক অনাদরের কারণ সম্ভবতঃ এই যে, স্বরকার লোকচক্ষুর অন্তরালে ব'সে সুর রচনা করেন, আর গায়ক হাজারো মানুষের প্রকাশ্য জমায়েতে সে গান গেয়ে আসর মাত করেন। ফলে সম্মান-স্বীকৃতির নগদবিদায়টা গায়কের ভাগ্যে যে পরিমাণে ঘটে, স্বরকারের ভাগ্যে তেমন ঘটে না। এতে যে স্বরকারের প্রতি অবিচার করা হয় তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

সুখের বিষয় ইদানীং এ অবস্থার কিছু কিছু প্রতিকার হতে আরম্ভ করেছে। রবীন্দ্রনাথের সাঙ্গীতিক দানের মূল্যায়নে আমরা সঙ্গীতের ইউরোপীয় আদর্শ গ্রহণ করে তাঁকে একজন শ্রেষ্ঠ স্বরকার হিসাবে মর্যাদা দিতে শিখেছি। কিন্তু আমাদের উদারতা রবীন্দ্রনাথেই থেমে গেছে, এই সংস্কার অন্যান্য স্বরকারদের বেলায় প্রয়োগ করতে আমরা ভুলে গেছি। আমরা দ্বিজেন্দ্রলালের সুর কারুর প্রতিভা মেনে নিতে আজও শিখি নি। তেমনি আমরা অতুলপ্রসাদ, নজরুল ইসলাম, দিলীপকুমার, হিমাংশু দত্ত প্রমুখ প্রথম শ্রেণীর স্বরকারদের সুরযোজনার বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আজও অল্পবিস্তর উদাসীন। কাজী

নজরুল ইসলাম কবি হিসাবে যে মর্যাদা পেয়েছেন সুরকার হিসাবে তার একাংশ মর্যাদাও পান নি, যদিও নিরপেক্ষতার তৌলদণ্ডে তাঁর কাব্য-প্রতিভা বড় কি সাঙ্গীতিক প্রতিভা বড় সে বস্তু এখনও পরিমাপ হওয়ার অপেক্ষা রাখে। দিলীপকুমারকে এখনও আমরা মুখ্যতঃ গায়ক হিসাবেই চিনি, তাঁর অসাধারণ সুরযোজনার ক্ষমতাকে এখনও পর্যন্ত আমরা আদর করতে শিখি নি। এ আমাদের সুরবোধের দৈন্যেরই শুধু পরিচয় ঘোষণা করে। দিলীপকুমার সুররচনায় দ্বিজেন্দ্রলালের যোগ্য উত্তরাধিকারী। দ্বিজেন্দ্রলাল অথবা তাঁর সুযোগ্য পুত্র দিলীপকুমার শিল্প রচনার এই বিশেষ ক্ষেত্রে তাঁদের প্রাপ্য স্বীকৃতি পান নি এটি পরিতাপের বিষয় হলেও সত্য।

সুররচনায় নানা শাখায় দ্বিজেন্দ্রলালের শক্তির পরিচয় বিকীর্ণ হয়ে আছে। হাল্কা ছাঁদের ছন্দপ্রধান সুর রচনার সার্থক সৃষ্টির উদাহরণ—গগনভূষণ তুমি জনগণ মনোহারী, আয় রে আমার সুধার কণা, আয় রে বসন্ত ও তোর কিরণমাখা পাখা তুলে, ইত্যাদি এবং একাধিক হাসির গান। হিন্দী ধ্রুপদ এবং খেয়াল ভেঙেও তিনি অনেক বাংলা গান রচনা করেছিলেন। বস্তুতঃ এই ক্ষেত্রে তাঁকে একজন প্রধান পথিকৃতের মর্যাদা দেওয়া যেতে পারে; তাঁর এই বর্গের গানের নাম—প্রতিমা দিয়ে কি পূজিব তোমারে (জয়জয়ন্তী) সকল ব্যথার ব্যথী আমি হই (বাগেশ্রী), ঘনতমসাবৃত অম্বর ধরণী (ভূপালি ঠাট), পতিতোদ্ধারিণি গঙ্গে (ভৈরবী ঠাট), ইত্যাদি। আজকাল যাকে কাব্যসঙ্গীত বলা হয় তারও প্রবর্তক দ্বিজেন্দ্রলাল। তবে এখনকার হাল্কা চটুল ভঙ্গীর কাব্যবর্জিত তথাকথিত কাব্যসঙ্গীতের সঙ্গে দ্বিজেন্দ্রলালের কাব্যসঙ্গীতের নামেই শুধু মিল, অন্য কোন লক্ষণে মিল নেই। দ্বিজেন্দ্রলালের কাব্যসঙ্গীত কাব্যময়, উদার, গম্ভীর, যথার্থ সুরৈশ্বর্যযুক্ত। কাব্য ও সঙ্গীতের সেখানে অঙ্গাঙ্গি মিলন হয়েছে। তার অর্থ সে সব গানে কাব্য বড় কি সুর বড় তা বোঝবার উপায় নেই; দুইয়ে মিলে এক অখণ্ডপরিপূর্ণতা। দুটি সার্থক দৃষ্টান্ত—নীল আকাশের অসীম ছেয়ে ছড়িয়ে গেছে চাঁদের আলো (দেশ ঠাট) ও মহাসিন্ধুর ওপার থেকে কী সঙ্গীত ওই ভেসে আসে (কল্যাণ ঠাট)। বিশেষতঃ প্রথমোক্ত গানটির জুড়ি মেলা ভার—কি বাণীর দিক থেকে কি সুরের দিক থেকে।

কিন্তু এহ বাহ্য। সুরকাররূপে দ্বিজেন্দ্রলালের শ্রেষ্ঠ পরিচয় তাঁর জাতীয় ভাবোদ্দীপক কোরাস গানগুলির রচনায়। এ ক্ষেত্রে আজও তিনি অপ্রতিদ্বন্দ্বী রয়েছেন, বিনা দ্বিধাতেই বলা চলে এ কথা। দ্বিজেন্দ্র-সুহৃদ প্রসিদ্ধ মনীষী লোকেন্দ্রনাথ পালিত দ্বিজেন্দ্রলালের "বঙ্গ আমার জননী আমার ধাত্রী আমার আমার দেশ" গানটি শুনে বলেছিলেন—"How wonderful, how magnificent!" দ্বিজেন্দ্রলালের প্রায় প্রতিটি স্বদেশী কোরাস গান সম্পর্কেই এই উচ্ছ্বসিত মন্তব্য প্রয়োগ করা চলে। যেমন গানগুলির ভাব ভাষা তেমনি তাদের সুর। এ বলে আমায় দেখ্, ও বলে আমায় দেখ্। জাতীয় ভাবোদ্দীপক এষণার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে গানের বাণী যেমন রজোগুণসমৃদ্ধ, তেমনি সুরের বাঁধুনিতেও বলিষ্ঠতা ও বীর্যব্যঞ্জকতা। গানগুলির সুর থেকে একটা সাংগ্রামিক চেতনা যেন স্বতঃই ঝ'রে পড়ছে। বাঙালী তাঁর এই গানগুলির সঙ্গে সবচেয়ে বেশী পরিচিত, তবু এই স্থলে এ-জাতীয় প্রতিনিধি-স্থানীয় কয়েকটি রচনার নামোল্লেখ করছি—ধাও ধাও সমরক্ষেত্রে গাও উচ্চে রণজয়গাথা, মেবার পাহাড় মেবার পাহাড় যুঝেছিল যেথা প্রতাপবীর, ধনধান্যে পুষ্পে ভরা আমাদের এই বসুন্ধরা, বঙ্গ আমার জননী আমার, যেদিন সুনীল জলধি হইতে উঠিলে জননী ভারতবর্ষ, সেথা গিয়াছেন তিনি, কিসের শোক করিস ভাই আবার তোরা মানুষ হ, প্রভৃতি।

উল্লিখিত গানগুলির সুরযোজনায় তিনি সজ্ঞানতঃ বিদেশী কোরাস গানের সুরভঙ্গি ও গাইবার ঢঙ্ আমদানী করেছেন, কিন্তু লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, তাদের অধিকাংশ সুরের মূলে আমাদের প্রথাগত ভারতীয় রাগ-রাগিণীর রস তথা চাল মিশে আছে। দ্বিজেন্দ্রলালের হাতে বিরুদ্ধ প্রকৃতির সুরের এ এক আশ্চর্য যাদুক্রিয়াসুলভ—হাঁ, যাদুক্রিয়াই বলব—মিলন ঘটেছে। ইউরোপীয় সুর আর ভারতীয় সুর তেল-জলের মত পরস্পরের সঙ্গে মিশ খায় না ব'লেই আমাদের ধারণা। কিন্তু দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁর অসামান্য সাঙ্গীতিক ক্ষমতার দ্বারা এ-ধারণা যে সর্বক্ষেত্রে সঠিক নয় তা প্রতিপন্ন করেছেন। তাঁর কোরাস গানগুলিতে ইউরোপীয় সুরের ঢঙ আর ভারতীয় রাগের আমেজের ভিতর গঙ্গা-যমুনা সমন্বয় সাধিত হয়েছে বললেও অত্যুক্তি হয় না। যেমন, ধনধান্যে পুষ্পভরা গানটির ছন্দ, গায়নপ্রণালী, স্বরবিরাম (cadence)

ইত্যাদি ইউরোপীয় সুরভঙ্গির কথা মনে করিয়ে দেয় অথচ তা রচিত হয়েছে ভারতীয় সঙ্গীতেরই এক সুপরিচিত ঠাটে—কেদারা ঠাটে। কিংবা যেদিন সুনীল জলধি হইতে গানটির কথা ধরা যাক। তাতেও একই প্রকার ইউরোপীয় সুরের আমেজ লক্ষ্য করা যায়, অথচ তা রচিত হয়েছে ভূপকল্যাণ ঠাটে। তেমনি ধাও ধাও সমরক্ষেত্রে শীর্ষক সামরিক সঙ্গীতটি পাশ্চাত্ত্য **military march** সঙ্গীতের ঐতিহ্যের স্মারক কিন্তু তার রাগরূপটি হল আমাদের পরিচিত ভূপালি ঠাটের অন্তর্গত। এমনি, বঙ্গ আমার জননী আমার, এমনি সধবা অথবা বিধবা তোমার রহিবে উচ্চশির প্রভৃতি গান।

শেষ জীবনে দ্বিজেন্দ্রলাল কিছু ভক্তিভাবাত্মক ও শ্যামাসঙ্গীত রচনা করেছিলেন, যার কথা দিলীপকুমার তাঁর স্মৃতিকথায় বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন। এই জাতীয় গানের ভিতর কয়েকটি প্রামাণ্য গান হল—চরণ ধরে আছি পড়ে, একবার চেয়ে দেখিস না মা, আর কেন মা ডাকছ আমায়, প্রতিমা দিয়ে কী পূজিব তোমারে, তুমি যে হে প্রাণের বঁধু, ইত্যাদি।

৫

দ্বিজেন্দ্রলালের মৃত্যু ঘটে ১৯১৩ সনে। মাত্র পঞ্চাশ বৎসর তিনি জীবিত ছিলেন। তাঁহার মৃত্যু নিশ্চিতরূপেই অকালমৃত্যু। মাত্র পঁচিশ বৎসর কি তার কাছাকাছি সময় তিনি সাহিত্যসাধনার জন্য নিয়োগ করতে পেরেছিলেন। এই সময়ের ভিতর তিনি সাহিত্যের নানা শাখায় তাঁর প্রতিভার স্পর্শ রেখে গেছেন—কাব্য নাটক প্রহসন সঙ্গীত সাহিত্য সমালোচনা ইত্যাদি। শুধু সাহিত্যের দুই জনপ্রিয় শাখায় তাঁর অনুরাগের—অন্ততঃ অনুরাগের বহির্ভিব্যক্তির—প্রমাণ নেই। সে দুটি শাখা হল উপন্যাস ও ছোটগল্প। তৎসত্ত্বেও নিয়োজিত সময়ের পরিমাণ বিচার করলে তাঁর সৃষ্টির পরিমাণ যথেষ্ট ভারী বলতে হয়। এক নাট্যরচনার পরিমাণই মনে দাগ কাটবার মত। ওর উপর সব জাতের গান মিলিয়ে সঙ্গীতসৃষ্টির পরিমাণও বড় কম নয়। এই থেকে আমরা অনুমান করতে পারি, দ্বিজেন্দ্রলাল যদি আরও আয়ুর প্রসাদ পেতেন তা হলে বাংলা সাহিত্য আরও নানা প্রকারে বিশেষ

ভাবেই সমৃদ্ধ হতে পারত। আমাদের দুর্ভাগ্য, মধুসূদন, বঙ্কিমচন্দ্র, দ্বিজেন্দ্রলাল বাংলা সাহিত্যের এই তিন বিশিষ্ট স্রষ্টা কেউ দীর্ঘজীবী হন নি। তবে সান্ত্বনা এই, প্রতিভার ধর্মে আয়ুর পরিমাণটা বড় কথা নয়, বড় কথা প্রতিভার দ্যুতিময় বিচ্ছুরণ—হোক তা ক্ষণিকের, হোক তা স্বল্পকালের। এই দিক থেকে দ্বিজেন্দ্রলাল যে দু হাত ভ'রেই তাঁর সৃষ্টির দানে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ঐশ্বর্যের ভাণ্ডার পূর্ণ করে তুলেছিলেন একথা নিঃসন্দেহেই বলা যায়।

সুরকার দ্বিজেন্দ্রলাল

জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ

দ্বিজেন্দ্রলাল একজন শ্রেষ্ঠ নাট্যকার ও কবি হিসাবে আমাদের দেশে সম্মান ও স্বীকৃতি পেয়েছেন। কিন্তু সুরকার হিসাবেও তিনি যে আমাদের দেশের শ্রেষ্ঠদের একজন ছিলেন, এ কথা নিয়ে বোধ হয় বেশী আলোচনা হয়নি। শ্রীদিলীপকুমার রায় তাঁর 'স্মৃতিচারণ'-এ ঠিকই বলেছেন যে সংগীতসমাজে সুরকার বলতে যা এবং যতখানি বোঝায়, আগের দিনে সে রকম ধারণা করবার মত অবস্থা সমাজে তৈরী হয়নি এবং কোনো সুরকারের যথার্থ মর্যাদা সম্বন্ধে লোকের মনে কোনো জিজ্ঞাসা জাগেনি। তখনকার দিনে সমাজে যে ধরনের গান চলতো—তা সে লোকগীতই হোক বা কোন উঁচু আদর্শঘেঁষা গানই হোক—তার ভিত্তি ছিল তৎপূর্বকালে প্রচলিত গানের রীতি ও ধারা। গানকে বিচিত্র করবার জন্য নিশ্চয় কোনো উৎসাহের অভাব ছিল না, কিন্তু তাকে নিত্য নতুন সুরে ও ছন্দে সাজিয়ে, প্রচলিত রীতি-নীতি ও সংস্কৃতিকে ছাপিয়ে (বর্জন ক'রে না, বরং গ্রহণ ক'রেই) ব্যক্তিগত প্রতিভার ছোঁয়ায় একটা স্বতন্ত্র উজ্জ্বল কিছু সৃষ্টি করবার অর্থাৎ গতানুগতিকতার বেড়া ডিঙিয়ে চলবার দিকে সে রকম একটা আগ্রহ ছিল না এবং এ বিষয়ে চিন্তাও করতেন না সে যুগের সঙ্গীত-শিল্পীরা। এক আধ জন ক'রে থাকলেও সুরকার ব'লে কোনো সংজ্ঞার বা সুরকারদের কোন ধারায় অথবা গোষ্ঠীর প্রবর্তন এখনও হয়নি। রবীন্দ্রনাথ ও দ্বিজেন্দ্রলালকে আমরা পাই আমাদের দেশের সুরকারের মিছিলের পথিকৃৎ হিসাবে। কিন্তু সে কালে এখনকার মত ঘরে ঘরে সংগীতের চর্চা হ'ত না। সাধারণ রঙ্গমঞ্চ এবং বৈঠকীগণের আসরের সংস্পর্শে এসে বা কলের গানের ছিটেফোঁটার কৃপায় মনে গান বাজনা সম্বন্ধে কিছু কিছু বিচার বিশ্লেষণের উন্মেষ হচ্ছে এমন লোকেরও সংখ্যা তখন বেশী ছিল না। তাই সুরকারের সৃষ্টি যে সংগীত জগতের কত বড় দান, সে বিষয়ে সাধারণ শ্রোতার মন সচেতন ছিল না। দ্বিজেন্দ্রলাল যখন তাঁর দেশবাসীকে তাঁর সুরের ডালি উপহার দিয়ে

বিদায় নিলেন তখন এবং তারপর অনেক দিন পর্যন্ত বাঙ্গালীসমাজে তাঁর রচিত গানের চর্চা এবং প্রচলন বহুলভাবেই ছিল। তাঁর অনেকগুলি বিখ্যাত গান তাঁর রচিত নাটকে স্থান পেয়ে বাংলার নাট্যমঞ্চের মাধ্যমে জনসাধারণের কাছে পরিবেশিত হয়েছিল এবং বহুদিন পর্যন্ত ঐ সব গান লোকের মুখে মুখে শোনা যেত এবং শ্রোতা ও গায়ক সকলেরই কাছে ঐ সব গান সমান প্রিয় ছিল। যুগের পটপরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে প্রগতির পদক্ষেপের সঙ্গে তাল রেখে নতুন নাটক পুরাতনের স্থান অধিকার করতে থাকে, তাই পুরাতন নাটকের গানগুলিও শ্রোতাদের কাছ থেকে ধীরে ধীরে দূরে স'রে যেতে থাকে। প্রকৃতির নিয়মে কোন জিনিসের জনপ্রিয়তা চিরদিন সমান থাকে না। কিন্তু মানুষের মূল্য বিচারে যে বস্তুর মধ্যে সার সত্য নিহিত আছে তার দাম কখনো কমে না। দ্বিজেন্দ্রলালের সুরের মধ্যে, তাঁর রচনা-কৌশলের মধ্যে, প্রেরণা ও অভিব্যক্তির মধ্যে, সৃষ্টির বিচিত্র ভঙ্গীর মধ্যে পাওয়া যায় এই সত্যের সন্ধান—যা না থাকলে গান যুগোত্তীর্ণ হতে পারে না, কালোত্তীর্ণ হতে পারে না। পৃথিবীতে সকল সৃষ্টিই সময়ের অথবা সমসাময়িকতার বেষ্টনী দিয়ে বেশ খানিকটা সীমাবদ্ধ। দ্বিজেন্দ্রলালের প্রাণমাতানো স্বদেশী গান বা দেশাত্মবোধক গান যেমন 'ধন ধান্যে পুষ্পে ভরা', 'বঙ্গ আমার জননী আমার', 'ভারত আমার', 'যেদিন সুনীল জলধি হইতে' এক সময়ে দেশের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতাকে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করতো, অভিভূত করতো। গানের নিজস্ব শক্তি ও প্রভাবের কথা অনস্বীকার্য হ'লেও একথাও সত্য যে—সেদিনের সে যুগটাও ঠিক এই রকম গানের উপযুক্ত ছিল। আজকে হয়তো রাষ্ট্রীয় স্বাতন্ত্র্যবোধ নতুন ক'রে জাগিয়ে তোলবার জন্য এই সমস্ত গান সেদিনকার মত উদ্দীপনা আনবে না—কারণ যুগ পাল্‌টে গিয়েছে, সেই স্বাধীনতার সংগ্রামের দিন আজ শেষ হয়েছে। কিন্তু এই সমস্ত গানের ছত্রে ছত্রে এবং সুরের ব্যঞ্জনার মধ্যে যে দৃঢ়তা, যে আত্ম-প্রতিষ্ঠা, যে পৌরুষ এবং প্রেম, সার্থক রচনা-কৌশল প্রকাশ করছে তা সর্বযুগের সর্বকালের জন্য। দ্বিজেন্দ্রলালের এই সমস্ত গান যে তাঁর পর-বর্তী কালের সুরকারদের কাছে এক বিশেষ উত্তরাধিকারের এবং আদর্শের কাজ করেছে, তা স্বীকার না করে উপায় নেই।

প্রকৃত সুরকারদের ভিতরে অন্যান্য নানা বৈশিষ্ট্যের মধ্যে একটি অন্ততঃ বিশেষ গুণ এই যে তাঁদের প্রত্যেকটি রচনা একটা স্বতন্ত্র ঔজ্জ্বল্যে ভাস্বর হবে অর্থাৎ প্রত্যেকটি রচনা পৃথক ব'লে মনে হবে। প্রায় সব মানুষের মধ্যে কিছু না কিছু সুর থাকে; তাঁদের কেউ কেউ কখনো কখনো গানে সুর দিয়ে নিজেদের রচনাশক্তির পরিচয়ও দিয়ে থাকেন এবং অনেকের রচনা সুখশ্রাব্যও হয়ে থাকে। কিন্তু শুধু এই কারণে কেউ আর সুরকার বলে পরিচিত হতে পারেন নি। সুরকার তাঁকেই বলা যেতে পারে, যাঁর মধ্যে সত্যিকারের প্রতিভা আছে, কোনো অসাধারণ শক্তি আছে—যা নিজের উচ্ছলতায় বহুভাবে বহুসংখ্যক রচনার মধ্য দিয়ে বিচিত্র সম্ভার নিয়ে আত্মপ্রকাশ ক'রে লোকের আনন্দ ও বিস্ময় উৎপাদন করে। এই শক্তি চেষ্টা ক'রে লাভ করবার নয়, এ জন্মগত সংস্কার। সুরকার সজ্ঞানে স্বেচ্ছায় সৃষ্টি ক'রে চলেন, কিন্তু তাঁর সঙ্গে মিশে থাকে অবচেতন সংস্কারের আবেদন। মগজের পরতে পরতে সঞ্চিত গচ্ছিত রাখা কতকালের শোনা কত রকমের স্মরণোজ্জ্বল অথবা বিস্মৃত ধূসর মূর্ছনাকে টেনে আনা হয় —তা কি ব'লে বোঝান যায়? শিক্ষা ক'রে শেখা বিদ্যার সঙ্গে শুনে অর্জন করা অভিজ্ঞতার সামঞ্জস্য বিধান ক'রে নিজের কল্পনা, প্রেরণা, রুচি এবং বিচারকে কাজে লাগিয়ে তবেই সৃষ্টি করেন সুরকার তাঁর সুর। অথবা ব্যাপারটিকে উল্‌টিয়ে নিয়ে বলতে পারা যায় যে সুরকারের কল্পলোকের গঙ্গোত্রী থেকে সুরের সুরধুনী আপনা থেকেই নির্ঝরিত হয়। এই বিশেষ শক্তি বিশেষ ব্যক্তির মধ্যেই থাকে। ব্যক্তিত্বকে বাদ দিলে প্রতিভাকে পাওয়া যায় না। দ্বিজেন্দ্রলালের প্রতিভার পিছনে তাঁর ব্যক্তিত্ব সব সময়েই সক্রিয় ছিল। ব্যক্তিগত জীবনে তাঁর শিক্ষা-দীক্ষা, পৌরুষ, কোমলতা, দেশাত্মবোধ ও ভক্তি তাঁর শিল্পী-জীবনের সমস্ত রচনার মধ্যে প্রতিফলিত হয়েছে, এ কথা আমরা দ্বিজেন্দ্রলালের জীবনের নানা কাহিনী থেকে বুঝতে পারি। কিন্তু যেকথা বলা হয়েছে, তাঁর বিভিন্ন বিষয়ের গানগুলি, প্রত্যেকটি যেন এক একটি স্বতন্ত্র বক্তব্য নিয়ে, পৃথক বৈশিষ্ট্য নিয়ে, রূপ নিয়ে, নতুন নতুন মাধুর্য নিয়ে শ্রোতাদের অনুভূতিতে স্পন্দন তোলে, ছন্দ জাগায়, রসের প্লাবন আনে।

দ্বিজেন্দ্রলালের সুরের প্রকৃত আস্বাদ পেতে হ'লে, তাকে বুঝতে হ'লে এবং এ সম্বন্ধে আলোচনা করতে গেলে, সুগায়কের মুখে তাঁর গান শুনে রসোপলব্ধি ক'রে তবে সেই সুরের তাৎপর্য গ্রহণ করা যায়, ক্ষুদ্র প্রবন্ধে তা সম্ভব নয়। তাঁর গান যেমন নানা রস, নানা ভাব ও চিন্তাকে আশ্রয় ক'রে রূপ নিয়েছে, সেই সব গানের সুরও এই সব রস, ভাব ও চিন্তাকে ফুটিয়ে তুলে তাঁর সমগ্র রচনাকে বিচিত্র ও সুষমামণ্ডিত করে তুলেছে। একটা সুবিধা দ্বিজেন্দ্রলালের ছিল—একে ঠিক সুবিধা না ব'লে talent বা প্রতিভাই বলা উচিত। আমাদের দেশে সুরকারের সংস্কৃতি বেশী পুরানো না হ'লেও প্রাচীনকাল থেকেই আমাদের দেশের বড় বড় কবিদের, তাঁদের নিজেদের রচিত পদে নিজেদেরই সুর যোজনা ক'রে গান গাইতে দেখা গিয়েছে, মীরা, সুরদাস প্রভৃতি ভক্ত কবিরাও গান করেছেন এইভাবে। দ্বিজেন্দ্রলাল, রবীন্দ্রনাথ, অতুলপ্রসাদ, কাজী নজরুল এবং দিলীপকুমার এঁরা সবাই গায়ক। কবি গায়ক হ'লে পরে এবং সুরকার শক্তির অধিকারী হ'লে পরে তাঁর রচনার প্রসাদগুণ আরো বৃদ্ধি পায়, যা হয়েছিল দ্বিজেন্দ্রলালের বেলায়। তাঁর বিভিন্ন রসের কয়েকটি গান লক্ষ্য করলেই বোঝা যায়, তাঁর গানের সুর, তাঁর গানের বাণীর ভাব, ছন্দ ও প্রকৃতির সঙ্গে কী রকম সুন্দর ও সুসঙ্গতভাবে মিশে গেছে। এই প্রসঙ্গে তাঁর কয়েকটি বিখ্যাত গান স্মরণ করা যাক।

দেশাত্মবোধক গান—

যে দিন সুনীল জলধি হইতে, বঙ্গ আমার জননী আমার, ভারত আমার, ধন-ধান্যে পুষ্পে ভরা, মেবার পাহাড় ইত্যাদি গানগুলি তাদের অন্তরস্পর্শী ওজঃশক্তিরসে আপ্লুত। গানগুলি সুরের দিক দিয়ে খুবই সরল ও অনাবশ্যক অলঙ্কার বিবর্জিত, যে জন্য সম্মেলক গানের উপযুক্ত। এই গানগুলিতে পাশ্চাত্য সংগীতের অনুকরণ নেই, মূর্ছনাগুলি কোন না কোন রাগের আকৃতিকে স্মরণ করিয়ে দেয়; কিন্তু সবগুলি গান পাশ্চাত্য কণ্ঠ ও যন্ত্র-সংগীতের ধাঁজে পরিবেশিত হ'বার আশ্চর্য যোগ্যতা রাখে।

প্রেম সঙ্গীত—

মলয় আসিয়া, এ জীবনে মিটিল না, আজি তোমার কাছে ভাসিয়া

যায়, আমি সারা সকালটি, আর একবার ভালবাস, হৃদয় আমার গোপন করে ইত্যাদি গানগুলি সুদক্ষ গায়কদের গাইবার উপযুক্ত গান। রাগে ও তালে দখল না থাকলে এ সমস্ত গানের মর্যাদা রাখা যায় না। আজকের রাগ-প্রধান গানের পথ-প্রদর্শক এই সব গান।

প্রকৃতি :

নীলগগন চন্দ্রকিরণ, ঘনতমসাবৃত, আজি বিমল নিদাঘ, আয়রে বসন্ত, আমরা এমনি এসে, আইল ঋতুরাজ, আঁধার জোয়ার আসে, সুরে ও ছন্দে এই সব গান পুরানো হবার নয়।

ভক্তি :

নীল আকাশের অসীম ছেয়ে, আজি গো তোমার চরণে জননী, আর কেন মা ডাকছ আমায়, চরণ ধ'রে আছি প'ড়ে, এবার তোরে চিনেছি মা, ইত্যাদি গানের সুরে যে অপার্থিব প্রেমের ও ভক্তির অকৃত্রিম পরিচয় পাওয়া যায় আজকের দিনের সুরকারদের সুরে তা দুষ্প্রাপ্য। কারণ বোধহয় এই যে, অন্তরে ভক্তি না থাকলে কৃত্রিম মূর্ছনায় তা প্রকাশ করা যায় না।

কীর্ত্তন :

ও কে গান গেয়ে, ছিল বসি সে, আর কেন মিছে আশা প্রভৃতি গান উচ্চাঙ্গ কীর্তনের আঙ্গিকে ভরা।

এইভাবে দ্বিজেন্দ্রলালের গান অনেক শীর্ষে ভাগ করা যায়। বিশুদ্ধ সংগীতের পর্যায়ের গান ছাড়া দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁর বিখ্যাত হাসির গানগুলির এমন চমৎকার সুর দিয়ে গেছেন—যা একান্তভাবে তাঁরই সৃষ্টি এবং যা পরবর্তীযুগের হাস্যরসের সুরকারদের পথের সন্ধান দিয়েছে। দ্বিজেন্দ্রলালের হাসির গানে মাঝে মাঝে বিলাতী ছাঁদ দেখা যায়। কিন্তু দেশী রাগের চালেও তাঁর হাসির গান আছে : যেমন "প্রাণ রাখিতে সদাই", টপ্পার চালে সুন্দর গান "বুড়োবুড়ি"; লোকগীতের চালে অনবদ্য রচনা "কৃষ্ণরাধিকা-সংবাদ"।

সুরকারের একটি বিশিষ্ট গুণ যেমন তাঁর প্রত্যেক রচনার মধ্যে কিছু

না কিছু নূতনত্ব, একের থেকে অন্যের বিভিন্নতা—তেমনি সমষ্টিগতভাবে তাঁর সমস্ত রচনার মধ্যে একটা মূল ঐক্যের সূত্র পাওয়া যাবে এও আর একটা গুণ। এই ঐক্য monotony নয়; সুরকারের স্বকীয়তার ও ব্যক্তিত্বের ছাপ। মনে হয় দ্বিজেন্দ্রলালের মধ্যে এই রকম একটা ঐক্যের সূত্র পাওয়া যায় যা তাঁর রচনাকে সমগ্রভাবে অন্যান্য সুরকারদের রচনা থেকে পৃথক ও স্বতন্ত্র বলে ঘোষণা করে। বিশ্লেষণ করলে পরে হয়তো একাধিক কারণ খুঁজে পাওয়া যেতে পারে, কিন্তু দ্বিজেন্দ্রলালের সব রকম গানের মধ্যে ব্যঞ্জনার স্পষ্টতা ও তেজস্বিতা বোধহয়, এই ঐক্যের সূত্র গাঁথতে বিশেষভাবে সাহায্য করেছে।

শিল্পের ক্ষেত্রে কোন সৃষ্টিকে বুঝতে হ'লে, স্থান-কাল-পরিবেশের পটভূমিকে বাদ দেওয়া চলে না। অন্যদিকে, জনপ্রিয়তাকে একমাত্র মানদণ্ড বলে ধরে নেওয়া সমীচীন নয়, রচনার বহুলতাকেও নয়। সব দিক বিচার করে দেখলে পরে দ্বিজেন্দ্রলালকে আমাদের দেশের সুরকারদের একজন শ্রেষ্ঠ পথিকৃৎ ব'লে স্বীকার করতে হয়।

কাব্যসঙ্গীতে দ্বিজেন্দ্রলাল

শ্রীরাজ্যেশ্বর মিত্র

দ্বিজেন্দ্রলালের সঙ্গীতসৃষ্টির যথাযথ বিশ্লেষণ, মূল্য নিরূপণ এবং সমাদর আমরা তেমনভাবে করিনি। বর্তমান সাঙ্গীতিক পরিস্থিতিতে এই কাজটি বিশেষভাবে করা দরকার। সঙ্গীতের দিক থেকে এটা হচ্ছে নানা মিশ্রণ ও নূতনত্ব সম্পাদনের যুগ। আমাদের পূর্বযুগের প্রথম দিকেও এমনি প্রচেষ্টা দেখা দিয়েছিল এবং সেই সময়ে দ্বিজেন্দ্রলাল সগৌরবে তাঁর সঙ্গীত রচনায় অগ্রণী হয়েছিলেন। এ বিষয়ে তিনি সম্পূর্ণ সার্থকতাও অর্জন করেছিলেন। তাঁর এই মিশ্রণ প্রচেষ্টা অতিশয় ব্যাপক এবং আমাদের সঙ্গীতের দিক থেকে এর প্রভাব সুদূরপ্রসারী হওয়া উচিত ছিল।

আমাদের গানে তাঁর ব্যক্তিত্ব বিস্ময়ের উদ্রেক করে। এই ব্যক্তিত্বের একটা দিক হচ্ছে তাঁর পৌরুষ-দৃঢ়তা এবং বলিষ্ঠতা, অপর দিক হচ্ছে একটি শান্ত কমনীয় রসোচ্ছল স্নিগ্ধ মাধুর্য। তাঁর গানে এই সব বৈশিষ্ট্যের সুন্দর সমন্বয় সাধিত হয়েছে। আজকালকার কাব্যসঙ্গীতে এই সমন্বয়ের একান্তই অভাব। এই দৃপ্ত বলিষ্ঠ অথচ স্নিগ্ধ মাধুর্যসম্পন্ন রীতির পরিচয়, বলতে কি, হারিয়েই গেছে। দ্বিজেন্দ্রলালের সঙ্গীতের সঙ্গে নতুন করে পরিচয় সাধন এবং আলোচনা করলে বর্তমান শিল্পিগণ একটা নতুন প্রেরণা অবশ্যই পাবেন।

দ্বিজেন্দ্রলালের গানের আর একটি বৈশিষ্ট্য হ'ল এই যে সবরকম নূতনত্বের মাঝখানেও তাঁর রাগ আমাদের জাতীয় সঙ্গীতের বৈশিষ্ট্যকে রক্ষা ক'রেই চলেছে। আমাদের রাগসঙ্গীতের মূলরূপ এবং রসটিও তাঁর রচনায় অক্ষুণ্ণ আছে।

দ্বিজেন্দ্রলালের রচনার প্রধান তিনটি দিক হচ্ছে—দেশাত্মবোধক সঙ্গীত, ভক্তিরসাত্মক সঙ্গীত এবং কাব্যসঙ্গীত। এর মধ্যে তাঁর স্বদেশসঙ্গীত সম্বন্ধেই আমাদের দেশবাসী অধিক পরিচিত। দ্বিজেন্দ্রলালের চরিত্রের সকল বৈশিষ্ট্যই ফুটে উঠেছে তাঁর এই গানগুলিতে। তাঁর দৃপ্ত আত্মসম্মানবোধ, তীব্র অভিমান, জ্বালাভরা ব্যঙ্গ, সুকোমল স্নেহ-ভক্তিপ্লুত আত্মনিবেদন—

সবই প্রকাশ পেয়েছে এই সঙ্গীতগুলিতে বিচিত্র সুরে, বিচিত্র ভঙ্গীতে। তাঁর অধিকাংশ স্বদেশী গান আবেগপ্রধান এবং এই আবেগের সঙ্গে মিশেছে এক উদার ওজস্বিতা। দ্বিজেন্দ্রলালের গানে হাল্কা উত্তেজনা নেই—উদাত্ত সুরে হৃদয় জাগ্রত হয়, প্রশান্ত গাম্ভীর্যে হৃদয় ভরে ওঠে—শ্রদ্ধায় ভক্তিতে আত্মা প্রবুদ্ধ হয়। উদাহরণ স্বরূপ "বঙ্গ আমার জননী আমার, ধাত্রী আমার আমার দেশ," "তুমি তো মা সেই, তুমি তো মা সেই চির গরীয়সী ধন্য অয়ি মা," "যেদিন সুনীল জলধি হইতে উঠিল জননী ভারতবর্ষ"—এই গানগুলির উল্লেখ করা যেতে পারে। প্রশান্তি এবং আকুতির দিক থেকে—"ধন-ধান্যে পুষ্পে ভরা", "প্রতিমা দিয়ে কি পূজিব তোমারে এ বিশ্ব নিখিল তোমার প্রতিমা—" এইসব গান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

এই উদাত্ত ভঙ্গীর মূলে ইংরেজি গানেরও একটি বিশেষ প্রভাব ছিল। দ্বিজেন্দ্রলাল যত্ন ক'রে ইংরেজি গান শিখেছিলেন। এই পাশ্চাত্ত্য সঙ্গীত অনুশীলনের ফলেই তাঁর কণ্ঠস্বর সতেজ এবং ভরাট হয়ে উঠেছিল। তিনি একটি প্রবন্ধে লিখেছিলেন—"ইংরেজি গান স্বাস্থ্যকর ও পুষ্টিকর।" তিনি কেবলমাত্র স্বদেশ সঙ্গীতেই নয়, একান্ত ভারতীয় রীতিতে রচিত গানেও সেই প্রেরণা-লব্ধ স্বাস্থ্য ও পুষ্টি সুযোগ অনুসারে প্রদান করে তাঁর গানকে সঞ্জীবিত করেছেন।

এই পৌরুষের সঙ্গে একটা আশ্চর্য কমনীয়তা ছিল যার উদাহরণ বোধ হয় দ্বিজেন্দ্রলালের গান ছাড়া আর পাওয়া যায় না। তাঁর ভক্তিরসাত্মক গান এবং কাব্যসঙ্গীতে এর পরিচয় পাওয়া যায়। "একবার গালভরা মা ডাকে" —একটি বাউল ঢঙে ভক্তিরসাত্মক গান। এতে একটি অপূর্ব আবেগ এবং মাধুর্যের সংযোগ ঘটেছে। "আর কেন মা ডাকছ আমায়—", "এবার তোরে চিনেছি মা"—এই ধরনের গানে ভক্তিরস উচ্ছল হয়ে উঠেছে। বাংলা গানে ভক্তিরসের প্রাচুর্য অবশ্য বরাবরই ছিল এবং বলতে গেলে পুরাতন বাংলার আদিরসাত্মক গানের পরেই ছিল ভক্তিরসাত্মক সঙ্গীত। কিন্তু সে সব গান দেহতত্ত্ব এবং ঠাকুর দেবতার গানেই সীমাবদ্ধ ছিল। এর মধ্যে দ্বিজেন্দ্রলাল আনলেন সাহিত্যরস। দ্বিজেন্দ্রলালের ভক্তিরসাত্মক রচনা সম্বন্ধে প্রধান কথা হচ্ছে এই যে এর মধ্যে একটা ভয়ঙ্কর রকমের আধ্যাত্মিকতা নেই।

তাঁর এই সব রচনায় আমরা মায়ের প্রতি সন্তানের যে সহজ সরল ভালবাসা তারই প্রকাশ দেখতে পাই। সর্বত্রই একটা মধুর অন্তরঙ্গতা এবং পার্থিব প্রেমের প্রকাশের মধ্যেই ফুটে উঠেছে যে-রস সে অপার্থিব। তার স্পর্শ অন্তরে ভক্তি এবং প্রীতির প্রস্রবণ প্রবাহিত ক'রে দেয়। "চরণ ধ'রে আছি পড়ে"—এই গানটিতে জগৎধারিণীর মাতৃরূপের একটি অপূর্ব বিকাশ হয়েছে। এই গানের সঞ্চারী অংশগুলিতে দ্বিজেন্দ্রলালের স্বকীয় গম্ভীর এবং মন্ত্র-ভঙ্গির চমৎকার পরিচয় পাওয়া যায়। এই রকম আর একটি গান—"পতিতোদ্ধারিণি গঙ্গে", "তুমি যে প্রাণের বঁধু আমরা তোমায় ভালবাসি"—গানটিতে দ্বিজেন্দ্রলাল ভালবাসা প্রেম এবং আত্মসমর্পণের ভাব ফুটিয়ে তুলেছেন তাঁর স্বকীয় উদাত্ত পন্থায়। এর মধ্যে হয়ত পাশ্চাত্য সঙ্গীতের প্রভাবও কতকটা রয়েছে।

ভক্তিরস সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে দ্বিজেন্দ্রলালের অতি বিখ্যাত কীর্তন রাগ "ও কে গান গেয়ে চলে যায়"—এই গানটি উল্লেখ না করলে আলোচনা নিতান্ত অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। ঠিক এই ধরনের গান বাংলার সঙ্গীত ঘেঁটে আর একটি পাওয়া দুষ্কর। এই গানটিতে মাঝে মাঝে সুরের উদাত্ত ভঙ্গির পরিচয় পাওয়া যায় যা কীর্তনাদি গানে একটি নূতন রসের সৃষ্টি করেছে।

আধুনিক কাব্যসঙ্গীত যখন স্বীয় রূপ পরিগ্রহ করছে সে যুগে দ্বিজেন্দ্রলাল সঙ্গীত রচনায় প্রবৃত্ত হন এবং যখন তাঁর মৃত্যু হয় তখনও বাংলা গানে বর্তমান রীতির সূত্রপাত হয়নি। কিন্তু এ যুগের দৃষ্টিভঙ্গি নিয়েও যদি বিচার করি তথাপি তাঁর প্রয়োগশিল্পের দিক থেকে এমন একটি রচনার পরিচয় পাওয়া যাবে যার তুলনা বর্তমান সঙ্গীতেও মিলে না। "আজি এসেছি, আজি এসেছি, এসেছি বঁধু হে", "নীল আকাশের অসীম ছেয়ে", "একি মধুর ছন্দ", "নিখিল জগৎ সুন্দর", "আমরা এমনি এসে ভেসে যাই," "মলয় আসিয়া কয়ে গেছে কানে," "সারা সকালটি বসে বসে এই" প্রভৃতি গান উদাহরণ স্বরূপ উল্লেখ করা যায়।

ছন্দপ্রধান এবং সাধারণ কাব্য সঙ্গীত এ দু' দিকেই দ্বিজেন্দ্রলাল বৈচিত্র্য সম্পাদন করেছেন নানাভাবে। "একি শ্যামল সুষমা মধুময় বিশ্বশিশির ঋতু

অস্তে"—এ গানটি সংস্কৃত লঘুগুরু ছন্দে রচিত। এত দীর্ঘ ছন্দের গান আমাদের সঙ্গীতে বিরল। ছন্দের মনোহারিত্বের সঙ্গে এই অত্যন্ত কোমল এবং কান্ত পদবিশিষ্ট গানটিতেও দ্বিজেন্দ্রলালের বলিষ্ঠতা অক্ষুণ্ণ রয়েছে। "আজি এসেছি" গানটিতেও দ্বিজেন্দ্রলাল এমন বৈচিত্র্য এনেছেন যে সুরে এবং কথায় সঙ্গীতের পরিপূর্ণ বার্তা বহন করে ছন্দের হিল্লোল বয়ে চলেছে। এ গানে সুর ও কাব্যের মিলন, ভাবাবেগ-আকুলতা এবং কারুণ্য উপলব্ধির বস্তু। বৈচিত্র্যের দিক থেকে আর একটি চমৎকার গান হল "আয়রে বসন্ত ও তোর কিরণ মাখা পাখা তুলে"—এই গানটিতে একটি শোভন পুলকের স্পর্শ লেগেছে সুরের লীলায়িত সঞ্চরণে। "ঐ মহাসিন্ধুর ওপার থেকে"—গানটি দ্বিজেন্দ্রলালের একটি অপূর্ব সৃষ্টি। এমন আবেগপূর্ণ গান খুব কমই শুনতে পাওয়া যায়। এই গানটির একটি বৈশিষ্ট্য এই যে যদিও রাগসঙ্গীতের উপর ভিত্তি করেই গানটি রচিত তথাপি একটি কীর্তনাঙ্গ ভঙ্গিও গানটির সঙ্গে মিশে গেছে এবং এই মিশ্রণের ফলে গানটি আরও বিচিত্র হয়ে উঠেছে।

রাগসঙ্গীতে দ্বিজেন্দ্রলাল যে সব গান রচনা করেছেন তার অনুশীলন করলে দেখা যায় খাম্বাজ ঝিঁঝিট এবং ভৈরবী তাঁর সবচেয়ে প্রিয় রাগ ছিল। অপরাপর রাগেও তিনি কয়েকটি উৎকৃষ্ট গান রচনা করেছেন।

খাম্বাজে বা বেহাগে তাঁর বিখ্যাত কয়েকটি গান হল "আজি গাও মহাগীত মহা আনন্দে", "একি মধুর ছন্দ মধুর গন্ধ পবন মন্দ মন্থর", "শিথিল জগৎ সুন্দর তব," "তুমি বাঁধিয়া কি দিয়ে রেখেছ হৃদি এ," "সে কেনরে দেখা দিল রে"। এছাড়া আরো অনেক অবশ্য আছে কিন্তু এ গানগুলির প্রত্যেকটির এক একটি অনন্যসাধারণ বৈশিষ্ট্য বর্তমান। "একি মধুর ছন্দ মধুর গন্ধ পবন মন্দ মন্থর" গানটি নৃত্যভঙ্গীয় এবং এতে কবির বলিষ্ঠ উদার গাম্ভীর্য ফুটে উঠেছে। "এমনি এসে ভেসে যাই" ঝিঁঝিট গানটি রসসৃষ্টিতে অতুলনীয়, গানটি একটি সম্পূর্ণ নতুন ধরনের সৃষ্টি। আলো হাসি কুসুমগন্ধ সবই যেন ইন্দ্রধনুর মত বর্ণচ্ছটায় উদ্ভাসিত হয়ে সুরে আত্মপ্রকাশ করেছে এই গানে।

দ্বিজেন্দ্রলাল ঝিঁঝিটে আরো একটি সুন্দর গান রচনা করেছেন: "আজি তোমার কাছে ভাসিয়া যায় অন্তর আমার"—সূক্ষ্ম মীড় এবং ছোট ছোট সুরের কাজ সম্পূর্ণ আবেদন নিয়ে ফুটে উঠেছে। "মলয় আসিয়া কয়ে গেছে

কানে প্রিয়তম তুমি আসিবে" এ গানটি তো বৈশিষ্ট্যের দিক দিয়ে আজও অতুলনীয় হয়ে আছে। এর ঠাট নটমল্লার।

বাহারে "এস প্রাণসখা এস প্রাণে" তাঁর একটি বিচিত্র সৃষ্টি। এতে একদিকে ছন্দ অপরদিকে সুরের লীলায়িত সঞ্চরণ আবার গাম্ভীর্য অথচ উচ্ছলতা—সবই অপূর্ব গৌরবে সমন্বিত হয়েছে। এমনি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ বাগেশ্রী কানাড়ায় আর একটি গান—"তোমারেই ভালবেসেছি আমি তোমারেই ভালবাসিব।" কথা এবং সুরের এমন গভীর মিল খুব কমই দেখা যায় এই স্থানটির স্থানে স্থানে কোমল গান্ধারে, মধ্যম এবং কোমল নিষাদে কোমল ধৈবতে যে মীড়ের এবং আন্দোলনযুক্ত গমকের সৃষ্টি করা হয়েছে তা সুরের দিক থেকে যেমন বিচিত্র, রসের দিক থেকে তেমন গভীর। ভালবাসার তৃপ্তি এবং কারুণ্য দুইই অপরূপ দক্ষতার সঙ্গে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে সুরের নৈপুণ্যে। ইমন ঠাটে তিনি একটি অপরূপ গান বাঁধেন: "সারা সকালটি ব'সে ব'সে।" এই ঠাটে আর একটি গান বাঁধেন অপূর্ব বীররসের ভঙ্গিতে: "সেথা গিয়াছেন তিনি"। এ-ঠাটে যে বীররস পরিবেষণ করা, প্রথম শ্রেণীর সুরকারের পক্ষেই সম্ভব।

ভৈরবীতে দ্বিজেন্দ্রলালের কয়েকটি উৎকৃষ্ট গান হচ্ছে—"শুধু দুদিনেরই খেলা", "এ জীবনে পূরিল না সাধ ভালবাসি", "আজি বিমল নিদাঘ প্রভাতে", "এস এস বঁধু বাঁধি বাহুডোরে এসো বুকে করে রাখি", "একই ঠাঁই চলেছি ভাই ভিন্ন পথ যদি", "আজি নূতন রতনে ভূষণে যতনে প্রকৃতি সতীরে সাজিয়ে দাও"—এই গানগুলির কোনটি ছন্দপ্রধান, কোনটিতে বিলম্বিত লয়ের ওপর ছোট ছোট সুরের কাজ রয়েছে। এগুলি নানা ভাবে বিকশিত করে তোলবার সুযোগ শিল্পীর আছে। "এসো এসো বঁধু বাঁধি বাহুডোরে এস বুকে করে রাখি"—গানটি স্বল্প পরিচিত কিন্তু এমনই আবেগপূর্ণ মধুর প্রেমসঙ্গীত খুব অল্পই পাওয়া যায়। গানটি অতিশয় কোমল এবং লাবণ্যপূর্ণ। "একই ঠাঁই চলেছি ভাই ভিন্ন পথ যদি"—এ গানটি ছন্দপ্রধান। এটি সেই ছন্দ যা আজকাল ঝম্পক নামে পরিচিত অর্থাৎ তিন দুই ছন্দে রচিত। "আজি নূতন রতনে ভূষণে যতনে প্রকৃতি সতীরে সাজিয়ে দাও" গানটিতে নানাদিক থেকে কি ছন্দে কি সুরে বহু বৈচিত্র্য বিদ্যমান। এই

।ানে ক্রমিক আরোহণ এবং অবরোহণের মধ্যে যে বৈশিষ্ট্য আছে সেটি দ্বিজেন্দ্রলালের স্বকীয়।

এছাড়া ইমন কল্যাণ, ভূপালী, সোহাগ, ভীমপলশ্রী প্রভৃতি সুরেও দ্বিজেন্দ্রলালের বহু বিচিত্র সঙ্গীত রয়েছে। ভূপালীতে "তুমি যে হে প্রাণের ।ধু আমরা তোমায় ভালবাসি" গানটির উল্লেখ পূর্বেই করেছি। এছাড়া ইমন কল্যাণ "যাও হে সুখ পাও" "তুমি হে আমার হৃদয়েশ্বর" প্রভৃতি গানও বিশেষ বৈচিত্র্যপূর্ণ।

কীর্তনাঙ্গ গানের মধ্যে, "ও কে গান গেয়ে গেয়ে চলে যায়" গানটি ছাড়া "ছিল বসিয়া কুসুম কাননে" বা "আর কেন মিছে আশা মিছে ভালবাসা"— গান দুটি বাংলার সঙ্গীতের মনোহর দৃষ্টান্ত।

দ্বিজেন্দ্রলালের আরো অনেক গানের উল্লেখ বা আলোচনা করা হল না। স্বল্প পরিসরে সেটি সম্ভব নয়।

দ্বিজেন্দ্রলালের সঙ্গীতের সঙ্গে বর্তমান কাব্যসঙ্গীতের যখন তুলনা করি তখন আধুনিক কালের একটি দুর্বলতা বা অশোভনতা আমাদের বিশেষ পীড়া দেয়। এটি হচ্ছে বর্তমান সঙ্গীতে উচ্ছল প্রাণশক্তি বা বলিষ্ঠতার অভাব। বাংলা গানকে যথেষ্ট নমনীয় করা হয়েছে কিন্তু সেই তুলনায় দৃঢ় এবং পুষ্ট করা হয়নি। বিশেষ করে আজকালকার রেডিও, গ্রামোফোন এবং সিনেমার নাকীসুরে গান যখন শুনি, আজ এই অভাব স্মরণ করে লজ্জা বোধ হয়। দ্বিজেন্দ্রলাল এই দুটি দিকেই চমৎকার সামঞ্জস্য বিধান করে গেছেন। আজকালকার শিল্পীদের বিশেষভাবে উচিত দ্বিজেন্দ্রলালের এই ক্ষমতাটি উপলব্ধি করে তাঁদের গায়নশিল্পকে রসসমন্বিতভাবে উদ্দীপ্ত করা। এই কারণেও দ্বিজেন্দ্রলালের কাব্যসঙ্গীত আলোচনা করা আজকের দিনে বিশেষ প্রয়োজন। এছাড়া সৌন্দর্য-নৈপুণ্য, বাঁধুনি এবং অপরাপর রূপছন্দের প্রয়োগ তো আছেই।

দ্বিজেন্দ্রলালের ছন্দপ্রতিভা

দিলীপকুমার রায়

দ্বিজেন্দ্রলালের কাব্য তথা ছন্দপ্রতিভার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন প্রথম রবীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'আষাঢ়ে'র নক্সাগুলির মিল-এর ক্ষমতারও প্রশংসা করেছিলেন মুক্তকণ্ঠে: "উত্তপ্ত লৌহচক্রে হাতুড়ি পড়িতে থাকিলে যেমন স্ফুলিঙ্গ বৃষ্টি হইতে থাকে, তাঁহার ছন্দের প্রত্যেক ঝোঁকের মুখে তেমনি করিয়া মিল বর্ষণ হইয়াছে। সেই মিলগুলি বন্দুকের ক্যাপের মতো আকস্মিক হাস্যোদ্দীপনায় পরিপূর্ণ। ছন্দের কঠিনতাও যে কবিকে দমাইতে পারে না তাহারও অনেক উদাহরণ আছে।"

দ্বিজেন্দ্রলাল 'আষাঢ়ে'-তে সম্পূর্ণ স্বকীয় ভঙ্গিতে চ'লে যখন বাংলা ছন্দে একজন নব পথিকৃৎ ব'লে গণ্য হন তখন তিনি এ-ছন্দ ও মিলের কিছু প্রেরণা পেয়েছিলেন রিচার্ড হ্যারিস বারহাম-এর বিখ্যাত ইনগোল্ড্স্‌বি লেজেণ্ডের ছন্দ ও মিল থেকে। কিন্তু শুধু এই বইটি থেকেই নয়। টমাস ক্রফটন ক্রকার ১৮৩৯ খৃষ্টাব্দে 'পপুলার সংস অফ আয়র্লণ্ড' ব'লে একটি জনপ্রিয় গ্রন্থ প্রকাশ করেন। তাতেও বারহাম প্রবর্তিত মিল-এর পদাঙ্ক অনুসরণ করা হয়েছিল যথা who wise is এর সঙ্গে no ice is এর মিল, our shopkeepers have a cant এর সঙ্গে they charge us extravagant জাতীয় মিল। দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁর 'আষাঢ়ে'-তে এই পথেই নানা বাংলা মিল-এর প্রবর্তন করেন বটে কিন্তু তাঁর অনন্যতন্ত্র প্রতিভার বরে অভিনবত্ব বজায় রেখে সুষ্ঠু ঘরোয়া মিলও বর্ষণ করেন ছত্রে ছত্রে; যথা:

সে প্রকাণ্ড কার্যে
প্রচার করতে হিন্দুধর্ম চেতন করতে আর্যে
পাঁচিল গুলো ভাংলো
চালা করল বাংলো

(নসীরাম পালের বক্তৃতা—আষাঢ়ে)

মিথ্যা মিথ্যা কথা যে,—"বাঙালী ভীরু,
বাঙালীর নাহি একতা—"
কেন বক্তৃতায় রটাও সে-বাণী,
খবর কাগজে লেখ তা ?

(বাঙালী মহিমা—আষাঢ়ে)

সাল্‌সা খাও, বসবে হ'য়ে উচ্চ মণিমঞ্চবান,
বিদ্যা হবে পঞ্চানন, আর মূর্তি হবে পঞ্চবাণ।

(সাল্‌সা খাও)

অথবা দেখিয়া শুনিয়া বেড়াতাম গুনগুনিয়া
ময়রা-দোকানে মাছি হয়ে যদি কী মজারি হ'ত দুনিয়া।

(হাসির গান)

প্রেমটা ভারি মজার ব্যাপার, প্রেমিক মজার জিনিস।
ভাবিস্ কি রে এম্‌নি গো তার থাকবে চিরদিন ! ইশ !
কত "প্রিয়তমে প্রাণেশ্বরী" তাহারি উত্তর
(এই) প্রিয় সম্বোধন শেষে হায় "ওগো শোনো"-য় ফিনিশ।

(হাসির গান)

পারো তো জন্মোনা কেউ বিষ্যুৎবারের বারবেলায়,
জন্মাও তো সাম্‌লাতে পারবে না কো তার ঠেলায়।

(হাসির গান)

বুড়োবুড়ি দুজনাতে মনের মিলে সুখে থাকত,
বুড়ি ছিল পরম বৈষ্ণব, বুড়ো ছিলেন ভারি শাক্ত।

(হাসির গান)

প্রাণ রাখিতে সদাই যে প্রাণান্ত—
জন্মিতে কে চাইত যদি আগে সেটা জানত ?

(হাসির গান)

বারহামের মিল সর্বত্র এত সুষ্ঠু ছিল না, যথা তাঁর lately-র সঙ্গে estate lay-র মিল বা fellows he-র সঙ্গে jealousy ইত্যাদি। উদাহরণ বাড়ানো বাহুল্য হবে। আমার বক্তব্য এই যে দ্বিজেন্দ্রলালের কবিপ্রতিভা নির্ভেজাল

ছিল ব'লেই তাঁকে গাজোয়ারি মিল-এর কাছে হাত পাততে হয়নি হাস্তের উদ্দীপন জাগাতে। ছন্দপ্রসঙ্গে মিল সম্বন্ধে এটুকু গৌরচন্দ্রিকা গাইলাম ছন্দ ও মিলের মধ্যে একটা স্বাভাবিক আত্মীয়তা আছে ব'লে।

বাংলা কাব্যে দ্বিজেন্দ্রলাল প্রথম একটি নবধারা তথা ছন্দের পথিকৃৎ হবার দাবি করতে পারেন তাঁর আর্যগাথা দ্বিতীয় ভাগে। আর্যগাথা প্রথম ভাগ প্রকাশ হয় ১৮৮২ সালে, দ্বিতীয় ভাগ—১৮৯৪ সালে, বারো বৎসর পরে। এতে প্রথমেই উৎসর্গ কবিতাটি (তাঁর সহধর্মিণী সুরবালা দেবীর উদ্দেশে) রচিত হয় বলাকার ছন্দে, অর্থাৎ সমিল অক্ষরবৃত্ত প্রবহমান মুক্তক ভঙ্গিতে। এ থেকে একটি ছোট উদ্ধৃতি দিলেই আমার বক্তব্য সপ্রমাণ হবে যে এ বলাকার ছন্দেরই অগ্রদূত বটে :

ছিলে বা তখন
পাপিয়ার স্বরবৎ মধুর প্রবল ;
প্রাতঃস্বর্ণ মেঘবৎ প্রগাঢ় উজ্জ্বল ;
ছিলে নক্ষত্রের সম অর্ধরজনীর—
শান্ত, দিব্য, স্থির,
কিন্তু দূরস্থায়ী—
তখন সৌন্দর্যে এসেছিলে, প্রেমে আসো নাই।

সুতরাং এ সিদ্ধান্ত সত্যভিত্তিক যে, বলাকার বিখ্যাত মুক্তক ছন্দের প্রবর্তক দ্বিজেন্দ্রলালই বটে। এই সময়েই তিনি দ্বিমাত্রিক সংস্কৃত গুরু স্বরের দিকে ঝোঁকেন সম্ভবত সুরের দোলায়। উদাহরণতঃ আর্যগাথা দ্বিতীয় ভাগে তাঁর প্রসিদ্ধ আশোয়ারি একতালায় বাঁধা একটি সুন্দর গান আছে বাণ্মাত্রিক মাত্রাবৃত্তে :

কি দিয়ে সাজাব | মধুর মুরতি ?
কি সাজ মিলিবে | উহার সাথ রে ?
কঠিন হীরা | হেম রজতে
সাজায়ে পূরে না | মনের সাধ রে !

এখানে গাইবার সময়ে হী ও হে দুটি স্বরকে দ্বিমাত্রিক ক'রে দীর্ঘ ক'রে গাইতাম আমি তাঁর সুরে সুর মিলিয়ে।

এভাবে তিনি কখনো কখনো এখানে ওখানে অন্য নানা গানেও গুরু স্বরকে দীর্ঘায়িত দ্বিমাত্রিক মর্যাদা দিয়ে গাইতেন সংস্কৃত ভঙ্গিতে, যথা ("তুমি বাঁধিয়ে কী দিয়ে রেখেছ হৃদি এ" গানে)

এ কি | চ'লে যেতে বাধে | চরণে

এ কি | বিরহে বাজে | স্মরণে

এখানে "বা" গুরু, দু মাত্রা। সুরে এ-গানটি শুনলে মন খুশি হয় এই দ্বিমাত্রিক মিড়ে।

তাই মনে হয় এই সময় থেকেই তিনি সংস্কৃত গুরুস্বরকে দ্বিমাত্রিক ক'রে গাইবার বা আবৃত্তি করবার দিকে ঝোঁকেন যার ফলে ১৮৯৯ সালে গ'ড়ে ওঠে 'আষাঢে'-তে তাঁর বিখ্যাত কবিতাযুগল কলিজজ্ঞ (অনুষ্টুপ্ ছন্দে) ও কর্ণবিমর্দন কাহিনী পজ্ঝটিকা ছন্দে। এ দুটি ছন্দের উদ্ধৃতি দিলাম না —সংকলনে এ দুটিই দেওয়া হয়েছে ব'লে। উত্তরজীবনে এ-লঘুগুরু ছন্দে তিনি অনেকগুলি সংস্কৃতভঙ্গিম গান বাঁধেন—বাংলা ভাষায় যে-গানগুলির ছন্দসুষমা মনকে মুগ্ধ না ক'রেই পারে না, যথা পতিতোদ্ধারিণি গঙ্গে, নিখিল জগত সুন্দর সব, এ কি শ্যামল সুষমা, এ কি মধুর ছন্দ, আইল ঋতুরাজ, এস প্রাণসখা···ইত্যাদি।

লঘুগুরু ছন্দ নিয়ে অনেক বাগ্বিতণ্ডা হয়ে গেছে, যেহেতু নানা সমালোচকই এ ছন্দটি পড়তে পারেন না অনভ্যাসবশে। কিন্তু সংস্কৃত ছন্দ যাঁরা ভালোবেসেছেন তাঁদের কাছে দ্বিজেন্দ্রলালের লঘুগুরু ছন্দে রচিত গানগুলি রসোত্তীর্ণ ব'লে গণ্য হবেই হবে। অন্ততঃ গানে যে লঘুগুরু ছন্দ সার্থক রসসৃষ্টি করতে পারে রবীন্দ্রনাথ ও দ্বিজেন্দ্রলাল উভয়েই তাঁদের প্রতিভার আলোয় প্রমাণ করেছেন। আজ ভারতের জাতীয় সঙ্গীত "জনগণমন" লঘুগুরু ছন্দেই রচিত—এর পরে এ-ছন্দের আর ওকালতি না করলেও চলবে। তবু আধুনিক সমালোচকদের লঘুগুরু ছন্দ-বিমুখতার উল্লেখ করলাম শুধু এই জন্যে যে, দ্বিজেন্দ্রলাল এ-ছন্দটি অত্যন্ত ভালোবাসতেন ব'লেই এ ছন্দে গান বাঁধতেন জেনেও যে, এ-ছন্দ অনেকেই পড়তে পারবেন না। তাঁর পরে এ-ছন্দে কেবল কবি নিশিকান্ত অনেকগুলি কবিতা ও গান রচনা করেছেন, তা থেকে কয়েকটি দৃষ্টান্ত আমি দিয়েছি আমার

'ছান্দসিকী'-তে। শ্রীনলিনীকান্ত সরকারও এ-ছন্দে কয়েকটি গান বাঁধেন, সেগুলি আমি গাইতাম সুর দিয়ে কিন্তু বই হ'য়ে না বেরুনোর দরুন তাদের চল হয় নি তেমন। আমি নিজেও এ-ছন্দে অনেকগুলি গান বেঁধেছি—আমার 'অনামী'তে সেগুলি ছাপা হয়েছে। যাই হোক দ্বিজেন্দ্রলাল এ-ছন্দে আশ্চর্য কৃতিত্ব দেখিয়েছেন এই সত্যটি প্রমাণ করতেই তাঁর অসামান্য দানের কথা উল্লেখ করলাম।

অতঃপর দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁর হাসির গান-এ একটি সম্পূর্ণ নূতন ছন্দের প্রবর্তন করেন—ত্রিস্বরপর্বিক স্বরবৃত্ত যার পদাঙ্ক আর কেউ অনুসরণ করেনি—কেবল কবি নিশিকান্ত আমার অনুরোধে একটি মাত্র কবিতা রচনা করেন অনেক পরে। এরও অনেক পরে—১৯৫০ সালে—আমি নিজেও এ-ছন্দে ইন্দিরা দেবীর কয়েকটি হিন্দি-ভজনের অনুবাদ করি। সে-কথা পরে বলছি—আগে এ-ছন্দটির একটু ব্যাখ্যা করি।

এ-ছন্দটির স্বরূপ বুঝতে হ'লে একটু পিছিয়ে যেতে হবে—বুঝতে হবে আমাদের স্বরবৃত্ত ছন্দের ধারাবিকাশ। যথাসম্ভব সংক্ষেপেই বলব যা বলবার আছে—আমার ছান্দসিকী-তে এ নিয়ে বিশদ আলোচনা করা হয়েছে ব'লেও বটে।

আমাদের স্বরবৃত্ত ছন্দ হ'ল আসলে গ্রাম্য ছন্দ, নানা ছড়ায় ও লোকসঙ্গীতে এর পরিচয় মেলে। এতে প্রতি পর্বে সাড়ে পনর আনা ক্ষেত্রে চারটি ক'রে স্বর (syllable) থাকে এবং প্রতি স্বরকে এক মাত্রা ধরা হয়—কি যুগ্মধ্বনি কি অযুগ্ম। অ ই ও ক গ চ বা ভি প্রভৃতি খোলা স্বরান্ত শব্দকে (open syllable) প্রবোধ সেন নাম দিয়েছেন অযুগ্ম ধ্বনি, কন্, চুন্, মোট্, শির্ জাতীয় হসন্ত শব্দকে (closed syllable)—যুগ্মধ্বনি। মাত্রাবৃত্তে যুগ্মধ্বনি সর্বত্রই দ্বিমাত্রিক, স্বরবৃত্তে সচরাচর একমাত্রিক, অক্ষরবৃত্তে শব্দান্তবর্তী যুগ্মধ্বনি দ্বিমাত্রিক, শব্দমধ্যবর্তী যুগ্মধ্বনি একমাত্রিক। প্রাক্‌রবীন্দ্র যুগে পণ্ডিত তথা কবিসমাজে শুধু অক্ষরবৃত্তেই কুলীন কবিতা লেখা হ'ত, যদিও মাত্রাবৃত্তের চরণ এখানে ওখানে আকস্মিক ভাবে আত্মপ্রকাশ করত। তবু বলতেই হবে যে, স্বরবৃত্ত ছন্দ রবীন্দ্রনাথ ও দ্বিজেন্দ্রলালের অভ্যুদয়ের আগে কুলীন কবিসংসদে অপাংক্তেয়ই ছিল। এর দেখা পেতে হ'লে হাত পাততে হত

অখ্যাত ধামালী, তর্জা, ঝুমুর, দাশুরায়ের পাঁচালি, আগমনী, ভাটিয়ালি, সারি প্রভৃতি গ্রাম্য গানে। তার পরে রামপ্রসাদ, কমলাকান্ত, নরেশচন্দ্র প্রমুখ সাধক কবিরা শ্যামাসঙ্গীতে এর প্রবর্তন করেন। এদের মধ্যে রামপ্রসাদী গানই ভাবগৌরবে তথা রসকৌলীন্যে হ'য়ে দাঁড়ায় স্বরবৃত্তের শিরোমণি :

প্রসাদ বলে | ভবার্ণবে | ব'সে আছি | ভাসিয়ে ভেলা ;
জোয়ার এলে | উজিয়ে যাব | ভাঁটিয়ে যাব | ভাঁটার বেলা।

ছড়া যথা :

বিষ্টি পড়ে | টাপুর টুপুর | নদেয় এলো | বান।

বাউল যথা :

কমল বনে | কে পশিল | সোনার জহু | রি !
নিকষে ঘ | যয়ে কমল | আ মরি ম | রি !

কিন্তু গ্রাম্য ভাষায় এ ছন্দের চল থাকলেও একে কৌলিন্য দান ক'রে জাতে তোলেন প্রথম রবীন্দ্রনাথ ও দ্বিজেন্দ্রলাল, এঁদের দুজনের আগে খ্যাতনামা কবিদের মধ্যে কুলীন কাব্যে স্বরবৃত্ত ছন্দের চল ছিল না বললেই হয়। এ ছন্দটিকে রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল, সত্যেন্দ্রনাথ ও তাঁদের পরবর্তী কবিরা সবাই এই ভাবে গেঁথেছেন, অর্থাৎ প্রতি পর্বে চারটি স্বরে চার মাত্রা। এক কথায় একে বলা যায় চতুঃস্বরপর্বিক স্বরবৃত্ত। ত্রিস্বরপর্বিক স্বরবৃত্তের চল আদৌ ছিল না। সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত প্রথম সজাগভাবে চেয়েছিলেন স্বরবৃত্তে এ ত্রিমাত্রিক কদম, কিন্তু তিনি এ-চাল চালু করতে পেরেছিলেন মাত্রাবৃত্তের সঙ্গে কাঁধ মিলিয়ে তবে। তাই তাঁর ত্রিস্বরপর্বিক স্বরবৃত্তকে শ্রীপ্রবোধ সেন স্বরমাত্রিক ছন্দ নাম দিয়েছেন—আমরাও গ্রহণ করেছি অকারণ তাঁর সঙ্গে অনেক লড়াই করার পরে। অকারণ বলছি এই জন্যে যে স্বরমাত্রিক ছন্দ যে বিশুদ্ধ স্বরবৃত্ত নয় এ-সত্যটি অন্তঃশ্রুতির একটু বিকাশ হলেই উপলব্ধি করা যায়। সত্যেন্দ্রনাথের কয়েকটি কবিতার নমুনা দিলে হয়ত একথা আরো প্রাঞ্জল হবে : সত্যেন্দ্রনাথ লেখেন :

১। রূপ্—শা—লী | ধান্—বু—ঝি | এই—দে—শে | সব্—টি

এখানে প্রতি পর্বে তিনটি ক'রে স্বর (syllable) পাই বটে, কিন্তু প্রতি পর্বেই একটি যুগ্মধ্বনি ও দুটি অযুগ্ম রয়েছে। ফলে প্রতি পর্বে তিনটি ক'রে স্বর আছে বটে, কিন্তু ঐ সঙ্গে চারটি ক'রে মাত্রাও আছে: ১টি যুগ্ম+ ২ অযুগ্মের ধ্বনি জুড়ে চার মাত্রা। কাজেই একে বলা যায় ত্রিস্বরপর্বিক চতুর্মাত্রিক স্বরমাত্রিক ছন্দ।

তারপর সত্যেন্দ্রনাথের:

২। দাও—কে—বল্ | যশ্—অ—মল্ |
কীর্—তি—সার্ | কৃৎ—তি—বাস্ |

৩। চ—পল্—পায় | কে—বল্—ধাই |
কে—বল্—গাই | পরীর্—গান্ |

এখানে প্রতি পর্বে তিনটি স্বর ও পাঁচটি মাত্রা, কাজেই এর নাম— ত্রিস্বরপর্বিক পঞ্চমাত্রিক স্বরমাত্রিক।

অতঃপর ধরা যাক্ সত্যেন্দ্রনাথের

৪। ঐ | সিন্—ধুর—টিপ্ | সিং—হল্—দ্বীপ্ |
কান্—চন্—ময় | দেশ্ |

এখানে প্রতি পর্বে তিনটি স্বর ও ছয়টি মাত্রা। তাই এর নাম হবে— ত্রিস্বরপর্বিক ষাণ্মাত্রিক স্বরমাত্রিক।

তা হ'লে দেখা যাচ্ছে এগুলির একটিও বিশুদ্ধ স্বরবৃত্ত নয়, যেহেতু এগুলিকে বিকল্পে মাত্রাবৃত্ত ছন্দও বলা চলে। দ্বিজেন্দ্রলালই তাঁর 'হাসির গানে' প্রথম আত্মপ্রতিষ্ঠ ত্রিস্বর স্বরবৃত্ত ছন্দে গান লেখেন যাকে বিকল্পেও মাত্রাবৃত্ত বলা চলে না। আমার মনে হয় এ-ছন্দে কবিতা তেমন ভালো শোনায় না— অর্থাৎ আবৃত্তি করে রস পাওয়া যায় না। কিন্তু গানে চমৎকার শোনায় যথা দ্বিজেন্দ্রলালের হাসির গানে স্ত্রীর উমেদার-এ:

যদি | জান্—তে—চাও | আ—মি—ঠিক্ |
কী—র—কম্ | স্ত্রী—চাই— |
ফর্—সা—কি | কা—লো—কি | মা—ঝা—রি | রঙ্— — |
লম্—বা—কি | বেঁ—টে—কি | ক্ষী—ণা—কি | পী—না—
দেখ—তে—ঠিক্ | প—রী—কি | দেখ্—তে—ঠিক্ | সঙ্— —

অপিচ যেমনটি চাই তেমন হয় না—তে :

আমি | চাই – আ – মার্ | বু – দ্ধি – টি | হয় – আ – রো | সূ – ক্ষ্ম – |
চাই – ভা – র্ষার | মে – জাজ্ – হয় | এক্ – টু – কম্ | রুক্ষ – |

আমি | চাই – কে – বল্ | সুখ্ – টি – আর্ |
চাই – না – ক | দুঃ – খ – তা |
যে – মন্ – টি | চাই – তে – মন্ | হয় – না

এখানে প্রতি পর্বে তিনটি ক'রে স্বর (syllable) আছে ঠিকই, কিন্তু মাত্রা কোনোটিতে পাঁচ, কোনোটিতে চার, কোনোটিতে তিন। কাজেই একে মাত্রাবৃত্ত ভঙ্গিতে পড়া অসম্ভব—শুধু স্বরবৃত্তেই এর মাত্রাসাম্য হ'তে পারে ব'লে এইই হ'ল খাঁটি ত্রিস্বরপর্বিক স্বরবৃত্তের নমুনা।

কবি নিশিকান্ত আমার অনুরোধে এই ছন্দে একটি সুন্দর কবিতা রচনা করেন—এটি কবিতা, গান নয়—মনে রাখা চাই :

সিন্ধুজল্ | আন্দোলি' | উচ্ছলে | তটে তার্ |
রাত্রিদিন্ | নিদ্রাহীন্ | কতই ভাব্ | ওঠে তার্ |
গর্জনে | গর্জনে | গর্জনে |

পুরো কবিতাটি আমার ছান্দসিকীতে ছাপা হয়েছে ৭৬-৭ পৃষ্ঠায়। এ-ছন্দে আর কেউ কবিতা লেখেন নি—আরো এই জন্যে যে, এ-ছন্দটি গানের সুরে যেমন চমৎকার শোনায়, কবিতায় আবৃত্তি ক'রে তেমন তৃপ্তি পাওয়া যায় না।

এ ছন্দে বহুদিন বাদে ইন্দিরা দেবী অনেকগুলি মীরাভজন বাঁধেন হিন্দিতে। তাঁর আগে হিন্দি ভাষায়ও এ-ছন্দে কেউ গান কি কবিতা বাঁধেন নি। আমি এ-গানগুলিতে সুর দিতে গিয়েই প্রথম আবিষ্কার করি যে এগুলি চলতি হিন্দি লঘুগুরু ছন্দে বাঁধা নয়—নিখুঁৎ ত্রিস্বরপর্বিক স্বরবৃত্ত। খুশি হয়ে তর্জমা করি ঐ ছন্দেই—গানের সুরে এগুলি চমৎকার শোনায় ব'লেও বটে। মূল হিন্দি গানগুলির দৃষ্টান্ত ইন্দিরা দেবীর শ্রুতাঞ্জলি ও দীপাঞ্জলিতে মিলবে ব'লে আমি এখানে শুধু মৎকৃত একটি অনুবাদ উদ্ধৃত করেই ক্ষান্ত হব। এর পুরো অনুবাদটি আমার 'ভিখারিনী রাজকন্যা'য় আছে (১১৯ পৃষ্ঠা)।

ইন্দিরা দেবী লিখেছিলেন :

লা – গি | কৈ – সী – ল | গন্ – মী – রা |
হো – কে – ম | গন্
গ – লি | গ – লি – হ্ | রি – গী – ত |
গা – নে – ল | গী (শ্রুতাঞ্জলি ৪৮ পৃঃ)

এর বাংলা প্রতিরূপ আমি লিখেছি এইভাবে :

এ – লো | প – রম্ – ল | গন্ – মী – রা |
প্রে – মে – ম | গন্
পে – য়ে | কীর্—তন – বঁ | ধুর্ – প – থে | প – থে – চ | লে !
ছি – ল | কাল্ – মা – নি | নী – হো – লো | আজ্ – যো – গি | নী
হায় – রে | রা – ণী – পা | গ – লি – নী | স – বাই – ব | লে !

'শ্রুতাঞ্জলি'র আর একটি হিন্দি গানের অনুবাদ (১০১ পৃষ্ঠা) :

কে – ন—ডা – কো – গো | বাঁ – শির্ – তা | নে
তো – মার্ | কা – ছে – চাই | নি – জেই – হে | আস্ – তে – ষ | খন ?
আ – নো | লু – টে – কোন্ | ছন্ – দে – গা | নে
তো – মার্ | রা – ঙা – পায় | ব – খন্ – চায় | ঠাঁই – ত – মু | মন ?

এই গেল দ্বিজেন্দ্রলালের প্রবর্তিত একটি নবছন্দ সৃষ্টি—ত্রিস্বরপর্বিক স্বরবৃত্ত। তারপরে তিনি এই ত্রিমাত্রিক কদমেই আর একটি সুন্দর ছন্দে কয়েকটি কবিতা লেখেন—ষাণ্মাত্রিক অক্ষরবৃত্তের স্বরবৃত্ত প্রতিরূপ। এ-ছন্দরটির নাম দেওয়া যেতে পারে ষটস্বরপর্বিক (ষাণ্মাত্রিক) স্বরবৃত্ত। এর আঙ্গিকের ব্যাখ্যা করতে কবি হেমচন্দ্রের একটি বিখ্যাত কবিতা থেকে উদ্ধৃত করি কয়েকটি লাইন :

চীন ব্রহ্মদেশ | অসভ্য জাপান | তারাও স্বাধীন | তারাও প্রধান |
দাসত্ব করিতে | করে হেয় জ্ঞান | ভারত শুধুই | ঘুমায়ে রয় !

এখানে কবিতাটি তিনের কদমেই দৌড়েছে, অথচ এটি মাত্রাবৃত্ত কি স্বরবৃত্ত নয়—বিশুদ্ধ অক্ষরবৃত্তই বটে, কেননা শব্দান্তর্বর্তী যুগ্মধ্বনি এখানে দ্বিমাত্রিক,

শব্দান্তর্বর্তী যুগ্মধ্বনি একমাত্রিক। এই কাঠামোয় প্রতি যুগ্মধ্বনি সর্বত্র এক-মাত্রিক হ'লে তবেই সে ছন্দ হবে এ-যাগ্মাত্রিক অক্ষরবৃত্তের স্বরবৃত্ত প্রতিরূপ, ঠিক যেমন প্রতি যুগ্মধ্বনি দ্বিমাত্রিক হ'লে তবেই সে হবে তার মাত্রাবৃত্ত প্রতিরূপ। যাগ্মাত্রিক মাত্রাবৃত্তের চল বহুদিন আগেই হয়েছে, 'ছবি ও গান'-এ ১২৯০ সালে রবীন্দ্রনাথ লেখেন 'রাহুর প্রেম' কবিতায় :

কভু সম্মুখে | কভু পশ্চাতে | আমার আঁধার | কায়া |

এখানে সম্ ও পশ্ দ্বিমাত্রিক—মার্, ধার্-ও তাই। এককথায় মাত্রাবৃত্তে যুগ্মধ্বনি বিকল্পে একমাত্রিক হয় না—সর্বত্রই দ্বিমাত্রিক থাকে।

স্বরবৃত্তে কালে-ভদ্রে যুগ্মধ্বনি একমাত্রিক হ'লেও সাড়ে পনের আনা ক্ষেত্রে সে একমাত্রিকই হ'য়ে থাকে। কারণ এ ছন্দে যুগ্মধ্বনিকে বেশি দ্বিমাত্রিক মর্যাদা দিলে তার প্রকৃতিই বদলে যায়, মনে সে আর স্বরবৃত্ত থাকে না, মাত্রাবৃত্ত হ'য়ে পড়ে। কিন্তু যাগ্মাত্রিক অক্ষরবৃত্ত-উদ্ভূত যাগ্মাত্রিক মাত্রাবৃত্ত প্রায় আশি বছর আগে চালু হ'লেও প্রতিপর্বে ছয়টি ক'রে একমাত্রিক স্বর দিয়ে ষট্‌স্বরপর্বিক যাগ্মাত্রিক স্বরবৃত্ত দ্বিজেন্দ্রলালের আগে কেউই বাঁধেন নি। তিনিই সর্বপ্রথম অক্ষরবৃত্ত বা মাত্রাবৃত্তের এই যাগ্মাত্রিক পর্বভাগ বজায় রেখে প্রতি স্বরকে (syllable) সর্বত্রই একমাত্রিক ধ'রে এই ছন্দটি সৃষ্টি করেন ও আলেখ্যে এই চালে তিনটি কবিতা লেখেন : নর্তকী, ভক্ত ও রাজা। এখানে 'ভক্ত' কবিতাটি থেকে একটি শ্লোকের দৃষ্টান্ত দিলেই যথেষ্ট হবে :

তু–মি–ক–রো–নাই–কো | বক্–তৃ–তা, কি–স–ভায় |
প–ড়ো–নাই–কো–কো–নো | প্র—বন্–ধ—

এখানে নাই, বক্, ভায়, বন্ অর্থাৎ প্রতি যুগ্মধ্বনিই একমাত্রিক।

কিংবা তাঁর 'রাজা' কবিতায় :

উ–ঠে–দাঁ–ড়া–দে–খি | মা–ন্থ–ষ্–য–দি–তো–রা |
এ–দের্–সাম্–নে–কে–ন | মা–থা–মু–য়ে–যা–বি ?

এখানে ন্থষ্, সাম্ একমাত্রিক।

এ-কবিতাগুলিকে ষট্‌স্বরপর্বিক ওরফে ষাণ্মাত্রিক স্বরবৃত্ত বলতেই হবে যদি এর মাত্রাবৃত্ত প্রতিরূপকে আমরা ষাণ্মাত্রিক মাত্রাবৃত্ত ব'লে গণ্য করি (ইংরাজিতে বলে না : **What is sauce for the gander is sauce for the goose ?**) যথা :

তুমি করো নি কো | বক্তৃতা কভু | পড়ো নি সভায় | প্রবন্ধ

এটি অক্ষরবৃত্ত নয়—মাত্রাবৃত্ত।

আচ্ছা, এবার এর অক্ষরবৃত্ত প্রতিরূপেরও ষাণ্মাত্রিকতা চাখা যাক্ না :

তুমি করো নাই | বক্তৃতা সভায় | লেখ নাই কোনো | প্রবন্ধ

সুতরাং বলতেই হবে :

তুমি করো নাই কো | বক্তৃতা কি সভায় |
লেখ – নাই—কো – কোনো—প্রবন্ধ

এটি নিখুঁৎ ষট্‌স্বরপর্বিক স্বরবৃত্তই বটে কারণ মাত্রাবৃত্ত বা অক্ষরবৃত্তের রীতিতে একে পড়া যায় না।

দুঃখের বিষয়, এই বলিষ্ঠ তথা মনোজ্ঞ ছন্দে তাঁর পরে আর কোনো কবিই কবিতা লেখেন নি—স্বরবৃত্তে। কেবল আমার অনুরোধে নিশিকান্ত একটি সুন্দর কবিতা লেখেন যেটি আমার 'ছান্দসিকী'তে ১৭২ পৃষ্ঠায় ছাপা হয়েছে :

মা – তো – মা—রি – কা – ছে | আ – মার্ – আ – কুল – হৃদয় |
ক – রে – যে – প্রার্ – থ – না | অ – নু – ক্ষ – ণ

আমি এ-ছন্দে একটি কবিতার নমুনা দিয়েছি ছান্দসিকী-তে ১৭০ পৃষ্ঠায় :

তৃষ্ – ণার্ – এ – পা – রা – বার | হে – রু – পা – ময় – তো – মার্ |
ক – রু – ণায় – অ – চি – রে | ত – রি – ব
জা – নি – হে – অ – চিন্ – ত্য | তো – মার্ – ঐ – অ – নিন্ – দ্য |
নী – লা – কাশ্ – জী – ব – নে | ব – রি – ব ইত্যাদি

অবশ্য নতুন ছন্দ সৃষ্টি না করলে যে বড় কবি হওয়া যায় না এমন কথা কেউ বলবে না। কিন্তু এ কথা বোধহয় অকুতোভয়েই বলা চলে যে বাণীর কোনো বিশেষ বর—অর্থাৎ প্রত্যক্ষ প্রেরণা—না পেলে কোনো কবিই নতুন নতুন সুললিত ছন্দ বা ছন্দোবন্ধের প্রবর্তন করতে পারেন না। তাছাড়া কবিও মানুষ, এবং মানুষ মাত্রেই—পারুক বা না পারুক—নব নব আবিষ্কারের স্বপ্ন দেখে (কলম্বসের মতন সবাই হয়ত নব মহাদেশের দুরাভিসারী হ'তে পারে না, কিন্তু মনে মনে কলম্বস নয় কোন্ কাপুরুষ ?) সুতরাং নব ছন্দ আবিষ্কারের অভীপ্সাকে যদি কাব্যজগতে একটি বরণীয় অভীপ্সা বলি তাহ'লে সেটা অত্যুক্তি হ'তে পারে না। হাতে যা পেয়েছি তাকে খাটিয়ে বাড়ানো তাতেও প্রতিভা চাই বৈ কি। কিন্তু নতুন নতুন খনি খুঁড়ে নব রত্ন আহরণ করবার উদ্যমে সিদ্ধিলাভ করতে হ'লেও প্রতিভা চাই। সুইনবর্ন টেনিসন প্রমুখ নানা কবির প্রতিভা চলতি accentual ছন্দ ছেড়ে গ্রীক লাটিন quantitative metre নিয়ে নানা পরীক্ষা ক'রে কয়েকটি নবছন্দে কৃতিত্ব দেখিয়ে ইংরাজি ভাষার কাব্যসম্পদ বাড়িয়েছেন এ কথা সবাই মানবেন। এই সত্যটির চমৎকার দিশা দিতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ আষাঢ়ে-র উচ্ছ্বসিত প্রশস্তিতে ঠিকই বলেছেন: "প্রতিভার প্রথম উদ্দাম চেষ্টা আরম্ভেই একটা নূতন পথের দিকে ধাবিত হয়, তাহার পর পরিণতি-সহকারে পুরাতন বন্ধনের মধ্যে ধরা দিয়া আপন মর্মগত নূতনত্বকে বহিঃস্থিত পুরাতনের উপর দ্বিগুণতর উজ্জ্বল আকারে পরিস্ফুট করিয়া তুলে। 'আষাঢ়ে'-র গ্রন্থকর্তাও যে কতকগুলি কবিতা লিখিয়াছেন সকলের মধ্যেই তাঁহার প্রতিভার স্বকীয়ত্ব প্রকাশ পাইতেছে, কিন্তু যে-কবিতাগুলি তিনি পুরাতন ছাঁচের মধ্যে ঢালিয়াছেন, তাহাদের মধ্যে নূতনত্বের উজ্জ্বলতা ও পুরাতনের স্থায়িত্ব উভয়ই একত্র সম্মিলিত হইয়াছে।"

প্রতি বড় কবি হাতে-পাওয়া ছন্দের মূলধনকে নিজের প্রতিভার দীপ্ত রাজ্যে খাটিয়ে নব আনন্দের সুদ আদায় ক'রে কাব্যসম্পদের শ্রীবৃদ্ধি করেন ব'লেই তাঁর এত আদর রসিক সমাজে। শেক্সপীয়র ও মিলটন অমিত্রাক্ষর ছন্দের পুরাতন ছাঁচের মধ্যে অভিনব দীপ্তির আমদানি করেছিলেন, এ জন্যে কোন্ কাব্য বা ছন্দরসিক না তাঁদের বরণ করেন নবপথের পথিকৃৎ ব'লে ?

রবীন্দ্রনাথের আগেও স্বরবৃত্ত ছন্দ ছিল, কিন্তু অজস্র গানে ও কবিতায় তিনি এ-ছন্দকে যে-ভাবে সমৃদ্ধ ক'রে তুলেছেন তাঁর ষষ্টিবৎসরব্যাপী প্রাত্যহিক সাহিত্যসাধনায় তার জন্যে তাঁকে শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতার বরণমালা না দেবে কে? তেমনি নানা চলতি ছন্দের প্রাচীন ধমনীতে নবীন ওজস্-এর নবরক্ত সঞ্চারিত করবার প্রতিভাকে দ্বিজেন্দ্রলালের ছন্দপ্রতিভার একটি অন্যতম নিদর্শন ব'লে গণ্য করতেই হবে। উদাহরণতঃ 'নববধূ' কবিতাটিতে পঞ্চমাত্রিক ছন্দে তিনি সব প্রথম প্রবহমানতার প্রবর্তন করেন। 'মন্দ্র'-এর আরো নানা কবিতায়ই তিনি প্রবহমানতা এনেছেন যথা হিমালয়, বাইরণ, স্বপ্নভঙ্গ ইত্যাদি। উদ্ধৃতি দিয়ে এ আলোচনার বহর বাড়াবার দরকার দেখি না, কারণ যিনিই খোলামন নিয়ে দ্বিজেন্দ্রলালের নানা ছন্দের পর্যালোচনা করবেন তাঁরই অন্তঃশ্রুতিতে ধরা পড়বেই অকুতোভয় ছন্দবিহারে তাঁর বলিষ্ঠ পদক্ষেপ—নানা বন্ধুরতার উপর দিয়ে যেতেও যার তাল কাটে নি। শ্রীপ্রমথনাথ বিশী লিখেছেন: "আসল কথা এই যে 'মন্দ্র' কাব্য পাঠে বুঝিতে পারা যায় যে, কবি আর জীবনাম্বুধির উপরিতলে থাকিয়াই সন্তুষ্ট নন, তলাইয়া দেখিবার একটা ঝোঁক তাঁহাকে পাইয়া বসিয়াছে। ইহাই ম্যাথু আর্নল্ড-বর্ণিত 'হাই-সীরিয়সনেস্।"*

ঠিক কথা। কেবল ঐ সঙ্গে আমরা আরো একটু জুড়ে দিতে চাই: যে, দ্বিজেন্দ্রলাল ছন্দসিন্ধুর ডুবুরি হ'য়েও নব নব রত্ন আহরণ করতে চেয়েছিলেন এবং কয়েকটি স্থলে আপ্তকামও হয়েছিলেন, যথা, তাঁর ত্রিস্বরপর্বিক বা ষট্‌স্বর-পর্বিক স্বরবৃত্ত—যেমন সত্যেন্দ্রনাথ আবিষ্কার করেছিলেন স্বরমাত্রিক বর্গীয় নানা নব ছন্দ ইংরাজি ও সংস্কৃত ছন্দের পথ বেয়ে।

কিন্তু শুধু নব নব ছন্দই নয়—নব ছন্দোবন্ধেও কবির প্রতিভা নিজেকে জানান দিতে চায়। রবীন্দ্রনাথের বিপুল কাব্যসাহিত্যের নানা নব ছন্দোবন্ধের দৃষ্টান্ত দিতে যাওয়া বাহুল্য, তার প্রয়োজনও নেই, কারণ—প্রবোধচন্দ্র এ নিয়ে বিশদ আলোচনা ক'রে আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন। তাই আমি এখানে শুধু দ্বিজেন্দ্রলালের নব ছন্দোবন্ধের কথাই বলব।

অনেকদিন আগে একদিন জোড়াসাঁকোর সুরসিক দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের

* শ্রীরথীন্দ্রনাথ রায় প্রণীত 'দ্বিজেন্দ্রলাল: কবি ও নাট্যকার' (১৩০ পৃষ্ঠা)।

সঙ্গে পিতৃদেবের কাব্য সুর ও ছন্দপ্রতিভা সম্বন্ধে আলোচনা হয়। সে-আলোচনার অনুলিপি যে আমি লিখে রাখি নি আজও এজন্যে পরিতাপ হয়। তবে ভাগ্যবশে দিনেন্দ্রনাথের একটি উক্তি—বিশেষ ক'রে একটি উদাহরণ—আমার স্পষ্ট মনে আছে। তিনি আমাকে বলেন: "তুমি জানো না দিলীপ, একসময়ে আমি দ্বিজুবাবুর নানা হাসির গান গেয়ে কত আসর জমিয়েছি। আজো মনে পড়ে তাঁর বর্ষা গানটি।" ব'লেই দিনুদার যে কী প্রাণখোলা হাসি! "উঃ কী কাণ্ড দিলীপ! একেবারে ছাঁকা মিয়া মল্লার" —ব'লেই দিনুদা গুন্ গুন্ ক'রে গাইলেন হাতে তেওরার তাল দিয়ে। পরে বললেন: "লক্ষ্য করেছ কি এ গানটির ছন্দের বাঁধুনি! তিনি সপ্তমাত্রিকের সঙ্গে কী ভাবে চতুর্মাত্রিক চাল মিশিয়েছেন?" ব'লেই দেখালেন কোথায় কোথায় সপ্তমাত্রিক তেওরা, কোথায় কোথায় চতুর্মাত্রিক কার্ফা:

বৃষ্টি পড়িতেছে | টুপ টাপ |
বাতাসে পাতা ঝরে | ঝুপ ঝাপ |
প্রবল ঝড় বহে | আম কাঁটাল সব
পড়িছে চারিদিকে | ধুপ ধাপ

বজ্র কড় কড় | হাঁকে
গিন্নী শুয়ে বৌ | মাকে
"কাপড় তোল, বড়ি | তোল্" ঘন হাঁকে
অম্‌নি ছাদের উপর | দুপ দাপ!

আকাশ ঘেরিয়াছে | মেঘে
জোলো হাওয়া বহে | বেগে
ছেলেরা বেরতে না | পেয়ে রেগে
ঘরের ভিতরে করে | হুপ হাপ

ছুটিল "একি হ'ল" | ভাবি'
ঊর্ধ্ব লাঙ্গুল | গাভী,
এ সময়ে | মুড়ি দিয়ে | রেকাবি রেকাবি
ফুলুরি খেতে হয় | কুপ কাপ |

বৃষ্টি নামিল | তোড়ে ;
রাঙা কর্দমে | পোরে ;
ছত্র মস্তকে | রাস্তার মোড়ে
পিছলে পড়ে সব | চুপ চাপ

ভিজেছে নিঃঝুম | শাখী,
শালিক ফিঙে টিয়া | পাখী,
আমি কী করি ভেবে ! না পেয়ে এ | কাকী—
ঘরেতে ব'সে আছি | চুপ চাপ।

"বর্ষার বিরহিণী রূপ, উদাস রূপ, মেদুর রূপ কত কবিই না দেখিয়েছেন আবহমানকাল"—বলেছিলেন দিনেন্দ্রনাথ—"কিন্তু এই গানের দ্বিবিধ ছন্দে অভিনব মিলে ও ছন্দের নয়া চালে তার নানা হাস্যকর গুরুচণ্ডালী রূপ কেউ দেখিয়েছে ব'লে জানি না দিলীপ ! তাঁর অনেক গুণই ছিল, কিন্তু আমি তাঁর ভক্ত হয়েছিলাম প্রধানতঃ এই জন্যে যে, তিনি ছিলেন একজন প্রথম শ্রেণীর রসিক—কাব্যে ছন্দে মিলে।" দিনেন্দ্রনাথ এ-গানটির মধ্যে এমন একটি অপূর্বতার ইঙ্গিত করেছিলেন যে আমি চমকে উঠি। তাই তাঁর কথাগুলি ভুলতে পারি নি—বিশেষ ক'রে তাঁর এই উক্তিটি যে এ-গানটির মূল কৃতিত্ব তিনটি : প্রথম—ছবি আঁকায়, দ্বিতীয়—চমকপ্রদ মিলের প্রাচুর্যে, তৃতীয়—সাত ও চারের কদম মিশিয়ে এক নব ছন্দোবন্ধ গ'ড়ে তোলা—গানে যা চমৎকার শোনায়। কিন্তু হারানো খেই ধরি, বলি তাঁর ছন্দে নবসৃষ্টির কথা।

আমার 'স্মৃতিচারণ'-এ আমি দুঃখ করেছি দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁর অসামান্য প্রতিভার প্রতি সুবিচার করেন নি—শেষ জীবনে কবিতা লেখা প্রায় ছেড়ে দিয়ে। হয়েছিল কি, নাট্যরচনায় তিনি অত্যধিক উদ্দীপ্ত হয়েছিলেন ও আপিসে হাড়ভাঙা খেটে রক্তের চাপে কষ্ট পাওয়ার দরুনই নাটক লেখবার পরে আর প্রেরণা পেতেন না কবিতা লিখবার। কিন্তু তবু ১৩১৪ সালে তিনি তাঁর উনশেষ কাব্যগ্রন্থ 'আলেখ্যে' শুধু যে অনেকগুলি মনোজ্ঞ কাব্যচিত্র এঁকে বাংলা কাব্যকে সমৃদ্ধতর ক'রে রেখে গেছেন তাই নয়, বাংলা চলতি স্বরবৃত্ত ছন্দের এক নবরূপ দিয়েছেন যার আশ্চর্য শক্তি ও

সম্ভাবনা সম্বন্ধে এক প্রবোধচন্দ্র সেন ছাড়া আর কেউ কাব্য ও ছন্দরসিকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন নি। এ বিষয়ে শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেন মহাশয়ের সুচিন্তিত ও চিন্তোদ্দীপক সমালোচনা থেকে একটু উদ্ধৃত করি। ১৩৪০ সালে উদয়নে তিনি দ্বিজেন্দ্রলালের স্বরবৃত্ত ছন্দ সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধে লেখেন :

"দ্বিজেন্দ্রলালের 'আলেখ্য' এবং অন্যান্য কাব্যেরও ছন্দ বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে, তিনি অনেক স্থলেই আমরা যাকে স্বরবৃত্ত বলি ঠিক সেই ছন্দই রচনা করতে চান নি। তিনি চেয়েছিলেন প্রচলিত অক্ষরবৃত্ত ছন্দকেই একটি Syllabic রূপ দিতে। আমার মনে হয়, এই তথ্যটি ভালো ক'রে উপলব্ধি না করলে তাঁর 'আলেখ্য' গ্রন্থের ছন্দের আসল রূপটিই ধরা পড়বে না। যাহোক, এই জন্যেই দেখতে পাই তাঁর এই Syllabic ছন্দে আমাদের পরিচিত স্বরবৃত্ত ছন্দের যতি-স্থাপন ও পর্ব-সমাবেশ-বিধি রক্ষিত হয় নি। এমন কি, তাঁর এই Syllabic ছন্দে স্বরবৃত্ত ছন্দের সুপরিচিত তাল এবং সুরটিও ধরা পড়ে না। তার হেতু এই যে, তিনি লোক-সাহিত্যের অর্থাৎ গ্রাম্য ছড়া প্রভৃতির স্বরবৃত্ত তালটিকেই অভিজাত-সাহিত্যে স্থান দিতে চান নি। তিনি কাব্যসাহিত্যে প্রচলিত অক্ষরবৃত্ত ছন্দেরই Syllabic রূপ দিতে চেয়েছিলেন। সেই জন্যেই তাঁর এই অভিনব Syllabic ছন্দে অক্ষরবৃত্ত ছন্দেরই যতি-স্থাপন ও পর্ব-সমাবেশ-বিধি দেখা যায় এবং এই Syllabic ছন্দেও অক্ষরবৃত্ত ছন্দেরই সুর তাল ও ধ্বনি-গাম্ভীর্য ফুটে উঠেছে।...তাঁর এই অভিনব ছন্দে স্বরবৃত্ত অক্ষরবৃত্ত ছন্দের ধ্বনি-বৈশিষ্ট্যের সমাবেশ ঘটেছে! তাই তাতে অক্ষরবৃত্ত ছন্দের শ্লথ-বিন্যস্ত অলস শৈথিল্য নেই...অথচ তাতে স্বরবৃত্ত ছন্দের নৃত্য-পরায়ণতাও নেই; কারণ তাতে স্বরবৃত্ত ছন্দের ঘন ঘন যতি-স্থাপনের প্রথাকে বর্জন ক'রে বহুস্থলেই যুক্তপর্বের ব্যবহার করা হয়েছে। এভাবে দ্বিজেন্দ্রলালের এই অভিনব Syllabic ছন্দে স্বরবৃত্তের চটুলতা ও অক্ষরবৃত্তের অলস একটানা সুর বর্জিত হ'য়ে একটি অভিনব পৌরুষ-শক্তি জেগে উঠেছে, যার সন্ধান আমরা পাই ইংরেজি iambic ছন্দের কবিতায়। আর, দ্বিজেন্দ্রলালের এই Syllabic ছন্দেই প্রবহমানতা অর্থাৎ enjambment আনা সম্ভবপর ইংরেজির মতো। আমাদের পরিচিত স্বরবৃত্তে enjambment আনা সম্ভবপর ব'লে মনে হয় না।"

আমি আমার 'ছান্দসিকী'-তে এ সম্বন্ধে যা যা লিখেছি তার সবটুকু পুনরুক্ত করার প্রয়োজন নেই, শুধু তার চুম্বকটুকু এখানে পেশ করি।

দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁর 'আলেখ্য' গ্রন্থের স্বরাক্ষরিক ছন্দে স্বরবৃত্তের মৌখিক হসন্তমধ্য ক্রিয়াপদ এনেও অক্ষরবৃত্তের গভীর ছন্দস্পন্দের (rhythm) সম্ভ্রমহানি করেন নি। দু একটা উদাহরণ দেই। তাঁর 'বিধবা' কবিতায় (আলেখ্য—দশম চিত্র):

পরে একদিন | মনে পড়ে | শুভ কোলা | হল স্বরে
শুভ বাদ্যে | শুভ শঙ্খ | রবে
দীপোজ্জ্বল | গৃহাঙ্গনে | শুভ লগ্নে | শুভক্ষণে
সুসজ্জিত | শুভ মহোৎ | সবে
আপন জনে | ক'রে পর | গেলে তুমি | পরের ঘর
করতে পেলে | পরের জন্যে | আপন
বুঝলে পতি | কারে বলে, | বাসলে ভালো | ধরাতলে
করলে দুটি | মধুর বর্ষ | যাপন।

এখানে লক্ষণীয়—প্রথম পংক্তিতে শুধু প্রথম পর্বটি স্বরবৃত্ত—দ্বিতীয় তৃতীয় অযুগ্মধ্বনি সম্বল ব'লে বিকল্পে অক্ষরবৃত্ত; চতুর্থ—নিছক অক্ষরবৃত্ত। দ্বিতীয় পংক্তিতে স্বরবৃত্তও বলা চলে অক্ষরবৃত্তও বলা চলে, কেননা এখানে শব্দান্তর্বর্তী যুগ্মধ্বনি অনুপস্থিত, শব্দমধ্যবর্তী যুগ্মধ্বনি তো এ দুই ছন্দেই একমাত্রিক। তৃতীয় পংক্তিতে দীপোজ্জ্বল-কে চার মাত্রা ধরা হয়েছে, অক্ষরবৃত্তের গম্ভীর ভঙ্গিতে দী ও পো এক এক মাত্রা ও জ্জ্বল্ দু-মাত্রা ধ'রে। তার পরের চারটি পর্ব পর পর স্বরবৃত্তে পড়া গেলেও বিকল্পে অক্ষরবৃত্তেও পড়া যায় শুধু শুভ মহোৎ এই পর্বটিকে স্বরবৃত্ত বলা যায়। পঞ্চম পংক্তিতে "আপন জনে"—বিশুদ্ধ স্বরবৃত্ত, কিন্তু তারপরেই "ক'রে পর"—অক্ষরবৃত্ত, "গেলে তুমি" উভধর্মী—কিন্তু তার পরে "পরের ঘর"—অক্ষরবৃত্ত পর্ব। এর পরের—শেষ তিনটি লাইনকেই কেবল বিশুদ্ধ স্বরবৃত্তের পর্যায়ে ফেলা যায়।

এখানে মাত্র আর একটি দৃষ্টান্ত দিয়েই থামব। আলেখ্য-এ 'ঘুমন্ত শিশু' কবিতাটিতে দ্বিজেন্দ্রলাল প্রথমেই লিখেছেন:

হেমন্তে নিস্তব্ধ স্নিগ্ধ শান্ত দুপুর বেলা

এটি স্বরবৃত্ত ছন্দে পড়া যায় কিন্তু শুধু "দুপুরবেলা"-র স্থলে দ্বিপ্রহরে লিখলে একে সকলেই একবাক্যে বিশুদ্ধ অক্ষরবৃত্ত পয়ারের চতুর্দশমাত্রিক পংক্তি ব'লে সনাক্ত করত।

দ্বিজেন্দ্রলাল এইভাবে তাঁর আলেখ্য-গ্রন্থের প্রায় সব কবিতায়ই অক্ষর-পন্তের কল্লোল এনেছেন স্বরবৃত্তের সঙ্গে অক্ষরবৃত্ত পর্ব মিশিয়ে খানিকটা ইংরাজি কাব্যের modulation-এর ঢঙে—যেখানে (সবাই জানেন) anapaest-পর্বের সঙ্গে iambic কাঁধ মেলাতে পারে, যথা Swinburne-এর:

Before | the begin | ing of years
There came | to the mak | ing of man

এখানে প্রতি চরণের প্রথম পর্বে iambic এসে বসেছে anapaest-এর স্কন্ধে। কিম্বা dactyl ছন্দে trochee-র পর্ব, যথা শ্রীঅরবিন্দের

Winged with | dangerous | deity
Ran in- | satiate | conquering

এখানে প্রতি চরণের প্রথম পর্ব trochee, পরের দুটি dactyl. কিম্বা A.E.-র বিখ্যাত *Carrowmere* কবিতার একটি trochee :

There are | glim-mer-ing | feet of | sunshine |
that are | dancing | by him | there

এখানে দ্বিতীয় পর্বটি dactyl. তেম্‌নি dactyl-এ spondee-র পর্ব প্রায়ই থাকে—উদাহরণ অনাবশ্যক।

দ্বিজেন্দ্রলাল যৌবনে তাঁর *Lyrics of Ind*-এ নিখুঁৎ ইংরাজি ছন্দে অনেকগুলি কবিতা লিখেছিলেন ও ইংরাজি কাব্যছন্দের অন্ধিসন্ধি জানতেন ব'লেই হয়ত এ-ধরনের modulation-এ তিনি এত সহজে রসসৃষ্টি করতে পেরেছিলেন। কিন্তু তাঁর ছন্দপ্রতিভার বিকশিত রূপই আমাদের আলোচ্য—বিকাশের ইতিহাস নয়—তাই ছন্দে তাঁর কীর্তির কথাই বলি।

আলেখ্য বা ত্রিবেণীর নানা স্বরাক্ষরিক ছন্দ একটু কান পেতে শুনলেই

আর সংশয়ের অবকাশ থাকে না যে, তাঁর এ-ছন্দটি স্বরবৃত্ত ও অক্ষরবৃত্তের সমাহার। এবং বিশেষ ক'রে তাঁর এই কীর্তিটি লক্ষণীয় যে তাঁর এ-ছন্দে হসন্তমধ্য ক্রিয়াপদে মৌখিক অন্তরঙ্গতার রস মিললেও সব জড়িয়ে যে-রসটি পাই সেটি প্রধানত অক্ষরবৃত্তেরই বটে।

এ-সত্যটির প্রকৃষ্ট প্রমাণ মেলে সত্যযুগ নামে কবিতাটিতে। এটির কয়েক পংক্তি উদ্ধৃত করি :

আমি দেখছি যেন দূরে, দূরত্বে অস্পষ্ট একটা আলোকিত স্থান ;—
যেখানে সৌন্দর্য উৎস উঠছে, ও ঝঙ্কৃত হচ্ছে অবিশ্রান্ত গান।
গড়ছি মনে মনে একটি উজ্জ্বল সুন্দর ভবিষ্যতে ব'সে আমরা কবি ;
(যেমন মাতা মনে মনে গর্ভস্থ সন্তানের একটি গড়ে মুখচ্ছবি—)
সেখানে এই পৃথিবীর এ দুঃখজ্বালা বিষাদ বিরাগ রবে না এ ভাবে ;
যেখানে এই বর্তমানের অভাব, ত্রুটি, অপূর্ণতা, পূর্ণ হয়ে যাবে ;
বন্ধুর হবে মসৃণ ; ও ঢেকে যাবে গিরিগুহা আলোকিত হ্রদে ;
কর্কশ যাহা—হবে মধুর ; শূন্য হবে পরিপূর্ণ সৌন্দর্য-সম্পদে ;
যেখানে অদৃশ্য হবে দৃশ্যমান ; অশ্রুত যাহা—হবে পরিশ্রুত ;
যেখানে অব্যক্ত হবে ব্যক্ত ; ও অননুভূত হবে অনুভূত ;
চিন্তা হবে বর্ণময়ী ; বৃত্তি হবে মূর্তিময়ী, লীলাময়ী এত ;
অবোধ্য যা বোধ্য হবে ; জটিল যাহা সহজ হবে ; দুঃখ হবে দূর ;
পরার্থেই ইচ্ছা হবে ; ইচ্ছা হবে ফলবতী ; কার্য সুমধুর ;
আলোকে সঙ্গীতে পূর্ণ, আনন্দে উল্লাসে মুগ্ধ, বিজ্ঞানে মহৎ,
স্বার্থত্যাগে স্বর্গীয়, সে গগনে গগনে ব্যাপ্ত—মহাভবিষ্যৎ।

এই অপূর্ব উদাত্ত কবিতাটি পড়তে পড়তে কানে বেজে ওঠে মৃদঙ্গ-ঝংকারিত ধ্রুপদী কল্লোল—যে-কল্লোল স্বরবৃত্ত ছন্দে মন্দ্রিত হবার কথা দ্বিজেন্দ্রলালের আগে কেউ ভাবতেও পারে নি। তাই আমার মনে হয় যে এ কবিতাটির ছন্দমহিমার সম্বন্ধে প্রবোধচন্দ্রের এ-উচ্ছ্বসিত প্রশস্তিতে প্রতি নিরপেক্ষ কাব্যরসিকই সায় দেবেন যে :

"পড়বার ভঙ্গি একবার আয়ত্ত হয়ে গেলে পাঠক সহজেই অনুভব

করবেন—কী স্বাভাবিক এই ছন্দ এবং এর শক্তি ও গাম্ভীর্য কত! বোধকরি লৌকিক ছন্দের চরম শক্তি ও গাম্ভীর্য প্রকাশ পেয়েছে এই কবিতাটিতে আর কারো রচনায় লৌকিক ছন্দের শক্তি এর চেয়ে বেশী প্রকাশ পেয়েছে ব'লে জানি না।"*

দ্বিজেন্দ্রলালের কবিপ্রতিভা এ নিবন্ধের আলোচ্য নয়। তবু ছন্দ ও কাব্যের সম্বন্ধ এমনই অঙ্গাঙ্গী যে এ-প্রসঙ্গে তাঁর কাব্য সম্বন্ধেও দু-একটি কথা বলা অপ্রাসঙ্গিক হবে না—আরো এইজন্যে যে হাল আমলে কাব্যে ছন্দে সুরে ও গানে দ্বিজেন্দ্রলালের অপ্রতিবাদ্য দান সম্বন্ধে বাংলার কাব্যগীতসুররসিকরা যেন নতুন ক'রে সজাগ হয়ে উঠেছেন।

ইংরাজিতে প্রথম শ্রেণীর কবিকে প্রায়ই বলা হয় major poet (এর বাংলা অনুবাদ 'মুখ্য কবি' শ্রুতিকটু ব'লে আমরা বলব 'প্রধান কবি')। যে-কোনো দেশেই প্রধান কবি যে অতি বিরল একথা বলাই বাহুল্য। ইংলণ্ডে শেক্সপীয়র, মিলটন, ওয়ার্ডস্‌ওয়র্থ, শেলি, ব্লেক, কীটস, টেনিসন, য়েটস ও এ. ই. ছাড়া বাকি সবাই শুধু সুকবি—minor poets, যথা ব্রাউনিং, রসেটি, কোলরিজ, লংফেলো, ল্যাণ্ডর, মূর, ড্রাইডেন, পোপ, চেস্টারটন প্রভৃতি। বাংলাদেশের দুর্ভাগ্য যে আমাদের দুটি প্রধান কবি দ্বিজেন্দ্রলাল ও সত্যেন্দ্রনাথকে অকালে কাল আমাদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে যায়। দ্বিজেন্দ্রলালের ডাক আসে পঞ্চাশ না পেরুতেই, সত্যেন্দ্রনাথের বোধকরি চল্লিশেরও আগে। এঁরা যদি আর দশ বৎসরও বাঁচতেন তবে বাংলা কাব্য ছন্দে ভাবে গানে আরো কতই না সমৃদ্ধ হ'ত! কিন্তু সবচেয়ে দুঃখ হয় ভাবতে যে আমাদের আধুনিক সাহিত্যে—যেখানে প্রধান কবি মাত্র চারজন—সেখানে কিনা দু দুটি প্রধান কবিরই অকালমৃত্যু হ'ল! আমাদের বাংলা কাব্যের মঞ্জরণ প্রথমে বৈষ্ণব পদাবলীতে হ'লেও আধুনিক বাংলা কাব্য সংস্কৃতির উপবীতের বরে দ্বিজত্ব লাভ করেছে প্রথম মধুসূদনের হাতে একথা অকুণ্ঠে বলা চলে। বাংলা কাব্যের রেনেসাঁস-এর প্রথম পথিকৃৎ তিনিই যেমন গদ্যের ক্ষেত্রে—বঙ্কিমচন্দ্র। চিন্তাশীল ভাবুক ও কাব্যরসিক সকলে প্রায় একবাক্যেই তাঁকে বাংলার প্রধান কবিদের পাংক্তেয় করেছেন। তাঁর পরে

* উদয়ন, আশ্বিন ১৩৪০

(রবীন্দ্রনাথের যুগে) বোধহয় তিনজনের বেশি প্রধান কবি ব'লে গণ্য হবেন না কালের দরবারে: রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল ও সত্যেন্দ্রনাথ। এঁদের মধ্যে সত্যেন্দ্রনাথ কনিষ্ঠ হ'লেও ছন্দে তথা কাব্যে তিনি যে বাংলার বরিষ্ঠ কবিদের অন্যতম—এ কথা সবাই স্বীকার করবেন। আমাদের দুঃখ এই যে রবীন্দ্রনাথ ও মধুসূদনকে বাংলার কাব্যরসিকেরা প্রধান কবির মর্যাদা দিলেও দ্বিজেন্দ্রলাল ও সত্যেন্দ্রনাথ আজো সে-মর্যাদা পান নি। এর একটি কারণ নির্দেশ করেছেন শ্রীসজনীকান্ত দাস বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের প্রকাশিত দ্বিজেন্দ্র-কাব্য গ্রন্থাবলীর ভূমিকায়। তিনি লিখেছেন:

"বাংলাদেশে দ্বিজেন্দ্রলালের কাব্যপ্রতিভা যে যথাযথ সমাদর লাভ করে নাই তাহার প্রথম ও প্রধান কারণ রবীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রপ্রতিভার ভাস্বর দীপ্তিতে সকলের চক্ষু এমনই ধাঁধিয়া গিয়াছিল যে, আশেপাশের অপেক্ষাকৃত স্নিগ্ধদীপ্তি জ্যোতিষ্কেরা সাধারণের দৃষ্টি এড়াইয়া গিয়াছেন। দ্বিজেন্দ্রলাল এই দলের প্রধান ছিলেন।" লিখে শেষে তিনি লিখেছেন: "আমাদের বিশ্বাস, তাঁহার রচনা পঠিত হইলেই তিনি যথার্থ মর্যাদা লাভ করিবেন··· তাঁহার বিপুল সাহিত্যকীর্তির নিদর্শনগুলিই তাঁহাকে চিরজীবী করিয়া রাখিবে।"

সেই উদ্দেশ্যেই দ্বিজেন্দ্রলালের শ্রেষ্ঠ কাব্য ও গানের সঞ্চয়ন প্রকাশ করা হ'ল। আশা করি, সহৃদয় কাব্যরসিকেরা তাঁর কবিতা ও অপরূপ বহুবিচিত্র গান থেকে গভীর আনন্দ পাবেন। এ-সম্পর্কে শুধু রবীন্দ্রনাথের একটি কথা যেন মনে রাখি—যে কথা তিনি বারবারই বলতেন যে, সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ বিকাশ কাব্যে ও কাব্যের শ্রেষ্ঠ বিকাশ গানে। আমাদের মনে হয় একথা বাংলাদেশের মাটির সম্বন্ধে সবচেয়ে বেশি খাটে—যেখানে গানের ফসল চিরদিনই হ'য়ে এসেছে অফুরন্ত—বহুবিচিত্র ও ভাবগম্ভীর। এক কথায়, বাংলাদেশ গানের দেশ—আর আধুনিক যুগে আমাদের দেশের রসের জমিতে গানের আবাদ ক'রে সোনার ফসল ফলিয়েছেন যাঁরা তাঁদের মধ্যে একজন প্রধান স্রষ্টা দ্বিজেন্দ্রলাল। যদি তিনি আর কিছু না লিখে শুধু গানই বাঁধতেন তাহ'লেও তিনি বঙ্গবাণীর আনন্দনন্দনের একজন প্রধান মালাকর নামাঙ্কিত হ'য়ে পেতেন তাঁর স্নিগ্ধ হাসির পরম প্রসাদ।



দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

দ্বিজেন্দ্রলাল

পৃথ্বীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

মুনি-ঋষির পরশ-উজল এ-দেশ যখন ঘুমের ঘোরে
লুপ্ত-চেতন—রাত্রিশেষের ভয়ালতম সেই প্রহরে
মন্ত্র-গভীর কণ্ঠে তুমি আত্মভোলা গানে গানে
সুপ্তি ভেঙে দিলে জাতির।—জাগরণের সে-আহ্বানে
একে একে মেলল নয়ন দেশের মানুষ ঘরে ঘরে :
হাসলে তুমি ধেয়ান-তলে—হাসল তারা পুলকভরে!
যে-নদীয়ার পথে পথে প্রেমের ঠাকুর রসের প্রসাদ
দিয়েছিলেন, সে-পথ বেয়েই চলল, রসিক, তোমার অবাধ
রসের মিছিল : দেশের হাওয়া, দেশের মাটি উঠল হেসে,
হাসল মানুষ : তুমি তাদের টেনে নিলে প্রেমাশ্লেষে!
বিস্মরণের দারুণ শাপে আত্মহারা জাতির মনে
তুমিই আবার দিলে দিশা : পুরাণ, গীতা, রামায়ণে
যাদের অতীত জীবন-গাথা অমর আজো, যাদের ঘরে
যুগে যুগে নারায়ণের জন্ম হল, তার তরে
দাসত্ব আর পদলেহন? তাদের তরে গ্লানির বিধান?
অমঙ্গলের পঙ্ক থেকে তাদের কি হায় মিলবে না ত্রাণ?
হে উদাসী, তোমার বাঁশী স্বদেশ-প্রেমের দীপক-রাগে
বাজল : নাটক, কাব্যে, গানে—মন্ত্র জেলে চললে আগে
যুগান্তরের দুর্বিসহ দীপ্তি চেয়ে, চেয়ে আজাদ :
রেখে গেলে অনাগত যুগের তরে আনন্দ-স্বাদ!
তোমার চলা-পথের পানে তাকিয়ে থাকি সবিস্ময়ে
চিরন্তনের হে বীর চারণ, হাজার পতন অভ্যুদয়ে
তোমার দেওয়া অগণিত বিভব যেন স্মরণ ক'রে
আমরা জাগি নতুন থেকে নতুনতর যুগের ভোরে!

——

হাসির গান

হাসির গান

দ্বিজেন্দ্রলাল সর্বপ্রথম খ্যাতি লাভ করেন হাসির গান রচনা করে—১৯০০ সালে প্রথম তাঁর কয়েকটি হাসির গান গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। এ-সম্বন্ধে তিনি একবার লিখেছিলেন যে বিলাত থেকে ফিরে তিনি ইংরাজি গান গাইতেন কিন্তু সে গান বাঙালিদের ভালো লাগত না ব'লে তিনি ইংরাজি গান ছেড়ে দিয়ে বাংলা গান বাঁধা শুরু করেন। লিখছেন: "বিবাহান্তে অনেকগুলি প্রেমের গান রচনা করিয়া 'আর্যগাথা দ্বিতীয় ভাগ' নাম দিয়া ছাপাই এবং কতকগুলি হাসির গানও রচনা করি। এই হাসির গানগুলি অবিলম্বে অনেকের প্রিয় হয় এবং কার্যোপলক্ষে কোনো নগরে যাইলেই ঐ সকল গান আমায় স্বয়ং গাহিয়া শুনাইতে হইত। সেগুলি একত্রে গ্রন্থাকারে বহুদিন পরে প্রকাশিত হয়।"

এ-থেকে সিদ্ধান্ত করা চলে তিনি হাসির গান বাঁধা শুরু করেন ১৯০০ সালেরো অনেক আগে।

এ-গানগুলি সম্বন্ধে দ্বিতীয় বক্তব্য এই যে এ-গানগুলির সুরের মধ্যে তিনি একটি নতুন সুরভঙ্গি প্রবর্তিত করেন—যাদের মধ্যে ইংরাজি গানের প্রাণশক্তি খানিকটা নব উদ্দীপনার সঞ্চার করে। তাঁর শ্রেষ্ঠ হাসির গানগুলির স্বরলিপি আমি প্রকাশ করি ত্রিশ বৎসর আগে—"হাসির গানের স্বরলিপি" নাম দিয়ে।

তাঁর সাহিত্য রচনায় হাসির গান শুরু হয় আর্যগাথার পরেই—এর পরে আষাঢ়ে, প্রায়শ্চিত্ত, বিরহ, ত্র্যহস্পর্শ প্রমুখ কয়েকটি হাস্যকৌতুকমূলক কবিতা ও প্রহসন রচিত হয়। ইতি—

দি. কু. রা.

তানসান-বিক্রমাদিত্য-সংবাদ

হো—বিক্রমাদিত্য রাজার ছিল নব রত্ন ন' ভাই।
আর, তানসান মহা ওস্তাদ—এলেন তাঁহার সভায়।
অ—অর্থাৎ আসতেন নিশ্চয় তানসান বিক্রমাদিত্যের 'কোর্টে'—
কিন্তু, দুঃখের বিষয় তখন তানসান জন্মান নি ক মোটে।
তা ধিন্‌তাকি ধিন্‌তাকি ধিন্‌তাকি ধিন্‌তাকি, মেও এঁও এঁও।

যা হোক, এলেন তানসান কলিকাতায় চোড়ে রেলের গাড়ি।
আর, 'হুগলি ব্রিজ' পার হোয়ে উঠলেন বিক্রমাদিত্যের বাড়ি।
অ—অর্থাৎ উঠতেন নিশ্চয়, কিন্তু 'রেল পুল' তখন হয় নি।
আর, বিক্রমাদিত্যের ছিল অন্য রাজধানী—উজ্জয়িনী।
তা ধিন্‌তাকি ধিন্‌তাকি ধিন্‌তাকি ধিন্‌তাকি, মেও এঁও এঁও।

যা হোক, এলেন তানসান রাজার কাছে দেখাতে ওস্তাদি।
আর, নিয়ে এলেন নানা বাদ্য—'পিয়ানো' ইত্যাদি।
অ—অর্থাৎ আনতেন নিশ্চয়, কিন্তু হ'ল হঠাৎ দৃষ্টি
যে, হয় নি ক তানসানের সময় 'পিয়ানো'রও সৃষ্টি।
তা ধিন্‌তাকি ধিন্‌তাকি ধিন্‌তাকি ধিন্‌তাকি, মেও এঁও এঁও।

যা হোক, তানসান গাইলেন এমন মল্লার, রাজা গেলেন ভিজে।
আর, গাইলেন এমন দীপক, তানসান জ্ব'লে উঠলেন নিজে।
অ—অর্থাৎ যেতেন রাজা ভিজে, তানসান উঠতেন জ্ব'লে।
কিন্তু, রাজার ছিল 'ওয়াটারপ্রুফ'—আর তানসান এলেন চ'লে।
তা ধিন্‌তাকি ধিন্‌তাকি ধিন্‌তাকি ধিন্‌তাকি, মেও এঁও এঁও।

হ'ল, সেই দিন থেকে প্রসিদ্ধ তানসানের গীতি বাদ্য।
আর, আজও রোজ রোজ অনেক ওস্তাদ করেন তাঁহার শ্রাদ্ধ।
অর্থাৎ তাঁর গানের—শ্রাদ্ধ তাঁর ত হ'য়ে গেছে কবে ?
আর, তানসান মুসলমান, তাঁর শ্রাদ্ধ কেমন ক'রে হবে ?
তা ধিন্‌তাকি ধিন্‌তাকি ধিন্‌তাকি ধিন্‌তাকি, মেও এঁও এঁও।

ইরাণ দেশের কাজী

আমরা ইরাণ দেশের কাজী।
আমরা এসেছি একটা নতুন আইন প্রচার করতে আজি।
যে, যা বলিবে সবই ইমামকুল, হউক মিথ্যা হউক ভুল,
তোমাদের হবে বলিতে তাতেই "বাহবা, বাহবা, বা জি !"
ইমাম সবাই সত্য-প্রিয়, পার্শী মিথ্যাবাদী ;
পার্শী ইমামে বিবাদ বাধিলে, পার্শীই অপরাধী।
পার্শী ঠেকিলে ইমাম গায়, মাথাটি বাঁচান হইবে দায়,
পার্শীর শির কাটিয়া লইলে, হইতে হইবে রাজি।
আমরা সবাই দেখেছি ইমাম বিচার করিয়া সূক্ষ্ম—
ইমাম সবাই বুদ্ধিমান, আর পার্শী সবাই মূর্খ।
পার্শীর তবে হইল রদ—ব্যতীত কুলি ও কেরানি পদ ;
হাকিম হকিম হইবে সবাই হোসেন হাসেন হাজি।
দাদাভাই হোক জিজিভাই হোক কারসেট্‌জি কি মেটা—
আজ থেকে তবে ঠিক হ'য়ে গেল—সবাই সমান বেটা।
তবে, যে বেটা বলিবে, "হাঁ হাঁ তা হোক," সে বেটা কতক ভদ্রলোক ;
আর, যে বেটা বলিবে "তা না না না না না", সে বেটা বেজায় পাজি।

সন্দেশ

উহু, সন্দেশ বুঁদে গজা মতিচুর রসকরা সরপুরিয়া ;
উহু, গড়েছ কি নিধি, দয়াময় বিধি ! কত না বুদ্ধি করিয়া ।
যদি দাও তাহা খালি—আঃ !
মদীয় বদনে ঢালিয়া ;
উহু, কোথায় লাগে বা কুর্মা কাবাব, কোথায় পোলাউ কালিয়া ;—
উহু, খাই তাহা হ'লে চক্ষু মুদিয়া, চিৎ হইয়া, না নড়িয়া ।

আহা, ক্ষীর হ'ত যদি ভারত-জলধি, ছানা হ'ত যদি হিমালয়,
আহা, পারিতাম পিছু করে নিতে কিছু সুবিধা হয়ত মহাশয় ;
অথবা দেখিয়া শুনিয়া
বেড়াতাম গুন-গুনিয়া,
আহা, ময়রা-দোকানে মাছি হ'য়ে যদি—কি মজারি হ'ত দুনিয়া ;
আহা, বেজায় বেদম বেমালুম তাহা খাইতাম হ'য়ে 'মরিয়া' ।

ওহো, না রাখিত বাঁধি সন্দেশ আদি, সংসারে এই সমুদয়,
ওহো, হ'য়ে মুনি ঋষি, ছুটে কোন্ দিশি, যেতাম হয়ত মহাশয় !
পেলাম না শুধু—হরি হে !
—খাইতে হৃদয় ভরিয়ে ;—
ওহো, না খেতেই যায় ভরিয়ে উদর, সন্দেশ থাকে পড়িয়ে ;
ওহো, মনের বাসনা মনে র'য়ে যায়, চখে বহে' যায় দরিয়া !

জিজিয়া কর

পাঁচশ' বছর এমনি ক'রে আসছি সয়ে সমুদায়:
এইটি কি আর সইবে না ক—দু ঘা বেশি জুতার ঘায়?
সেটা নিয়ে মিছে ভাবা—দিবি দু' ঘা, দে না বাবা!
দু'ঘা বেশি দু' ঘা কমে, এমনি কি আসে যায়?

তবে কিনা জুতোর গুঁতো হয়ে গেছে অনেকবার,
একটা কিছু নতুন রকম করলে হ'ত উপকার;
ধর না যেমন, বেটা ব'লে দিলি না হয় কানটা ম'লে;—
জুতার খোঁটা খেয়ে ঘাঁটা প'ড়ে গেছে সকল পায়।

প'ড়ে আছি চরণতলায় নাকটি গুঁজে অনেক কাল।
সৈবে সবই, নই ত মানুষ, আমরা সবাই ভেড়ার পাল।
যে যা করিস দেখিস চাচা, মোদের পৈতৃক প্রাণটা বাঁচা,
শাঁসটা খেয়ে আঁশটা ফেলে দিস রে দু'টো দুবেলায়।

তোরাই রাজা তোরাই মুনিব, মোরা চাকর মোরা পর,
মনে করিস চাচা এটা তোদের বাড়ি তোদের ঘর।
মোরা বেটা মোরা পাজি, যা বলিস তাই আছি রাজি—
রাজার নন্দিনী প্যারি, যা বলিস তাই শোভা পায়।

খুসরোজ

আজি, এই শুভদিনে শুভক্ষণে উড়ায়ে দিই জয়ধ্বজায়!
—উপাধি পেয়েছি যা, রাখতে তা ত হবে বজায়।
—আমাদের ভক্তি যা এ—এ যে গো মানের দায়ে,
এখন ত উচিত কার্য এদিক্ ওদিক্ বুঝে চলাই।
—সাধে কি বাবা বলি, গুঁতোর চোটে বাবা বলায়!

আজি, এই শুভ রাত্তি, জ্বালবো বাত্তি ঘরে ঘরে ভক্তিভাবে ;
নৈলে যে চাকরি যাবে, নৈলে যে চাকরি যাবে।
—আমাদের ভক্তি যা এ—এ যে গো পেটের দায়ে,
নিয়ে আয় চেরাগ বাত্তি, নিয়ে আয় দিয়েশলাই!
—সাধে কি বাবা বলি, গুঁতোর চোটে বাবা বলায়!

"জয় জয়, বৃটিশ সিংহ বৃটিশ সিংহ," ব'লে জোরে ডঙ্কা বাজাই!
পাহারা ফিরছে দ্বারে, সেটা যেন ভুলে না যাই!
—আমাদের ভক্তি যা এ—এ যে গো প্রাণের দায়ে,
কি জানি পিছন থেকে কখন ফাঁসি পড়ে গলায়!
—সাধে কি বাবা বলি, গুঁতোর চোটে বাবা বলায়!

আমরা সব "রাজভক্ত রাজভক্ত" ব'লে চেঁচাই উচ্চ রবে :
কারণ সেটার যতই অভাব, ততই সেটা বলতে হবে।
—আমাদের ভক্তি যা এ—মানের, পেটের, প্রাণের দায়ে,
দেখে সে রক্ত আঁখি, ভক্তি যা তা ছুটে পালায়!
—সাধে কি বাবা বলি, গুঁতোর চোটে বাবা বলায়!

ভোলানাথ শুয়ে আছেন—ঈশ্বর তাঁরে সুখে রাখুন !
কালী জিব মেলিয়ে আছেন—তা তিনি মেলিয়ে থাকুন ।
শ্রীকৃষ্ণ হয়ে বাঁকা থাকুন তিনি পটেই আঁকা ;
আমরা সব নিয়ে শরণ বৃটিশরাজের চরণতলায় ।
—সাধে কি বাবা বলি তোর চোটে বাবা বলায় !

আমি যদি পিঠে তোর ঐ

আমি যদি পিঠে তোর ঐ, লাথি একটা মারিই রাগে ;
—তোর ত আস্পর্ধা বড়, পিঠে যে তোর ব্যথা লাগে ?
আমার পায়ে লাগলো সেটা,—কিছু বুঝি নয়কো বেটা ?
নিজের জ্বালাই নিয়ে মরিস, নিজের কথাই ভাবিস আগে ।

লাথি যদি না খাবি তো জন্মেছিলি কিসের জন্যে ?
আমি যদি না মারি তো মেরে সেটা যাবে অন্যে !
আমার লাথি খেয়ে কাঁদা !—ন্যাকামি নয় ? শুয়োর গাধা !
—দেখছি যে তোর পিঠের চামড়া ভ'রে গেছে জুতোর দাগে !

আমার সেটা অনুগ্রহ—যদি লাথি মেরেই থাকি ;—
লাথি যদি না মারতাম ত'—না মারতেও পারতাম না কি ?
লাথি খেয়ে ওরে চাষা ! বরং রে তোর উচিত হাসা,—
যে তোর কথাও মাঝে মাঝে, তবু আমার মনে জাগে ।

বরং উচিত—আগে আমার পায়ে হাত তোর বুলিয়ে দেওয়া ;
পরে ধীরে ধীরে নিজের পিঠের দাগটা মুছে নেওয়া !
—পরে বলা ভক্তিভরে,—"প্রভু ! অনুগ্রহ করে,
পৃষ্ঠে ত মেরেছো—লাথি মারো দেখি পুরোভাগে !
—দেখি সেটা কেমন লাগে।"

নন্দলাল

নন্দলাল ত একদা একটা করিল ভীষণ পণ—
স্বদেশের তরে, যা ক'রেই হোক্, রাখিবেই সে জীবন।
সকলে বলিল 'আ-হা-হা কর কী, কর কী, নন্দলাল ?'
নন্দ বলিল 'বসিয়া বসিয়া রহিব কি চিরকাল ?
আমি না করিলে কে করিবে আর উদ্ধার এই দেশ ?'
তখন সকলে বলিল—বাহবা বাহবা বাহবা বেশ !

নন্দর ভাই কলেরায় মরে, দেখিবে তাহারে কেবা !
সকলে বলিল 'যাও না নন্দ, কর না ভায়ের সেবা !'
নন্দ বলিল : 'ভায়ের জন্য জীবনটা যদি দিই—
না হয় দিলাম—কিন্তু অভাগা দেশের হইবে কী ?
বাঁচাটা আমার অতি দরকার, ভেবে দেখি চারি দিক্' ;
তখন সকলে বলিল—হাঁ হাঁ হাঁ তা বটে, তা বটে, ঠিক !

নন্দ একদা হঠাৎ একটা কাগজ করিল বাহির,
গালি দিয়া সবে গদ্যে পদ্যে বিদ্যা করিল জাহির।
পড়িল ধন্য দেশের জন্য নন্দ খাটিয়া খুন,
লেখে যত তার দ্বিগুণ ঘুমায়, খায় তার দশ গুণ!
খাইতে ধরিল লুচি ও ছোকা ও সন্দেশ থাল থাল;
তখন সকলে বলিল—বাহবা বাহবা নন্দলাল!

নন্দ একদা কাগজেতে এক সাহেবকে দেয় গালি:
সাহেব আসিয়া গলাটি তাহার টিপিয়া ধরিল খালি।
নন্দ বলিল: 'আ-হা-হা! কর কি, কর কি, ছাড় না ছাই,
কি হবে দেশের, গলাটিপুনিতে আমি যদি মারা যাই?
বল ক'বিঘৎ নাকে খৎ, যা বল করিব তাহা'।
তখন সকলে বলিল—বাহবা বাহবা বাহবা বাহা!

নন্দ বাড়ির হ'ত না বাহির, কোথা কি ঘটে কী জানি!
চড়িত না গাড়ি, কি জানি কখন উল্‌টায় গাড়িখানি!
নৌকা ফি সন ডুবিছে ভীষণ, রেলে 'কলিশন' হয়!
হাঁটিতে সর্প, কুকুর আর গাড়ি-চাপা-পড়া ভয়;
তাই শুয়ে শুয়ে, কষ্টে বাঁচিয়ে রহিল নন্দলাল।
সকলে বলিল—ভ্যালা রে নন্দ, বেঁচে থাক্ চিরকাল!

হিন্দু

এবার হয়েছি হিন্দু, করুণাসিন্ধু গোবিন্দজীকে ভজি হে।
এখন করি দিবারাতি দুপুরে ডাকাতি
(শ্যাম) প্রেম-সুধারসে মজি হে।
আর মুরগী খাই না, কেন না পাই না!
(তবে) হয় যদি বিনা খরচেই,—
আহা! জান ত আমার স্বভাব উদার
(তাতে) গোপনে নাইক অরুচি।
এখন ঘোষের নিকট, বোসের নিকট
(হিন্দু) ধর্মশাস্ত্র শিখি গো।
আমি জীবনের সার করেছি আমার
(আহা) ফোঁটা, মালা আর টিকি গো।

আহা! কি মধুর টিকি, আর্য ঋষি কি
(এই) বানিয়ে ছিলেনই কল গো।
সে যে আপনার ঘাড়ে আপনিই বাড়ে
(অথচ)—চতুর্বর্গ ফল গো।
আহা এমন কত্র, এমন নত্র,
(আছে)—গোপনে পিছনে ঝুলিয়ে।
অথচ সে সব একদম করিছে হজম,
(এমনি) বিষম হজ্‌মি গুলি এ!

ল'য়ে ভিক্ষার ঝুলি, নির্ভয়ে তুলি
(ওগো) ধর্মের নামে চাঁদা গো।
দেয় হরিনাম শুনে টাকা হাতে গুণে
(আছে) এখনও বহুত গাধা গো!

তবে মিছে কেন গোল,　　　বল হরিবোল,
　　(আর) রবে না ক ভব-ভাবনা।
দেখ হরির কৃপায়　　　দশ জনে খায়,
　　(তবে) আমরাই কেন খাব না!

রাজযোটক

আহা, কি যে মানিয়েছে রে!
ওহো কি যে মানিয়েছে!

যেন　মেঘের পাশে ইন্দ্রধনু,
আর　কৃষ্ণের পাশে বলরাম (সেই বৃন্দাবনে)!
যেন　নাচের সঙ্গে তবলার চাঁটি
আর　টপ্পার স্বরে হরিনাম (বাহবা রে বাহবা)!

যেন　কপির সঙ্গে মটরশুঁটি
আর　ক্ষীরের সঙ্গে পাকা আম (বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসে)!
যেন　মুড়ির সঙ্গে পাঁপর ভাজা
আর　মদের সঙ্গে হরিনাম (বাহবা রে বাহবা)!

যেন　জ্বরের সঙ্গে বিসূচিকা,
আর　গোপীর সঙ্গে ব্রজধাম (ও সেই দ্বাপর যুগে)!
যেন　বিয়ের সঙ্গে রসনচৌকি
আর　মরণকালে হরিনাম (বাহবা রে বাহবা)!

চণ্ডীচরণ

চণ্ডীচরণ ছিলেন একটি ধর্মশাস্ত্র-গ্রন্থকার ;
এম্নি তিনি হিন্দুধর্মের করতেন মর্ম ব্যক্ত ;—
দিনের মত জিনিস হ'ত রাতের মত অন্ধকার,
জলের মত বিষয় হ'ত ইটের মত শক্ত।
সবাই বলেন : হাঃ হাঃ হাঃ লিখ্ছে বেশ! হাঃ হাঃ হাঃ!
যা হোক তোরা নিজের নিজের ঘটিবাটি সামলা!

বাহির করতেন ব'সে ব'সে আরও সূক্ষ্ম সূক্ষ্মতার।
চুল্‌টি চিরে দু ভাগেতে করতেন তিনি কর্তন।
বুঝ্‌ত না ক কেউ তা কিছু, এইটেই যে দুঃখ তাঁর—
অন্ততঃ হোত না কারও মতের পরিবর্তন।
সবাই বললে (ইত্যাদি)

তবু সে ব্যাখ্যায় এ দেশে প'ড়ে গেল টিড্‌টিকার!
লিখ্‌তেন তিনি অবারিত অতি চাঁছা গদ্যে।
বোঝাতেন যে হার্বার্ট স্পেন্সার, ওয়েবেস্টার কি বিড্‌ডিকার,—
আছে সবই গীতার একটি অধ্যায়েরই মধ্যে।
সবাই বললে (ইত্যাদি)

রইল না কারো সন্দেহ যে সংসারটা-এ ঝক্‌মারি,
যদিও কেউ ছাড়্‌ল না ক ব্যবসা কিম্বা নক্‌রি।
সাত্ত্বিক আহার শ্রেষ্ঠ বুঝে ধরল মাংস রকমারি—
'ফাউল বিফ্‌ ও মটন হ্যাম ইন্ অ্যাডিশন টু' বক্‌রি।
সবাই বললে (ইত্যাদি)

নিজের বিষয় পরকে দিয়ে হ'ল না কেউ ভেক্‌ধারী,
নিজের স্ত্রীকে সামনে কারো করে না কেউ বিশ্বাস।
দেখে শুনে চণ্ডীচরণ হয়ে শেষে দেক্‌দারী,
ফেল্লেন ভারি জোরে একটা ভারি দীর্ঘনিশ্বাস।
সবাই বললে (ইত্যাদি)

স্ত্রীর উমেদার

যদি জানতে চাও আমি ঠিক কি রকম স্ত্রী চাই—
ফর্শা কি কালো কি মাঝারি রং,
লম্বা কি বেঁটে কি ক্ষীণা, পীনা,
দেখতে ঠিক পরী কি দেখতে ঠিক সং;
শোনো—তাতে আমার আসে যায় না ক অধিক,
চলতে জানে যদি, বাঁচিয়ে ক'দিক,
তার ওপর ডাকে—আমায় সোহাগে:
"পোড়ার-মুখো, আপদ্, ও হতভাগা!"—
তা হ'লে হাঃ হাঃ—সে ত সোনায় সোহাগা!

কপাল এক রত্তি বা কপাল গড়ের মাঠ,
ভ্রূ পুষ্পধনু কি ভ্রূ যষ্টিবৎ,
নীলাব্জনেত্রা কি সে মার্জারাক্ষী—
তা খুব যায় আসে না, আমার এ মত।

যদি স্বামীরে কটু সে কয় না ক বেজায়,—
কথায় কথায় পিতৃগৃহে না সে যায়,
তার ওপর ডাকে—আমায় সোহাগে—
"পোড়ার-মুখো, আপদ্ ও হতভাগা !"—
তা হ'লে হাঃ হাঃ—সে ত সোনায় সোহাগা !

বিম্বাধরা হোক কি কাক্রীবদোষ্ঠা,
সুদীর্ঘকেশী কি মাথায় টাক,
সুপংক্তিদন্তা কি গজেন্দ্রদংষ্ট্রা,
বংশীবৎ নাসা কি চাইনীজি নাক ;
কেবল—যদি সে করে কম তর্ক ও ক্রন্দন,
তার উপর হয় যদি সুচারু রন্ধন,—
তার ওপর ডাকে—আমায় সোহাগে—
"পোড়ার-মুখো, আপদ্ ও হতভাগা !"—
তা হ'লে হাঃ হাঃ—সে ত সোনায় সোহাগা !

গজেন্দ্র-গামী কি ভেকপ্রলম্ফী,
গাহে সে মিঠে কি ডাকে সে কাক,
বিদ্যায় সে বাণী কি বিদ্যায় সে রম্ভা,
সর্বাঙ্গ থাক কিম্বা নাই বা সে থাক—
যদি রাখে না খোঁজ স্বামী খায় ভাং কি চরস,
ভাণ্ডার, পুত্রাদি রক্ষায় সরস,
তার ওপর ডাকে—আমায় সোহাগে—
"পোড়ার-মুখো, আপদ্ ও হতভাগা !"—
তা হ'লে হাঃ হাঃ—সে ত সোনায় সোহাগা !

বসন কম ছেঁড়ে ও বাসন কম ভাঙে,
গয়না সে কদাচিৎ দুই একখান চায়,
খরচপত্র একটু গুছিয়ে করে,
অল্পই ঘুমায় ও অল্পই খায়।
যদি—তার উপর হয় একটু চলনসই গড়ন,
আর যদি হয় একটু বোকাটে ধরন,
তার ওপর ডাকে—আমায় সোহাগে—
"পোড়ার-মুখো, আপদ্ ও হতভাগা!"—
তা হ'লে হাঃ হাঃ—সে ত সোনায় সোহাগা!

যেমনটি চাই তেমন হয় না

দেখ গাঁজাখুরি এই ব্রহ্মার সৃষ্টি, বিশৃঙ্খলা বিশ্বময়—না?
এই যখন চাই রৌদ্র ঠিক তখন হয় বৃষ্টি—আর
যখন চাই বৃষ্টি—তা হয় না।
আমি চাই অল্পমূল্যে হয় দামী পদার্থ,
চাই পাওনাদারগণ ভুলে স্বীয় স্বার্থ,
হেসে দিলেই হয় সব কৃতকৃতার্থ—
তা যেমনটি চাই তেমন হয় না।

আমি চাই স্ত্রী হয় রূপে গুণে অগ্রগণ্যা,
অথচ সাত চড় মারলেও কথা কয় না;
চাই বেশীর ভাগ পুত্র ও অল্পর ভাগ কন্যা—
তা যেমনটি চাই তেমন হয় না।

আমি চাই পুত্র-বিবাহে, আনে বয়স্থা-
কন্যাদায়গ্রস্ত টাকার বস্তা
আর নিজের মেয়ের বিয়ে হ'য়ে যায় সস্তা—
তা যেমনটি চাই তেমন হয় না।

আমি চাই চির যৌবন আমার কেমন যে বাতিক !
তা যৌবনটি বাঁধা ত রয় না।
চাই ধনে হই কুবের, আর রূপে হই কার্তিক—
তা যেমনটি চাই তেমন হয় না।
আমি চাই আমার বুদ্ধিটি হয় আরও সূক্ষ্ম,
চাই ভার্যার মেজাজ হয় একটু কম রুক্ষ,
আমি চাই কেবল সুখটি আর চাই না ক দুঃখ—
তা যেমনটি চাই তেমন হয় না।

আমি চাই আমার গুণকীর্তন গায় বিশ্বসুদ্ধ—
যেন শিখানো টিয়া কি ময়না।
চাই ভস্ম হয় শত্রুগণ যখন হই ক্রুদ্ধ—
তা যেমনটি চাই তেমন হয় না।
আমি চাই রেলে সাহেবগণ হন আরো শিষ্ট,
আপিসে মুনিবগণ কথা কন মিষ্ট,
আমি চাই অনেক জিনিস—কিন্তু হা অদৃষ্ট !—
তা যেমনটি চাই তেমন হয় না।

বিরহ-যাপন

তোমারি বিরহে সই রে, দিবানিশি কত সই—
এখন, ক্ষুধা পেলেই খাই শুধু (আর) ঘুম পেলেই ঘুমই।
কি বলবো আর—পরিত্যাগ (এখন)—একেবারে চিঁড়ে দই—
—রোচে না ক মুখে কিছু পাঁটার ঝোল আর লুচি বৈ।

এখন সকালবেলা উঠে তাই, হতাশভাবে সন্দেশ খাই,
কভু দুখান সরপুরি—আর দুঃখের কথা কারে কই!
দুঃখের বারিধির আমার কোন মতেই পাই নে থৈ—
—আবার বিরহে বুঝি (আমার) ক্ষুধা জেগে ওঠে ঐ!

(এখন) বিকেলটাও যদি হায় সর্বৎ খেয়ে কেটে যায়,
সন্ধ্যায় একটু হুইস্কি ভিন্ন প্রাণটা আর বাঁচে কৈ!
কে যেন সদাই এ প্রাণের পাকা ধানে দিচ্ছে মৈ—
(তাই) রাতে দু চার এয়ার ডেকে (এ দারুণ)
বিরহের বোঝা বই।

(এখন) ভাবি ও বিধুবয়ানে ঘুম আসে না নয়ানে,
কোন্ রাত্তির আর মধ্যাহ্ন ভিন্ন চব্বিশ ঘণ্টাই জেগে রই।
বিরহেতে দিন দিন ওজনেতে বেশি হই;—
এতদিনে বুঝলেম প্রিয়ে (আমি) তোমা বই আর কারো নই।

মোটা তাকিয়ায় দিয়ে ঠেস
আমরা স্বাধীন করি দেশ—
আর friendsদের ভিতরে ইংরেজগুলোকে
করি খুব hate ও abuse ;
কিন্তু সামনে সেলাম না করি if you think,
তা'লে you are an awful goose.

আমরা পড়ি Mill, Hume, Spencer,
কোন ধর্মের ধারি না ধার ;
করি hoot alike the Hindoos, the Buddhists,
the Mahomedans, Christians & Jews ;—
কিন্তু ফলার ভোজে হিঁদু নই if you think,
তা'লে you are an awful goose.

About female education,
ও female emancipation,
আর infant marriage, আর widow remarriage
আমাদের খুব enlightened views ;
কিন্তু views মতে কাজ করি if you think,
তা'লে you are an awful goose.

You are not far wrong if you think,
যে আমরা করি একটু বেশি drink,
কিন্তু considering our evolution-এর state,
আমাদের morals নয় খুব loose
তবে about morals, we care a hang if you think,
তা'লে you are an awful goose.

From the above দেখতে পাচ্ছ বেশ,
যে আমরা neither fish nor flesh ;
আমরা a curious commodity, a human
oddity, denominated Baboos ;
আমরা বক্তৃতায় যুঝি ও কবিতায় কাঁদি, কিন্তু কাজের
বেলায় সব ঢুঁঢুঁ-s ;
আমরা beautiful muddle, a queer amalgam
of শশধর, Huxley, and goose.

বিলাত-ফের্তা

আমরা বিলাত ফের্তা ক' ভাই,
আমরা সাহেব সেজেছি সবাই ;
তাই কি করি নাচার, স্বদেশী আচার
করিয়াছি সব জবাই।

আমরা বাংলা গিয়েছি ভুলি',
আমরা শিখেছি বিলিতি বুলি,
আমরা চাকরকে ডাকি "বেয়ারা"—আর
মুটেদের ডাকি "কুলি"।

রাম, কালীপদ, হরিচরণ—
নাম এ সব সেকেলে ধরন—
তাই নিজেদের সব ডে রে ও মিটার
করিয়াছি নামকরণ।

আমরা সাহেব সঙ্গে পটি,
আমরা মিস্টার নামে র'টি,
যদি "সাহেব" না ব'লে "বাবু" কেহ বলে,
মনে মনে ভারি চটি।

আমরা ছেড়েছি টিকির আদর,
আমরা ছেড়েছি ধুতি ও চাদর,
আমরা হ্যাট বুট আর প্যাণ্ট কোট প'রে
সেজেছি বিলাতি বাঁদর ;

আমরা বিলিতি ধরনে হাসি,
আমরা ফরাসি ধরনে কাশি,
আমরা পা ফাঁক ক'রে সিগারেট খেতে
বড্ডই ভালবাসি।

আমরা হাতে খেতে বড় ডরাই,
আমরা স্ত্রীকে ছুরি কাঁটা ধরাই,
আমরা মেয়েদের জুতো মোজা, দিদিমাকে
জ্যাকেট কামিজ পরাই।

আমাদের সাহেবিয়ানার বাধা
এই যে, রংটা হয় না সাদা,
তবু চেষ্টার ত্রুটি নেই—'ভিনোলিয়া'
মাখি রোজ গাদা গাদা।

আমরা বিলেতফের্ত্তা ক'টায়,
দেশে কংগ্রেস আদি ঘটাই ;
আমাদের সাহেব যদিও দেবতা, তবু ঐ
সাহেবগুলোই চটাই।

আমরা সাহেবি রকমে হাঁটি,
স্পীচ দেই ইংরিজি খাঁটি ;
কিন্তু বিপদেতে দেই বাঙালিরই মত
চম্পট পরিপাটি।

বিষ্যুৎবারের বারবেলা

পার ত জ'ন্মো না কেউ বিষ্যুৎবারের বারবেলায়
জন্মাও ত সামলাতে পারবে না ক তার ঠেলায়।
দেখ, বিষ্যুৎবারের বারবেলায় আমার জন্ম হইল ;
তাই দিল মোরে, কালো ক'রে, রোদে ধ'রে
মাখিয়ে মাখিয়ে তৈল।

দেখে মা, কালো ছেলে, দিল ঠেলে, দিল না ক মায়ের দুধ,
ক'রে দিল শরীর সরু, বুদ্ধি গরু, খাইয়ে খাইয়ে গা'য়ের দুধ।
পরে, মিলে আমার আটটা মামায়—বাবার সেই আট শালায়,
হ'তে না হ'তে বড়, দিয়ে চড় পাঠিয়ে দিল পাঠশালায়।

দেখে মোর গুরুমশায় (যেন কশাই) বিষ্যেয় খাটো শম্মা রে,
ক'রে দিল সেই ফাঁকে শরীরটাকে পিটিয়ে পিটিয়ে লম্বা রে।
বাবা, আমি উঁচু দিকেই বাড়ছি দেখে, স্কুল থেকে ছাড়িয়ে নিল ;
দিল মোর চাকরি ক'রে তারাও মোরে দুদিন পরে তাড়িয়ে দিল।

দেখে মোরে চাকরিশূন্য, বাবা ক্ষুণ্ণ, বিয়ে দিতে নিয়ে ঘরে গেল।
দেখে মোর শরীর লম্বা, বুদ্ধি রম্ভা, কনের দরও চ'ড়ে গেল।
হায়! গো বিধি দুষ্ট সবায় তুষ্ট, রুষ্ট কেবল আমার বেলায় ;
সে কেবল স্লেললাম ব'লে জ'ন্মে ভুলে বিষ্যুৎবারের বারবেলায়।

নতুন কিছু করো

নতুন কিছু করো, একটা নতুন কিছু করো।
নাকগুলো সব কাটো, কানগুলো সব ছাঁটো ;
পাগুলো সব উঁচু ক'রে, মাথা দিয়ে হাঁটো ;
হামাগুড়ি দাও, লাফাও, ডিগবাজি খাও, ওড়ো ;
কিম্বা চিৎপাত হয়ে—পাগুলো সব ছোঁড়ো ;
ঘোড়াগাড়ি ছেড়ে এখন বাইসিকেলে চড়ো,
—নতুন কিছু করো, একটা নতুন কিছু করো।

ডাল ভাতের দফা কর সবাই রফা,
কর শিগ্‌গির ধুতিচাদরনিবারিণী সভা ;

প্যাণ্ট পরো, কোট পরো, নইলে নিভে গেলে ;
ধুতি চাদর হয়েছে যে নিতান্ত সেকেলে ;
কাঁচকলা ছাড়ো, এবং রোস্ট চপ্ ধরো ;
—নতুন কিছু করো, একটা নতুন কিছু করো।

কিম্বা সবাই ওঠো, টাউন হলে জোটো ;
হিন্দুধর্ম প্রচার করতে আমেরিকায় ছোটো ;
আমরা যেন নেহাত খাটো হয়ে না যাই, দেখো,—
খুব খানিক চেঁচাও কিম্বা খুব খানিক লেখো ;
বেন্, মিল ছাড়ো, আবার ভাগবত পড়ো।
—নতুন কিছু করো, একটা নতুন কিছু করো।

আর কিছু না পারো, স্ত্রীদের ধ'রে মারো ;
কিম্বা তাদের মাথায় তুলে নাচো—ভালো আরো !
একেবারে নিভে যাচ্ছে দেশের স্ত্রীলোক ;
বি এ, এম এ, ঘোড়শোয়ার যা একটা কিছু হোক।
যা হয়—একটা করো কিছু রকম নতুনতরো ;
—নতুন কিছু করো, একটা নতুন কিছু করো।

হয়েছি অধীর যত বঙ্গবীর ;
এখন তবে কাটো সবাই নিজের নিজের শির ;
পাহাড় থেকে পড়ো, সমুদ্রে দাও ডুব ;
মরবে না হয় মরবে—একটা নতুন হবে খুব।
নতুন রকম বাঁচো, কিম্বা নতুন রকম মরো ;—
—নতুন কিছু করো, একটা নতুন কিছু করো।

হ'ল কি

হ'ল কি ! এ হ'ল কি !—এ ত ভারি আশ্চর্যি !
বিলেত-ফের্তা টান্‌ছে হুক্কা, সিগারেট খাচ্ছে ভশ্চার্যি।
হোটেলফের্তা মুন্সেফ ডাক্‌ছেন "মধুসূদন কংসারি" !
চট্ট চটির দোকান খুলে দস্তুরমত সংসারী !

ছেলের দল সব চশমা প'রে ব'সে আছে কাটখোট্টা ;
সাহেবরা সব গেরুয়া পরছে, বাঙালি 'নেক্‌টাইহ্যাট্‌কোট্টা'
পক্ষীর মাংস, লক্ষ্মীর মত, ছেলেবেলায় খান নি কে ?
ভবনদীর পারে গিয়ে বিড়াল বস্‌ছেন আহ্নিকে।

পদ্য গদ্য লিখ্‌ছে সবাই, কিন্‌ছে না ক কিন্তু কে'ই ;
কাটছে বটে—পোকায় কিন্তু, আলমারি কি সিন্দুকেই।
জহরচন্দ্র, গোকুল মাইতি বাড়ছে লম্বা চওড়াতে ;
বিদ্যারত্ন দরকার সুদ্ধ বিয়ের মন্ত্র আওড়াতে।

পুরুষরা সব শুনছে ব'সে, মেয়েরা আসর জম্‌কাচ্ছে।
গাচ্ছে এমনি তালকানা যে, শুনে তা' পীলে চম্‌কাচ্ছে।
রাজা হচ্ছে শিষ্টশান্ত, প্রজা হচ্ছে জবদ্দার ;
মুনিব করছে 'আজ্ঞা হুজুর', চাকর করছেন 'খবদ্দার'।

রাধাকৃষ্ণ রঙ্গমঞ্চে নাচ্‌ছেন গিয়ে আনন্দে।
ব্যাখ্যা কচ্ছেন হিন্দুধর্ম হরি ঘোষ আর প্রাণধন দে ;
শাস্ত্রিবর্গ কোনই শাস্ত্রের ধরেন না এক বর্ণ ধার,
স্ত্রীরা হচ্ছেন ভবার্ণবে বেশি মাত্রায় কর্ণধার।

পাঁচটি এয়ার

আমরা পাঁচটি এয়ার—
আমরা পাঁচটি এয়ার দাদা, আমরা পাঁচটি এয়ার।
আমরা পাঁচটি সখের মাঝি ভবসিন্ধুখেয়ার,—
কিন্তু পার করি শুধু বোতল গেলাস—আমরা পাঁচটি এয়ার।
দেখ, ব্রাণ্ডি মোদের রাজা, আর শ্যাম্পেন মোদের রাণী ;
আমরা করি নে কাহারে ডর, আমরা করি নে কাহারো হানি ;
আমরা রাখি নে কাহারও তক্কা, আমরা করি নে কাউরে কেয়ার ;
এ ভবমাঝে সবই ফক্কা—জেনিছি আমরা পাঁচটি এয়ার।
কেন নদীর জলে কাদা, আর সাগরজলে নুন ?—
পাছে, মেলা সাদা জল খেয়ে হয় মানুষগুলো খুন।
কেন তুমি হ'লে না ক কবি, হ'ল সেক্সপীয়ার ?
আর সে সব কথা কাজ কি ব'লে ;—আমরা পাঁচটি এয়ার।
কেন দেবতা দিল তাড়িয়ে দৈত্যে—বল দেখি দাদা !
কারণ, দেবতা খেত লাল পানি, আর দৈত্য খেত সাদা।
এ ভবারণ্যের ফেরে এমন সুহৃদ্ আছে কে আর ?
এ জীবনের যা সার বুঝেছি—আমরা পাঁচটি এয়ার।
মোদের দিও নাকো কেউ গালি, মোদের ক'রো নাকো কেউ মানা ;
আমরা খাব না ক কারো চুরি ক'রে দুগ্ধ, ননী, ছানা,
শুধু, লুটিব একটু মজা, শুধু করিব একটু পেয়ার ;
শুধু, নাচিব একটু, গাইব একটু—আমরা পাঁচটি এয়ার।

বেশ করেছো

রাজা। কালীচরণ করত বড় বীরত্বেরই বড়াই—

পারিষদবর্গ। বুঝি গাঁজায় দিয়ে দম—

রাজা। দেখলে সে দিন আমার সঙ্গে করতে এল লড়াই ;

পারিষদবর্গ। বেটার আস্পর্ধা নয় কম।

রাজা। আমি বললাম : তবে রে বেটা, আয় না দেখি তবে রে বেটা !
—পরে যখন ধ'রে আমায় ক'রে দিল জুতোপেটা ;
দেখলাম, বেটা আমার হাতে মরে বুঝি এবার—
যোগাড় ক'রেও তুলেছিলাম দুই এক ঘা দেবার
বেটা ত সে খোঁজ রাখে না,
রাগলে আমার জ্ঞান থাকে না,
কিন্তু রাগটা সামলে গেলাম অনেক কষ্টে সে বার।

পারিষদবর্গ। বেশ করেছো, বেশ করেছো, নহিলে অন্ততঃ
একটা খুন খারাপি হ'ত, একটা খুন খারাপি হ'ত।

রাজা। কেদার বেটা সাধু ব'লে শহরে ঢাক পেটায়—

পারিষদবর্গ। হেঁ হেঁ বেটা আদত চোর।

রাজা। নিইছিলাম তার হাজার টাকা চাইতে এল সেটায়—

পারিষদবর্গ। বেটা বোধ হয় গুলিখোর।

রাজা। আমি বললাম : তবে রে বেটা, আয় না দেখি তবে রে বেটা !
কে কে কে তোর টাকা জানে, তো তো তো তোর সাক্ষী কেটা ?
কর না গিয়ে মকদ্দমা—I don't care a feather !
মুখখানি ত চুনটি ক'রে ফিরে গেল কেদার।
টাকা নিয়ে করবে সে কী ? টাকাগুলো সব শেষে কি
গাঁজা গুলি খেয়ে, বেটা উড়িয়ে দেবে দেদার ?

পারিষদবর্গ। বেশ করেছো, বেশ করেছো, সে টাকা নিশ্চিত,
বেটা সব উড়িয়ে দিত, বেটা সব উড়িয়ে দিত।

রাজা। নিত্যানন্দ, বিদ্বান্ ব'লে করতে চায় সে প্রমাণ;
পারিষদবর্গ। সে কি আবার একটা লোক!
রাজা। করতে এল তর্ক সেদিন আমার সঙ্গে সমান,
পারিষদবর্গ। বেটা নিরেট আহাম্মক।
রাজা। আমি বললাম: তবে রে বেটা, আয় না দেখি তবে রে বেটা!
আমি একটা philosopher, গাধা শুয়র জানিস সেটা?
ব'লে দু ঘা পিঠে লাঠি বসিয়ে দিলাম চটাং,
লাঠি খেয়ে প'ড়ে গেল বেটা ত চিৎপটাং।
আমার সঙ্গে সে পারে কি,
তর্কের বেটা ধার ধারে কি,
তখন তর্কে হার মেনে সে পালিয়ে গেল সটাং।
পারিষদবর্গ। বেশ করেছো, বেশ করেছো, তর্কেতে বস্তুত
সেরা প্রমাণ লাঠির গুঁতো, সেরা প্রমাণ লাঠির গুঁতো।

হ'তে পারতাম

রাজা। দেখ, হ'তে পারতাম নিশ্চয় আমি মস্ত একটা বীর—
কিন্তু গোলাগুলির গোলে কেমন মাথা রয় না স্থির;
আর ঐ বারুদটার গন্ধ কেমন করি না পছন্দ;
আর সঙ্গীন খাড়া দেখ্‌লেই মনে লাগে একটা ধন্দ;
খোলা তরোয়াল দেখ্‌লেই ঠেকে যেন শিরোহীন এ-স্কন্ধ;

তাই বাক্যে বীরই হ'য়ে রৈলাম আমি চ'টে ম'টেই ত!
তা নইলে খুব এক বড়—
পারিষদবর্গ। হাঁ তা বটেই ত, তা বটেই ত।

রাজা। দেখ, হ'তে পারতাম আমি একটা প্রত্নতত্ত্ববিৎ—
কিন্তু "গবেষণা" শুন্‌লেই হয় আতঙ্ক উপস্থিত;
আর দেশটাও বেজায় গরম, আর বিছানাও বেশ নরম,
আর তাও বলি প্রেয়সীর সে-হাসিটুকু চরম।
আর তাঁকে চর্চা কল্লেও একটু কাজও দেখে বরং।
তাই স্ত্রীতত্ত্ববিৎ হ'য়ে রৈলাম আমি চ'টে ম'টেই ত!
তা নইলে বেশ এক বড়—
পারিষদবর্গ। হাঁ তা বটেই ত, তা বটেই ত।

রাজা। দেখ, হ'তে পারতাম নিশ্চয় একজন উঁচুদরের কবি—
কিন্তু লিখ্‌তে বস্‌লেই অক্ষরগুলো গরমিল হয় যে সবই;
আর ভাষাটাও, তা ছাড়া মোটেই বেঁকে না, রয় খাড়া;
আর ভাবের মাথায় লাঠি মারলেও দেয় না ক সে সাড়া;
ছাই হাজারই পা দুলোই, গোঁফে হাজারই দেই চাড়া;
তাই নীরব কবি হ'য়ে রৈলাম আমি চ'টে ম'টেই ত!—
তা নইলে খুব এক উঁচু—
পারিষদবর্গ। হাঁ তা বটেই ত, তা বটেই ত।

রাজা। দেখ, হ'তে পারতাম রাজনৈতিক বক্তাও অন্ততঃ—
কিন্তু কিন্তু দাঁড়ালেই হয় স্মরণশক্তি অবাধ্য স্ত্রীর মত;
আর মুখস্থ সব বুলি এমন বেজায় যায় সব ঘুলিয়ে;
আর সুযোগ পেয়ে রুখে দাঁড়ায় বিদ্রোহী ভাবগুলি হে!

তা   হাজার কাশি, আদর করি দাড়িতে হাত বুলিয়ে!
তাই   রইলাম বৈঠকখানাবক্তা আমি চ'টে ম'টেই ত!
তা   নইলে খুব এক ভারি—
পারিষদবর্গ। হাঁ তা বটেইত ত, তা বটেই ত।

রাজা।   দেখ, ক্ষমতাটা ছিল না ক সামান্য বিশেষ;
কেবল   প্রথম একটা ধাক্কা পেলেই চ'লে যেতাম বেশ;
     হতাম পেলে সুযোগও বুঝি একটা যেও সেও
ওই   কেষ্ট বিষ্টুর মধ্যে একটা হতাম নিঃসন্দেহ;
কিন্তু   প্রথম সে ধাক্কাটি আমায় দিলে না ক কেহ;
তাই   যা ছিলাম তাই র'য়ে গেলাম আমি চ'টে ম'টেই ত!
তা   নইলে—বুঝলে কি না,—
পারিষদবর্গ। হাঁ তা বটেই ত, তা বটেই ত।

আষাঢ়ে

আষাঢ়ে

আষাঢ়ে প্রকাশিত হয় ১৩০৫ সালে। ভূমিকায় দ্বিজেন্দ্রলাল লেখেন: "এ-কবিতাগুলির ভাষা অতীব অসংযত ও ছন্দোবন্ধ অতীব শিথিল, ইহাকে সমিল গদ্য নামেই অভিহিত করা সঙ্গত। কিন্তু যেরূপ বিষয়, সেইরূপ ভাষা হওয়া বিধেয় মনে করি। হরিনাথের শ্বশুরবাড়ি যাত্রা প্রসঙ্গে মেঘনাদবধের দুন্দুভিনিনাদী ভাষা ব্যবহার করিলে চলিবে কেন?"

রবীন্দ্রনাথ আষাঢ়ের উচ্চ প্রশংসা করে একটি নাতিদীর্ঘ সমালোচনা লেখেন। তাতে একজায়গায় তিনি লেখেন: "ভাষা সম্বন্ধে কবি যাহা লিখিয়াছেন তাহা ঠিক কথা। কিন্তু…পদ্যকে সমিল গদ্যরূপে চালাইবার কোনো হেতু নাই। ইহাতে পদ্যের স্বাধীনতা বাড়ে না, বরঞ্চ কমিয়া যায়। কারণ, কবিতা পড়িবার সময়ে পদ্যের নিয়মরক্ষা করিয়া পড়িতে স্বতই চেষ্টা জন্মে, কিন্তু মধ্যে মধ্যে যদি স্খলন হইতে থাকে তবে তাহা বাধাজনক ও পীড়াদায়ক হইয়া থাকে।…

"অথচ শোনাইবার যোগ্য এমন কৌতুকাবহ পদার্থ বঙ্গসাহিত্যে আর নাই।…আবৃত্তির পক্ষে কৌতুক-কবিতা অত্যন্ত উপাদেয়। তাই আষাঢ়ের অনেকগুলি কবিতা ছন্দের উচ্ছৃঙ্খলতা-বশত আবৃত্তির পক্ষে সুগম হয় নাই বলিয়া অত্যন্ত আক্ষেপের বিষয় হইয়াছে।

"অথচ ছন্দের এবং মিলের উপর গ্রন্থকারের যে আশ্চর্য দখল তাহাতে সন্দেহ নাই। উত্তপ্ত লৌহচক্রে হাতুড়ি পড়িতে থাকিলে যেমন স্ফুলিঙ্গ-বৃষ্টি হইতে থাকে তাঁহার ছন্দের প্রতি ঝোঁকের মুখে তেমনি করিয়া মিলবর্ষণ হইয়াছে। সেই মিলগুলি বন্দুকের ক্যাপের মতো আকস্মিক হাস্যোদ্দীপনায় পরিপূর্ণ। ছন্দের কঠিনতাও যে কবিকে দমাইতে পারে না, তাহারো অনেক উদাহরণ আছে। তাঁহার 'বাঙালি মহিমা,' 'ইংরাজস্তোত্র', 'ডিপুটি-কাহিনী' ও 'কর্ণমদন' সর্বত্র উদ্ধৃত, পঠিত ও ব্যবহৃত হইবার পক্ষে অত্যন্ত অনুকূল হইয়াছে।"

এইভাবে আরো অনেক সুখ্যাতি ক'রে রবীন্দ্রনাথ শেষে লেখেন:

"সাময়িক পত্রে 'আষাঢ়ে'-রচয়িতার এমন সকল কবিতা বাহির হইয়াছে যাহাতে হাস্য ও অশ্রুরেখা, কৌতুক এবং কল্পনা, উপরিতলের ফেনপুঞ্জ এবং নিম্নতলের গভীরতা একত্র প্রকাশ পাইয়াছে। তাহাই তাঁহার কবিত্বের যথার্থ পরিচয়, তিনি যে কেবল বাঙালিকে হাসাইবার জন্য আসেন নাই, সেই সঙ্গে তাহাদিগকে যে তাতাইবেন এবং মাতাইবেন, এমন আশ্বাস দিয়াছেন।"

(আধুনিক সাহিত্য)

আষাঢ়ে-তে পাঁচটি কবিতা আছে নিখুঁৎ ছন্দে রচিত। এগারটি কবিতাই এ-সংকলনে দেওয়া হ'ল। তাছাড়া দুটি কৌতুকাবহ নক্সা 'অদল-বদল' ও 'হরিনাথের শ্বশুরবাড়ি যাত্রা'—এখানে পেশ করলাম ছন্দকে একটু মেজেঘষে নিখুঁৎ করে—যেভাবে তিনি এদুটিকে অতি সহজেই মাজাঘষা করতে পারতেন—যদি ইচ্ছা করতেন। যাঁরা বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের প্রকাশিত গ্রন্থাবলীতে এ-কবিতা দুটি পড়েছেন তাঁরা নিশ্চয়ই স্বীকার করবেন যে রবীন্দ্রনাথ ভুল বলেন নি—এ পরম কৌতুকাবহ কবিতা দুটি পড়তে পড়তে জিভ ও কান পদে পদে ব্যাহত হয়। অথচ একটু আধটু অদলবদল করলেই কবিতা দুটির ছন্দের গাঁথনির বোল বদলে যায়।

তাঁর অনবদ্য মিল বজায় রেখে এ-নক্সা দুটির ছন্দের একটু আধটু পরিমার্জনা করেছি প্রধানত রবীন্দ্রনাথের সমালোচনা শিরোধার্য করেই যে "পদ্যকে সমিল গদ্যরূপে চালাইবার কোনো হেতু নাই।"

আষাঢ়ে প্রকাশ হয় হাসির গানেরও আগে। রবীন্দ্রনাথ আষাঢ়ে পড়ে ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন: "আমাদের বিশ্বাস···তাঁহার হাস্যসৃষ্টির নীহারিকা ক্রমে ছন্দোবন্ধে ঘনীভূত হইয়া বঙ্গসাহিত্যে হাস্যালোকের ধ্রুব নক্ষত্রপুঞ্জ রচনা করিবে।"

কবির ভবিষ্যদ্বাণী ফলেছিল—দ্বিজেন্দ্রলালের "হাসির গানে।"

দ্রষ্টব্য। "রমণীর মুখ" কবিতাটি "ত্রিবেণী"-তে ছাপা হয়েছিল। ত্রিবেণীর সুরের সঙ্গে এ-সুর মেলে না ব'লে এ-কবিতাটি আষাঢ়েতে সংন্যাস্ত হ'ল। ইতি—

দি. কু. রা.

বাঙালি-মহিমা

মিথ্যা মিথ্যা কথা যে, বাঙালি ভীরু বাঙালির নাহি একতা।
কেন বক্তৃতায় রটাও সে-বাণী, খবর-কাগজে লেখ তা ?
অন্ত্য পদ্যে আমি বাঙালি-বীরত্ব করিব জগতে ঘোষণা,
বেরোবে ছাপায়, পড়িতে পাবে তা। ব্যস্ত হও কেন ? রোস না !
তবে তালুদেশে চড়াত করিয়া নেমে এস মাতা ভারতি !
অর্জুনের সাধ্য হ'ত যুদ্ধ করা কৃষ্ণ না থাকিলে সারথি ?
সাহায্য তুমি না কর যদি—আমি সমর্থ তাহাতে নহি মা ;—
দাও বীণাপাণি বীণায় ঝঙ্কার, গাইব বাঙালি-মহিমা।

খোলো ইতিহাস : সতেরো তুরস্ক প্রবেশিল যবে গৌড়েতে,
লক্ষ্মণ সেন ত দিলেন চম্পট কচুবনে এক দৌড়েতে।
সে-অপূর্ব সুমধুর, আধ্যাত্মিক দীর্ঘ-পলায়ন কাহিনী
যোগ্য ছন্দোবন্ধে বোধ হয় আজো ভালো ক'রে কেহ গাহে নি !
পরে আফগান, মোগল, পাঠান দলে দলে দেশ জুড়িয়া
করিল রাজত্ব—তাহাও বীরত্বে সহিল বাঙালি উড়িয়া।
আসিল ইংরাজ। বাঙালি (লেখে তো সব ইতিহাস বহিতে)
দিল দীর্ঘ লম্ফ ইংরাজের কোলে পাঠানের ক্রোড় হইতে।
করেছে সংগ্রাম মহারাষ্ট্রা শিখ, মূর্খ যত সব মেড়ুয়া ;
তুমি সূক্ষ্ম বুদ্ধি সন্ন্যাসীর ম'ত (যদিও পর নি গেরুয়া)
নির্লিপ্ত নিশ্চিন্ত উদাসীন হাস্যে বুঝে নিলে সব পলকে :
"ভবিতব্য-লিপি কে খণ্ডাতে পারে ? কাটাকাটি ক'রে ফল কি ?"
হবে না বা কেন ? খায় ছাতু রুটি—পশ্চিমে পাঞ্জাবি পাহাড়ে :
তোমরা বসিয়া কাঁচকলা ভাত খাও আধ্যাত্মিক আহারে।
তারা ভাবে তাই অসলতা চেয়ে কার্য করাটাই শ্রেয়সী
তোমরা হাসিয়া ভাবো—মূর্খ সব—জীবনের সার প্রেয়সী।

তাহাদের চিত্র অর্জুন, রাবণ, ভীষ্ম শরশয্যাশয়নে :
তোমাদের পট—বংশীধর বাঁকা—প্রেমে ঢুলু ঢুলু নয়নে !
তারা গায় সবে—"জয় সীতারাম" আজো শুনি যেথা যাই গো।
তোমাদের গান : "জয় শ্রীরাধিকে—ওগো দুটি ভিক্ষে পাই গো।"
তেমনটি কেহ পারে নি জগতে—তোমরা যেমন দেখালে!
বুঝেছে তা মোক্ষমূলার ও গ্যেটে—ধিক্ মিথ্যাবাদী 'মেকালে' !
এ-সব তো মাত্তা পুরাণ-কাহিনী—কাঁহাতক রাখি স্মরি' মা।
কিন্তু আজো দেখ চক্ষের সামনে প্রত্যক্ষ বাঙালি-গরিমা !
এখনো বাঙালি জগৎসম্মুখে রাস্তা ঘাটে দিয়া নিয়ত
চলিছে নির্ভয়ে—এ কথা জগতে প্রচার করিয়া দিও ত।
তার পর বুদ্ধি!—আশ্চর্য সে বুদ্ধি! ইংরাজি ফরাসি কেতাবে
পড়িছে ! পরীক্ষা দিতেছে ! নিতেছে ! 'এমে' ও এম ডি' খেতাবে !
ব্যবসা চাকরি করিয়া,—কত কি নাটক নভেল লিখিয়া,
আজিও আছে ত স্বদ্ধ বুদ্ধিবলে এ-জগতে সবে টিকিয়া !
ল্যাণ্ডোয় চড়িছে ফিটনে চড়িছে—ট্যাণ্ডেম হাঁকায় সঘনে !
বাসিকিলে যায় ! অশ্বপৃষ্ঠে ধায় ধূলি উড়াইয়া গগনে !
খেলিছে ক্রিকেট, ফুটবল, করে সার্কাস, জানো না তাও কি ?
করিছে বক্তৃতা—লিখিছে কাগজে!—তার বেশি আর চাও কী।
ভেবে দেখ : সেই সত্যযুগ হ'তে কলিযুগাবধি হেন সে
বরাবর বেঁচে এসেছে ত! তার বেশি আর পার্বে কেন সে ?
এত বিপদের আবর্তের মাঝে, এত বিজাতীয় শাসনে,
বরাবর টিঁকে আছে ত, তাকিয়া ঠেসিয়া, ফরাস আসনে !
ধন্য বুদ্ধিবল!—যুদ্ধে কভু শির দেওনি কাহারে বন্ধকী :
যদি বাহুবল অভাব, বুদ্ধিতে পুষিয়ে নিয়েছ। মন্দ কি !

অদল বদল

গোপীকৃষ্ণ দাস—গোমুটাতে বাস,—
বয়েস একুশেতে পড়েছেন গেল এই বর্ষা।
বদনখানি ছাঁচে ঢালা, রংও ভারি ফরশা।
একহারা দেহ—করে নি ক কেহ
এ পর্যন্ত তদীয় সুচরিত্রে সন্দেহ ;
অতি সাধু শিষ্ট—তবে এইটুকু হায় জানি
মাঝে মাঝে ছিপি আঁটা বিলিতি আমদানি
রক্ত পীত কষায় তীব্র নানাবিধ পানি,
খেত মিলে সে আর দু'চারিটি এয়ার,
তাতে বড় কাউকে ত সে করত না ক 'কেয়ার'।
ভগ্নী কিম্বা ভাই একটি ও তার নাই।
মা ও ম'লেন সঁপি' (বৃদ্ধ) বাপের হাতে গোপী ;-
পিতারও তার সুসঙ্গতি ছিলো সবিশেষই।
পড়াশুনাও গোপীকৃষ্ণের হয়নি ক তাই বেশি।
ক্রমে গোপীর পুন্নরকটি হ'তে ত্রাণের জন্য
বিবাহটাও হ'য়ে গেল নির্বিঘ্নে সম্পন্ন।

যাচ্ছে গোপী ক্রমে, স্ত্রীকে—(সবে মাত্র বিয়ে)
শ্বশুর বাড়ি হ'তে, গোপীর বাপের বাড়ি নিয়ে।
সাধন করতে স্বামীর সমুচিত হাজারো ক্রিয়া :
ব'লে রাখি কাদম্বিনী দ্বাদশ বর্ষীয়া।

স্ত্রীর শ্রীঅঙ্গে চেলি, নানা জরির নক্শা আঁকা।
পায়ে মল—আর ঘোমটায় তাঁর বিধু মুখটি ঢাকা।

বোধ হয় রূপের 'তরাসে', পাছে কারো জ্বর আসে,
কিম্বা রূপানলে হঠাৎ কেহ মরে পুড়ে,
ধন্য বিবেচনা—তাঁরে তাই নিয়ে যায় মুড়ে;
ঝি-টি আছে জোরে আঁচলখানি ধ'রে,
পাখা খুলে পরী হ'য়ে যান বা পাছে উড়ে!
জানি না—চেহারাখানি মন্দ কিম্বা ভালো,
তবে হাত পা দেখে বোধ হয় বর্ণটি মিশ কালো।
অলঙ্কারের ধ্বনি শুনে মনে গণি—
তারি জোরে স্বামীর গৃহ কর্বেন তিনি আলো।

হেন স্ত্রীকে নিয়ে, হাবড়ায় সে গিয়ে—
কোঁচানো ফিনফিনে ঢাকাই, মোজা বুট পায়ে,
কোঁচানো চাদরে বাঁধা কালো কুর্তি গায়ে;
(চাদরখানি বুকে বাঁধা, পরা হয় নি খুলে,
কি জানি কেউ পাছে, তার যে নীচে আছে,
স্টার-প্যাটার্ন সোনার চেন, তা দেখ্‌তে যায় বা ভুলে)
—হেন গোপী, দেখে, তিনটি কুলি ডেকে,
নিজের জিনিস 'ইণ্টারমিডোট কেলাশেতে' রেখে,
স্ত্রীকে নিয়ে গিয়ে—(ভিড়ে একটুও না দমে')—
দিল তুলে' স্ত্রী গাড়ীতে অবলীলাক্রমে।

এখন সে গাড়িতে ছিল বর্ণিতে না পারি,
ছোট, বুড়ী, ফর্সা, কালো অনেকগুলি নারী।
কিন্তু জানি আরও একটি ঘোমটা-দেওয়া মেয়ে,
কাদম্বিনীর বয়সী, ফর্শা কাদম্বিনীর চেয়ে,

পরা একই চেলি (যেন বিধির খেলই)
ছিল সে গাড়িতে। পরে শুনেছিও আমি—
ছোট আদালতের একটি হাকিম তাহার স্বামী।
যাচ্ছিলেন তো ধর্মাবতার বদলি সেদিন হ'য়ে,
মুঙ্গেরে তৃতীয় পক্ষ নবোঢ়া স্ত্রী ল'য়ে।
কীর্তিকলাপ তাঁর করব না প্রচার
(পরের ঘরের কথা টেনে কেন করা বা'র ?)
একটি কথা ব'লে রাখি শুধু সংগোপনে :
ধর্মাবতার স্বয়ং গিয়ে কন্যা দরশনে—
দিতে ছেলের বিয়ে, দেখি কন্যাটি-এ
অপ্সরা—তায় নিজেই বিয়ে ক'রে এলেন নিয়ে।

চলল সে-লুপ মেল—ভানুমতীর খেল—
হাওয়ায় যেন উড়ে—ধোঁয়ারাশি ছুঁড়ে—
দূরের জিনিস কাছে এনে, কাছের ফেলে দূরে ;—
ছাড়িয়ে সে তো অবিলম্বে এল শ্রীরামপুরে ;
একটুখানি থামিয়ে, যাত্রী তুলে, নামিয়ে,
হাঁপাতে হাঁপাতে আবার চলে দ্রুতগামী এ।
জ্ঞান নেই ক দাদার আলো কিম্বা আঁধার—
করে নাও দৃষ্টি ঝঞ্ঝা কিম্বা বৃষ্টি—
উর্ধ্বশ্বাসে উড়ে পাহাড় কানন ফুঁড়ে—
টরাটট্ট টরাটট্ট টরাটট্ট ধ্বনিতে
পেরিয়ে গেল কত স্টেশন পারি নাই ক গণিতে।

থামল গিয়ে গাড়ি ক্রমে মেমারিয়া গ্রামে,
গোমুটার সব যাত্রিবর্গ যেখানেতে নামে।

ঘুরঘুটে অন্ধকার দেখে অতি তাড়াতাড়ি
গেল গোপী কুলি ডাকি'; জিনিসপত্র ছাড়ি',
নামাতে তার স্ত্রীকে প্রাণপণে সে দিকে
দৌড়োলো যেদিকে ছিল স্ত্রীলোকদিগের গাড়ি।

এখন না হয় গোপীনাথের খুব কপালের জোর,
নয়ত সে ঘোর কুচরিত্র, অথবা সে চোর,
কিম্বা অন্ধকারে নিজের স্ত্রীই তায় অনুমানি',
নিল গোপী চেলি-পরা জজের স্ত্রীকেই টানি'।

চলল গাড়ি জোরে, জামালপুরে ভোরে
এল ক্রমে। উঠে হাকিম আধো ঘুমের ঘোরে,
স্ত্রী গাড়িতে গিয়ে গোপীর স্ত্রীকে নিয়ে,
(আহা! বেচারি সে বৃদ্ধ) সুশীলাই এই ভুলে,
মুঙ্গেরের গাড়িতে গিয়ে দিলেন সোজা তুলে।

বারো মিনিট পরে জজের পথভ্রষ্টা দাসী
মুঙ্গেরের গাড়িতে উত্তরিল আসি।
তারপরে লুপ মেলও দ্রুত চ'লে গেল
স্টেশন ছেড়ে ছুঁড়ে কেবল ধোঁয়া রাশি রাশি।

হ'ল গোপীর বধূর—কক্ষে নেইক কেহ দেখি'—
ঘোম্‌টাটি দুঃসহ (তাঁরও যেমন গ্রহ!)
ঘোমটাটি সে তুলে চাইলো যেমন ভুলে—
অম্‌নি উঠল চেঁচিয়ে ঝি: "ওঃ! এ কী বাবু! একী!"

কে এ? কাকে নিয়ে এলেন?”—“তাই তো ঝি। বল্—এ কে?
এ যে কালো!”—বজ্রাহত জজ্ ত তা'য়ে দেখে।

ঘোড়দৌড় আর ছুটোছুটি!—প্রকাণ্ড চীৎকার;
“ঝি!—ও মোধো! ও টেলিগ্রাফ—ইস্টেশনমাস্টার!”
বললেন জজ তারস্বরে ঘরে এসে তাঁর,
হাঁপাতে হাঁপাতে: “দোহাই স্টেশন মাস্টার,
লণ্ড ভণ্ড কাণ্ড—আঁধার এ-ব্রহ্মাণ্ড—
দোহাই হে তোমার, ধর্ম-অবতার
তুমিই—তা যা বলুক না সব ধর্ম-গ্রন্থকার;—
রক্ষা কর ধর্ম—এমন ও কুকর্ম!
আর কখনো করব না। হায়! স্ত্রীকে ছেড়ে এসে
স্ত্রী গাড়িতে একা—হ'ল এই কি অবশেষে!!
অহো ভগবান্ কী হ'ল! হায় রে, হাহুতাশ!”
“কেয়া হুয়া বাবু?”—“হায়, আর কেয়া! সর্বনাশ—
স্ত্রী চুরি—তার উপরে এ কোথা থেকে এসে—
চাপল একটা অন্ধকেরে মেয়ে স্কন্ধ দেশে;
স্বামীর নাম ও বলে না ক—বলে বাপের নাম:
কোথাকার এক মুক্তোগাছির কোন্ এক শম্ভুরাম।
উপায়? হায় শ্রীহরি! এখন যে কী করি!”
পড়লেন হাকিম ব'সে একটা বেঞ্চেরই উপরি।
স্টেশন-মাস্টার দেখে এ-ব্যাপার
হারিয়ে নিজের স্ত্রী এ-লোকটা নিয়ে এল কা'র,
এই কথাটি ভেবে হাসি রাখা চেপে
হ'ল ভারি দুঃসাধ্য—প্রায় যান ত তিনি ক্ষেপে!

ধৈর্যের যা গোড়া গোঁফে দিয়ে মোড়া—
বললেন : "হোয়াট্। হোয়াট বাবু? ফেললেন স্ত্রি হারিয়ে?
বড়ই খারাপ কটা—আরও ডুঃখের বিষয় ভারি এ ;
কিণ্টু, বাবু! দায়ী রেলওয়ের লোক নাহি ঃ
রসিড্ নিয়ে মাল গাড়িটে ডিলে, টবে মানি,
হোটো ডায়ী এ সম্বণ্ডে রেলওয়ে কোম্পানি ;
টা হ'লে পৌছিত স্ত্রিও নিঃসন্দেহ এসে।"
ব'লে ফেললেন ইংরাজিতে শ্বেতাঙ্গটি হেসে।
হুজুর ত অবাক্! লেগে গেল তাক্!
শুন্‌লেন এই কথাগুলো বদন ক'রে ব্যাদান।
কী করেন আর? বেঞ্চে ব'সে স্ত্রীর বিরহে হ্যাদান!
শ্বেতাঙ্গটি শেষে দিলেন উপদেশ-এ—
"এ-স্ত্রি লোকটি আপাটট এ-স্টেশনে ঠাক্,
পুলিশেটে খবর ডিবেন আপনার স্ত্রির জন্য,
ইহা ভিন্ন সডুপায়টো ডেখি না কো অন্য ;
টারা বুঝে সুঝে ডেখবে গিয়ে খুঁজে ;
আপনি এখন ঠাকুন শুয়ে স্রেফ নাক মুখ গুঁজে।"

দেখলেন হুজুর—যাবে দেখ্‌ছি উভয় কুলই তাতে ;
এটা তবু আপাতত থাকুক নিজের হাতে ;—
পাওয়া গেলে সেটা ছেড়ে দেব এটা ;
পেলে তারে হাতছাড়া আর করে সে কোন্ বেটা,—
বললেন : "আপাতত চলুক এটা আমার সাথে ;
নির্দাবি এ-মালটি দেব পুলিসেরই হাতে।"
ব'লে কষ্টে শ্রমে হতাশ হ'য়ে দ'মে,
পঁহুছিলেন ধর্মাবতার মঙ্গেরেতে ক্রমে।

গোপী তো এ-দিকে নিয়ে জজের স্ত্রীকে
চ'লে গেলেন বাড়ি, এবং পরম কৌতুকে,
করেন যাপন দিবা, সন্ধ্যা, বিভাবরী সুখে।
একদিন তো গিয়ে গোপী কহেন "প্রিয়ে
সুশীলে!"—সম্ভাষি' তারে অতি স্নেহে চুমি',
"জানতাম না, সত্যি, এত সুন্দরী যে তুমি!
আরো শুনেছিলাম—প্রিয়ে ক'রো না ক রোষ—
তোমার বাপের নাম—কি যেন শম্ভুচরণ ঘোষ।"
স্ত্রী বললেন হেসে: "আর তুমি রসিক যুবা
সুন্দর যে—বলে নি কেউ আমাকে—নতুবা
কাঁদতাম কি আমি, বললেন আমার মাসী,
যখন মাকে: 'বড়ই বুড়ো আহা বাচার স্বামী!'
আরো শুনেছিলাম—তোমার বর্ধমানে সাকিম!
আরো শুনেছিলাম—যেন তুমি একটা হাকিম!"
হাসেন গোপী: "হাঁ হাঁ আমি কাছাকাছি তাই,
ডেপুটির এক শালার আমি পিসীতত ভাই।"

এজলাস বেশ বড়ো, কত যে লোক জড়ো!
মারছে তাদের পেয়াদারা ঘুষি মুষ্টি চড়ও।
ভীষণ রকম রোল যেন হাজার ঢোল
ঢক্ক, কাঁশি, শঙ্খ মিলে করছে গণ্ডগোল।
জিজ্ঞাসিলাম তাদের: "আজকে এখানে কী হবে?
চিৎকার হেন করছ কেন ষাঁড়ের মতন সবে?
এখানেতে ছুটে এসে সবাই জুটে
করছ কী হে? নেবে না কি আদালতটা লুটে?"
"স্ত্রী চুরির এক মকদ্দমা" বলল সবাই উঠে।

শুনে আমি তাই ভিতরেতে যাই,
দেখলাম যা—হ'ল তাতে বুদ্ধি শুদ্ধি লোপই!
একদিকে সেই জজবাবু, আর অন্য দিকে গোপী
ব্যারিস্টারটি দাদা—মোটেই নহেন সাদা—
ডেপুটিরত্নকে নিয়ে বোঝাচ্ছেন গাধা :

"হিন্দুশাস্ত্রমতে হুজুর স্ত্রী রত্ন মহৎ,
সবাই জানে এটা—মুনি ঋষিদেরো মত।
হিরে জহর ইহার কাছে লাগেনা কো কিছু,
ছাগল গরু মেষ মোষ হাতি—ইহার চেয়ে নিচু·
স্ত্রীই বাড়ির গিন্নি, হুজুর! স্ত্রীই বাড়ির দাসী।
স্ত্রীই স্বামীর জমিদারি, তালুকদারী, চাষী।
স্ত্রীই স্বামীর বাহার, স্ত্রীই স্বামীর আহার,
একটি কথায়, নয়ক কিছুই সমতুল্য তাহার।
নয় শুধু এই কালের—পরকালেরো সে গতি।
পুন্নরকে ত্রাণের জন্যেও স্ত্রীর দরকার অতি।
স্বর্গের যেটা সূত্র—মহামূল্য পুত্র—
জজবাবুটির ভার্যা ভিন্ন আশা তস্য কুত্র?"
বাধা দিয়ে বললেন উঠে গোপীর উকিল চটি' :
"প্রমাণেও জজবাবুটির পুত্র কন্যা ন'টি।"
"তা বটে, তা বটে" ব'লে চুলকাইয়া ভুরু
করলেন ফের ব্যারিস্টারটি নালিশ তাহার শুরু :
"তা যাক্, কেবল দেখাবার যা উদ্দেশ্য আমার,
স্ত্রীধন অতি দামী, হুজুরে তা আমি
দেখায়েছি—পরে হুজুর করুন সুবিচার।

দেখবেন হুজুর এটাও ভেবে—জজটি অতি বৃদ্ধ,
মান্য এবং গণ্য, ও এই চুরির জন্য
কত কষ্টে দিবানিশি হয়েছেন যে সিদ্ধ!
বিশেষ, স্ত্রী তাঁর অনুপমা সুন্দরী যুবতী,
(হেথা চুরির মতলবটিও জাজ্বল্যমান অতি ;)
এবং হাতি সমান দিয়েছিও প্রমাণ—
গোপীকৃষ্ণ বয়াটে ও মাতাল সবিশেষই,
সে-জন্য তার হওয়া উচিত সাজা খুবই বেশি।”
উঠলেন এখন গোপীর দক্ষ উকিল পরিশেষে,—
চুল তাঁর অতি কটা মেজাজ ভারি চটা,
আরম্ভিলেন বক্তৃতাটি ধীরে ধীরে, কেশে ;—
“এ-বিষয়ে জজবাবুটিই দোষী, তিনি ঘোর
ষণ্ড এবং ব্যভিচারী, ভণ্ড এবং চোর।
বললাম এই যাহা, প্রমাণ হবে—তাহা!
জেনেশুনে জজবাবু—যে, আর একজনের স্ত্রী এ,
তবু গোপীর স্ত্রীকে সটাং এলেন ঘরে নিয়ে!
নেই কি জ্ঞান-কাণ্ড? অকাল-কুষ্মাণ্ড!
একেবারে খালি ওটার বিদ্যাবুদ্ধিভাণ্ড!!
পঁয়ষট্টি বছরের বুড়ো, হতভাগা গাধা,
অনায়াসে হ’ত পারে যে তার ঠাকুরদাদা—
নিয়ে গিয়ে তারে, জ্ঞাত ব্যভিচারে
বিনাশিলি ধর্ম তাহার নিঃসঙ্কোচে?—আরে—
তুই একটা জজ! নেই কি লজ্জাও তোর ছাই?
ম’রে যাবি টুক্ ক’রে তুই কবে যে—ঠিক্ নাই!
করেছিস্ ত বিয়ে বেটা শুধু টাকার জোরে
অপরূপা সুন্দরী এই বালিকাকে ধ’রে!

নিজের ছেলের বিয়ে, কোথায় দিতে গিয়ে
নিজে এলি বিয়ে ক'রে? তুই কি একটা মানুষ!
তুই তো পশু, পক্ষী, মৎস্য, লাটিম কিম্বা ফানুষ!"

বললেন হেঁকে ব্যারিস্টারটি: "উকিল মশয়! কেন
মক্কেলকে আমার, মিছে গালাগালি দেন ও?"
"গালাগালি! মশয়, আপনার মক্কেল অতি শুয়োর,
কোলা ব্যাং—ওর যাওয়া উচিত ভিতরেতে কুয়োর;
সেখানেতে লুকিয়ে, না খেয়ে, ও শুকিয়ে,
কুঁকড়ে ম'রে যাওয়া উচিত—এত স্বভাব কু ওর!
যখন গোপীকৃষ্ণ আসে নিয়ে জজের স্ত্রীকে
তখন নিশুত রাত ও আঁধার ঘুটঘুটে চৌদিকে
গোপীকৃষ্ণ, প্রভু, জানত না তো কভু
সুশীলা যে অন্যের স্ত্রী—অনিবার্য যুক্তি।
গোপীকৃষ্ণ পেতে পারে বেকসুরী মুক্তি।
কিন্তু ঐ যে হাঁড়িমুখো বানর বেটাচ্ছেলে—
আজ্ঞা হোক্ এক্ষুনি ওকে পাঠিয়ে দিতে জেলে
উনি আবার জজ! বদ্‌মাস্! পাজি! আরে খেলে যা!
নিজে চুরি করে, নালিশ—যা বেটা, যা জেলে যা।"

"আবার গালাগালি!—" ব্যারিস্টার উঠলেন ব'লে।
বললেন উকিল: "চুপ্ করো, নয় যাও বাইরে চ'লে।
আমার সময় দাদা. দিও না ক বাধা
জজটা যেমন তেমনি কি এ ব্যারিস্টারটাও গাধা।"
"কোর্টে অপমান! ভালো যদি চান—"
বললেন আবার ব্যারিস্টারটি—"আপনি বেরিয়ে যান।"

"এও কি দাদা হয়—একি তোর ছেলের হাতে মোয়া ?
এমনি মারব রগে চড় যে দেখবি সবই ধোঁয়া !"
শুরু পরে হাতাহাতি, পরিশেষে লাথালাথি
পরে চুলোচুলি এবং পরিশেষে দাড়াদাড়ি ;
দেখলেন শেষে হাকিম—যখন হ'ল কিছু বাড়াবাড়ি ;
বললেন : "এ-আদালত আজ অনেকক্ষণই সয়েছে,
আর সইতে পারে না কো—বেশ অপমান হয়েছে।
এই অপমান করার দরুন আদালত ও আইন,
হ'ল প্রতিপক্ষের আজ দুশো টাকা ফাইন।"

এইরূপ প্রসঙ্গ হ'য়ে গেল ভঙ্গ
হাকিম তখন দিলেন রায়, তার এবম্বিধ মর্ম—
"যাও হে, করো বাড়ি গিয়ে যার যা নিত্যকর্ম।
হে বৃদ্ধ জজ ! কাদম্বিনীই তোমার যোগ্যা ভার্যা।
গোপীকৃষ্ণ ! এই সুশীলাই তোমার স্ত্রী, আর যার যা
অন্য দাবি ডিশমিশ—ইচ্ছা হয় তো পরে কারো
সিভিল কোর্ট খুব খোলা আছে, নালিশ করতে পারো।"
জজটি অতি ক্লিষ্ট—গোপী অতি হৃষ্ট
হ'লেন তাতে, অতি স্পষ্ট হ'ল সেটা দৃষ্ট।
সবার মাঝে সাফ, দিলেন তিনি লাফ,
সুশীলাকে ধ'রে গেলেন গাড়ি ক'রে,
বৃদ্ধ জজকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখায়ে সজোরে।

মর্ম

১। হিন্দু বিবাহটা হয় ত খুবই আধ্যাত্মিক,
শুদ্ধ সেটা চুক্তি নয়—তা অবশ্যই ঠিক্।
কিন্তু বৃদ্ধ হয়ে বালিকাকে বিয়ে করায়
আধ্যাত্মিকতাটা একটু বেশি দূরই গড়ায়;
সেরূপ বিবাহটা আত্মার হয়ত মোক্ষসেতু,
কিন্তু হয়তা প্রায়ই গৃহে অশান্তিরই হেতু।

২। ঘোম্‌টা যে-জিনিসটা ভালো হ'লেও—তা ব'লে
ঠিক্ সাড়ে তিন গজী লম্বা না হ'লেও চলে।
যদিই অন্যে পরিবারের চন্দ্রমুখখানি
দেখে খুসি হয় বা, তাতে এমনই কী হানি?

৩। রেলে যেতে হ'লে সবাই স্ত্রী গাড়ির ঐ মোড়ে
আপন আপন স্ত্রীগুলিকে নিও বুঝে প'ড়ে।

৪। উকিলেতেই অনেক কার্য যায় জীবনে চ'লে
মকদ্দমা জেতে না কো ব্যারিস্টারই হ'লে।

হরিনাথের শ্বশুরবাড়ি যাত্রা

শ্রীহরিনাথ দত্ত চ'ড়ে সকাল বেলায় ট্রেন্,
দুর্গা পূজার ছুটি—শ্বশুরবাড়ি আসিছেন।
এ-কথাটি সত্য,   শ্রীহরিনাথ দত্ত
পাটনায় এক চাকরি করেন—সে চাকরির কী অর্থ
বলা কিছু শক্ত—কারণ এটি ব্যক্ত
যে, হরিনাথ মাঝে মাঝে করতেন খুব ত্যক্ত
শ্বশুরকে তাঁর টাকার জন্যে—যেন বা তাঁর কন্যায়
বিয়ে ক'রে অভাগিনী চির অবরুদ্ধার
পিতৃ-মাতৃ উভয় কুলই করেছিলেন উদ্ধার।

শ্রীহরিনাথ উপন্যাস তো ক'রে মেলা জড়ো
অষ্টপ্রহর পড়তেন—কাজকর্ম কোনো বড়ো
শেখেন নি ক, ব'সে   পড়তেন খুব ক'ষে
কপালকুণ্ডলা তথা দুর্গেশনন্দিনী,
এবং তাহাই দিবানিশি ভাবতেন খুব তিনি।

হরিনাথের বাপের বাড়ি ছিল পাবনায়।
বাঙালদের এক আদিস্থানে—সিরাজগঞ্জ গাঁয়।
শ্বশুরালয় তাঁর হুগলি জেলায়—গরিফায়।
স্ত্রীটি তাঁহার সভ্যা, শিক্ষিতা ও নব্যা,
আরো সে (তা বলতে গেলে সকল কথা খুলে)
পড়েছিলও বছর চারেক বালিকা-ইস্কুলে।

এখন, বালিকারা শিখলে লেখা এবং পাঠ,
ঘটেই ঘটে কিছু কিঞ্চিৎ সামান্য বিভ্রাট :

বাঁধে না আর খোঁপা, চুলটি ফেরায় তোফা,
শাড়ি এত লম্বা হয় যে, বিরক্ত হয় ধোপা।
শান্তিপুরে, বেনারসি ঢাকাই—যায় চুলোয়,
পরে তারা এখন 'বোম্বাই' পঁচিশ হস্ত লম্বায়;
তাও এত কুঁচোয় যে তার ঘোমটাতে না কুলোয়

শেমিজ পরে তার নিচে, আর জ্যাকেট পরে গায়ে;
দেয় না পায়ে আলতা, বরং মোজা পরে পায়ে;
তার উপরে—জুতো···ইত্যাদি বস্তুত
তাদের জ্বালায় চোটে উঠে মাসি, পিসি, মামী,
পিতা মাতা সর্বস্বান্ত—যায় ক্ষেপে হায় স্বামী।

কাজে কাজেই সৌদামিনীর ছিল সে সব দোষ।
কিন্তু তাতে কেউই বড় করত না ক রোষ।
কারণ হরির শ্বশুর, রাধাকান্ত বসুর
ছিল না তো থাঁকতি টাকার, তাই তাঁর এসব কশুর
"ইন্দোঃ কিরণেষ্বিবাঙ্কঃ" যেত সবই ঢেকে।
খরচ দিতে হ'ত না তো কাউকে পকেট থেকে।
(গোলাকৃতি আকার, অসংখ্য গুণ টাকার
তিনিই তো এ-কলিযুগের পরব্রহ্ম সাকার)
আরো, এটা বলে রাখি সৌদামিনী অতি
রূপসী ও সাধ্বী তেরো বর্ষীয়া যুবতী।

মোটে গত হ'ল মাস পনের ষোলো,
দিয়েছেন বিবাহ সত্বর তদীয় মা বাপ,
একটি বারই হরির সঙ্গে চাক্ষুষ আলাপ।

বিয়ের পরেও হরির বধূ থাকেন বাপের বাড়ি,
দেখতে তাই তিনি হেন সৌদামিনী
আসছেন আজ মহোল্লাসে চ'ড়ে রেলের গাড়ি।

শ্রীহরিনাথ দত্ত এক ইণ্টারমিডিয়েট ক্লাসে
ব'সে গাড়ির বেঞ্চের এক ধারে—একটি পাশে,
জানলা দিয়ে ঠায় তাকিয়ে চিবচ্ছিলেন পান,
এবং সত্নর রূপরাশি করতেছিলেন ধ্যান।
(আহা! সে-রূপরাশি—চাহনি ও হাসি
পাবে না ভাই, খুঁজে সারা বৃন্দাবন ও কাশী!)
দেখবেন সেই বঁধুর বদনখানি মধুর,
ডাকবেন খুব ভালোবেসে নামটি ধ'রে সত্নর;
কবেন কী কী কথা, কী কী রসিকতা
করবেন-যে সত্নর সঙ্গে অনেক দিনের পরে—
ভেবে হরিনাথের মুখে হাসি আর না ধরে।

তিনি শ্বশুরবাড়ি গিয়ে ঘরে তুয়োর দিয়ে
প্রথমত ডাকবেন তায় সম্বোধিয়ে—"প্রিয়ে!"
বলবে সত্ন: "নাথ!" পিঠ-পিঠ বলবেন অমনি তিনি:
"প্রাণেশ্বরী! প্রিয়তমে! সত্ন! সৌদামিনি!"
জবাব দেবে সত্ন: "ওগো প্রাণেশ, বঁধু!
হৃদয়বল্লভ! প্রাণাধিক! কান্ত! প্রভো! পতি!
সর্বস্ব! আনন্দ নিলয়!" —ব'লেই সে-যুবতী
তক্ষনি তাঁর আলিঙ্গনে বদ্ধ নিঃসন্দেহ
মূর্ছা যাবেই—সামলাতে তা পার্বে না কো কেহ!

এই ভেবে হায় হরিনাথের আকুল হ'ল প্রাণ,
চক্ষু হল সিক্ত এবং মুখটি হ'ল ম্লান।

ভাঙলে পরে মূর্চ্ছা, উঠে আবেগে অচিরে
বলবেই সে নিয়মমত ভাসি' অশ্রুনীরে :
"নাথ হে! তোমার লাগি' নিশি নিশি জাগি',
কী হয়েছি দেখ না হায়, এ-দেহ কি রহে,
তোমারি বিরহে কান্ত! তোমারি বিরহে,
পাষাণ-হৃদয় নিষ্ঠুর! নিদয়!"
"নিষ্ঠুরে প্রেয়সি"—তিনি বলবেন তায় চুমি',
"কী রূপে যে গিয়েছে দিন—জানো তা কি তুমি?"
এ উহারে আলিঙ্গিয়া নিঃসন্দেহ পরে
কাঁদবে তারা দু চার ঘণ্টা ধ'রে তারস্বরে।
ভাবতে ভাবতে উক্তরূপে বিরহী শ্রীহরি
কেঁদে ওঠে সত্যিই হায় ভেউ ভেউ ভেউ করি'!

পাশে একটি ভদ্র ব্যক্তি—জানি না লোকটি কে—
অতি ফরসা রং একহারা তার ঢং,
টস্‌-টসে সে বৃদ্ধ, যেন আম্র সিদ্ধ,
বারম্বার সেই ভাবে-মগ্ন হরিনাথের দিকে,
চেয়ে চেয়ে দেখছিলেন তার উক্ত সকল ব্যাপার
ভাবছিলেন কি লোকটার এ-লক্ষণ সব ক্ষ্যাপার!
পরে যখন দেখলেন যে—আর্শি বাহির ক'রে
হরি চোখের সাম্‌নে সেটা আধটি ঘণ্টা ধ'রে

চেয়ে তারই পানে অতৃপ্ত নয়ানে
মুখটি টিপে হাসেন, এবং আঁচড়ান তাঁর দাড়ি,
পালিশ-করা জুতি, কালাপেড়ে ধুতি—
বুঝে নিয়ে ব্যাপার কতক—দূরের বেঞ্চি ছাড়ি',
বসলেন অবিলম্বে হরিনাথের কাছে এসে।
অমনি আলাপ হ'ল সুরু—দু তিন বার কেশে :
মহাশয়ের নাম ? ও নিবাস ? হয় কোথা তাঁর থাকা ?
কোথা যাবেন ? কী করেন ? আর পান বা কত টাকা ?
ইত্যাদি অগুন্তি প্রশ্নে করি' সুতদন্ত
জেনে নিলেন বুড়ো ব্যাপারটি নিগূঢ় ;
তার নাম ও বাড়ি, নক্ষত্র ও নাড়ী—
হরিনাথের নববধূর বয়সটি পর্যন্ত।

এখন, বুড়োর হাতের উপর ব'সে র'য়ে র'য়ে
ঝুলছিল সময়টা যেন বেশি ভারি হ'য়ে।
করলেন তাই মহাশয়টি মনস্থ অগত্যা
সময়টাকে নিয়ম'ত করিবারে হত্যা।
তাই শুধালেন তিনি আবার : "পঁহুচিবেন কটায় ?"
জবাব দিলেন হরি : "তা—রাত আটটা কিম্বা নটায়।"
"চিঠি লিখেছেন ?"—"ইশ্ ! বাঙাল পেলেন না কি আমায় ?
চিঠি লিখে শ্বশুরবাড়ি যায় কবে কেউ জামাই ?"
"সে কি বলেন ? জানেন—যেতে হবে কত রাত ?
ঘুমিয়ে হয়ত পড়বে সবাই—পাবেন না যে ভাত !"
—"হয় কখনো কি এ ? একটি বছর ঘিয়ে
পায় না খেতে নতুন জামাই শ্বশুরবাড়ি গিয়ে ?

যাব এমনি হঠাৎ যে, সেই হর্ষের ঘোর ঝড়ে
বিরহিণী সদ্য আমার মূর্ছা যাবে প'ড়ে।"
এই ব'লে হরিনাথ আবার আয়না ক'রে বের
দেখে নিলেন গর্বে নিজের চেহারাটি ফের।

তখন ভদ্রলোকটি ছেড়ে ও সব কথা বাজে
হরিনাথের কাছে ঘেঁসে আরো, রসিক ধাঁজে
বললেন একটু কেশে, মৃদু মন্দ হেসে :
"মহাশয়ের চেহারাটি অতীব সুচারু,
মনে তো পড়ে না এমন দেখেছি যে কারু;
(তবে) একটি কথা খাঁটি : এমন পরিপাটি
চেহারাটি দাড়িতেই যে ক'রে দিল মাটি।"
হরিনাথের সে-বিষয়ে হ'ল কিছু সন্দ :
"কেন মশয়? দাড়িটাকে কিসে দেখেন মন্দ?"
—"জানেন না কি কিসে? এহেন মিশমিশে
কালো দাড়ি রাখে শুধু বাবুর্চি সহিসে
এহেন কোঁকড়ান ঘন, এত লম্বা দাড়ি—
রাখে মুদ্দফরাস মুচি, দর্জি এবং হাড়ি।
এখনকার সব দাড়ির ফ্যাশন—করেন নি কি পাঠও :
দাড়ি হবে ছুঁচলো, সোজা, কটা এবং খাটো।
রামোচন্দ্র! হেন দিশি এবং ধেনো
দাড়ি বুদ্ধিমান হয়েও রাখতে গেলেন কেন?
এক্ষুনি হরিনাথবাবু, দাড়ি ফেলে দেন-ও।"

হায়, শুনে এই সব হরি তো নীরব!
ভাবতে থাকেন : "তাই তো! কেমন ক'রে মায়া ছাড়ি'
দিই ফেলে বা এত দিনের এমন পোষা দাড়ি?"

ভদ্রলোকটি তখন ক'রে আন্দাজ তার সন্দ
বললেন ঈষৎ হেসে, আবার একটু কেশে :
"মানে বিশেষত শিক্ষিতা স্ত্রী যত
দাড়ি ফাড়ি একেবারেই করে না পছন্দ ;
অতিশয়ই রাগে এবং অতিশয়ই চটে।"
বললেন হরিনাথ তখন ভড়কে গিয়ে : "বটে ?
সত্যি ?"—"নয় কি মিথ্যে ? মিথ্যে কইবার আমার মানে
এ-কথা কলকাতায় বলুন দেখি কে না জানে ?"
"কিন্তু এ যে বহুদিনের !"—বুলিয়ে তার হাত
আর্শি সামনে ধরি', বললেন আবার হরি :
"কত যত্নের একে—ফেলে দেব অকস্মাৎ ?"
"দেবেন না তো দেবেন না কো। হ'লে একটু সাফ—
সুন্দর ঐ বদনখানি—আমার তাতে লাভ ?"
এই ব'লে সে-বৃদ্ধ—যেন একটু চটে গিয়ে—
হেলান দিলেন, মুখটি ঢেকে হাতের কেতাব দিয়ে।

"তাই তো তাই তো"—ব'সে আবার ভাবতে থাকেন হরি :
"কামাব—কি কামাব না ? এখন যে কী করি ?"
ভদ্রলোকটি বললেন হঠাৎ বইটি ক'রে বন্ধ :
"আর ও ছি ছি, একী আসুন দেখি দেখি !
দু এক গাছ যে পাকা ! হোন্ তো দেখি বাঁকা !
রামচন্দ্র ! দাড়িতে কি এমনও দুর্গন্ধ !
ওয়াক্ ! ওয়াক্ ! ওয়াক্ !" —"সত্যি নাকি ?"—"ওয়াক্ !
কী দুর্গন্ধ ! মাগো ! আপনি বাঙালই নিঃসন্দ !"
—"বলেন কী ?"—"ছিঃ ! দেখতে পান না ? আপনি বুঝি অন্ধ ?

এ-দাড়িও রাখে ? ছ্যা ছ্যা ! নিয়ে এমন দাড়ি—
সত্যি কথা বল্‌তে কি তা—গেলে শ্বশুরবাড়ি,
ভাববে সবাই আপনাকে ডোম, মুদ্দফরাস হাড়ি !
ওয়াক্—ওয়াক্—অথুঃ আপনার সেই সতু
দেখবে যখন দাড়ি অমন—এবং শুঁকবে যবে—
চুমো খাওয়া দূরে থাকুক—কথাও না ক'বে।"

এবার হলেন শ্রীহরিনাথ সম্পূর্ণ পরাস্ত
মহোৎসুক্যে বললেন হ'য়ে বিষম রকম ব্যস্ত :
"মশয় ! দেখুন তবে এর কী উপায় হবে ?
এ দাড়িটা কামাই কোথা ?"—"কেন, বর্ধমান ?"
"সেখানে কি নাপিত আছে ?"—"কত গণ্ডা চান ?"
তখন তো ঠিক্ হ'ল, থামলে বর্ধমানে গাড়ি
হরিনাথ সেই অবসরে কামিয়ে নেবেন দাড়ি।

ঘট ঘট ঘট—শোঁ··· ঘটক ঘটক—পোঁ !
বর্ধমানে ক্রমে গাড়ি এল করে চোঁ।
যেমন বর্ধমানে এসে থামল রেলের গাড়ি,
নামলেন হরিনাথ অম্‌নি—কামাতে তাঁর দাড়ি।
বহু অন্বেষণে তখন সে-স্টেশনে
পেলেন একটি নাপিত—কিন্তু কার কথা বা কে শোনে ?
কারণ সেটি যে বারোশো বিরাশি সাল—যে-সনে
নবীনের হয় দ্বীপান্তরটি বিচারেতে সেশনে ;
সবাই সেই গল্পে-মুখর—পড়েছে ঢিঢিকার !
অনেক অনুনয়ে নাপিত কথঞ্চিৎ তো স্বীকার।

(এখন) দাড়ি অতি প্রবীণ (এবং) নাপিত অতি নবীন,
বাকি সময় আটটি মিনিট।—"এত তাড়াতাড়ি"
ভাবল পরামানিক : "যাবে কামানো কি দাড়ি ?"
যা হোক্, সে-বিষয়ে ভাবতে গেলেই নিজের ক্ষতি :
(নাপিতেরো ছিল সেদিন টানাটানি অতি)
বলল : "একটি টাকা নেবো কামাতে এ-মস্ত
প্রবীণ দাড়ি।" হরি স্বীকার ; তায় করি' টাঁকস্থ,
পরামানিক ভাই ক্ষুরটি ক'রে তাঁহার বাহির
বসলেন তো করতে ত্বরিত নৈপুণ্য জাহির।
তারপরে তৎক্ষণাৎ কচাৎ কচাৎ কচাৎ
কাঁচিতে বাঁদিকের দাড়ি হ'ল তো তার নিপাত।
পড়ল তাতে সাবান জল, আর পড়ল ক্ষুরে শান :
ঘ্যাঁশ ঘ্যাঁশ ঘ্যাঁশ ফ্যাঁশ ফ্যাঁশ ফ্যাঁশ
একটু একটু ক'রে দাড়ি হ'ল নিপাত—আর
হরিনাথের বাঁদিকের মুখ হ'ল পরিষ্কার।

এখন নাপিত হাঁচি' যেমনি লাগায় কাঁচি
ডান দিকে তার হায়! অমনি শোনা যায় :
বর্ধমানের "ঢং ঢং ঢং" ঘণ্টা তিনটি বার
শোনা গেল সেটি অতি প্রচণ্ড ও সাফ!
(পাঠক মশয়! এ-সময়টা করবেন আমায় মাফ
যদি গোলে ছন্দ হয় একটু মন্দ!)
হরি তো আর নেই—দিলেন একটি দারুণ লাফ
চাদর টাদর ফেলে লোকজন সব ঠেলে
উঠলেন এসে ঊর্ধ্বশ্বাসে কোনো মতে রেলে।

এখন বলি এখানেতে, সত্য কথাটা কী
তখনও সময়ের ছিল পাঁচটি মিনিট বাকি।
সেটি মোটে প্রথম ঘণ্টা। কে না বলুন জানে—
দুবার ঘণ্টা চিরকালটা পড়েই বর্ধমানে ?
রইলেন পাঁচ মিনিট হরিনাথ তো ব'সে খাড়া ;
বাজল আবার "ঢং ঢং ঢং" তিনবার—তা ছাড়া
করল গাড়ি শোঁ তারপরেতেই পোঁ
ভক্ ভক্ ভক্ ভট ঘটক ঘটক ঘট্
ইষ্টেশনের প্লাটফর্ম সে ছাড়িয়ে গেল চট্।
গেল সে-রেলগাড়ি বর্ধমান হায় ছাড়ি'
র'য়ে গেল আধ-কামানোই হরিনাথের দাড়ি।

তখন ভদ্রলোকটি হেসে হরির কাছে এসে,
বললেন : "একী মশয় ! ক'রে ফেললেন আজ একী ?"
রেগে জবাব দিলেন হরি : "মশয় ! দেখুন দেখি !
আপনারি কুপরামর্শে দাড়ির অবস্থাটি !"
"তাই তো ! একেবারে দাড়ি করেছেন যে মাটি !
এমনও কি করে ?—তবে হয়েছে এক লাভ,
মুখের তবু কতকটা তো হয়ে গেল সাফ !"
ব'লে তারস্বরে হো হো হো হো ক'রে
ভদ্রলোকটি হাসতে থাকেন দশটি মিনিট ধ'রে !

রইলেন হরিনাথ ব'সে চুপটি করে, রেগে ;
হুগলিতে যেই থামল গাড়ি—অতি তীব্র বেগে,
ট্রেনটি থেকে নেমে, একটুও না থেমে,—
(সবাই তাকায় মুখের পানে—সাহেব এবং মেমে)

দৌড় দিয়ে ভাড়া ক'রে একটি এক্কা গাড়ি,
হরিনাথ—আর কথাটি নেই—চোঁচা দিলেন পাড়ি।

*　　　*　　　*

রাত্রি হবে দুপুর,　　　বাড়ির মধ্যের উপর
সৌদামিনী এবং ছোট বোন তার—এই দু'য়ে
তাদের বৃদ্ধা দিদিমায়ের দুটি পাশে শুয়ে
অকাতরে ঘুমিয়ে আছে মাটির উপর প'ড়ে।
বাড়ি অতি স্তব্ধ　　　নেই কো সাড়া শব্দ—
হেন কালে উত্তরিলেন হরি নৌকা চ'ড়ে;
হ'ল দেরি বেকুফিতে হরির নাওয়ের মাঝির—
তাইতে হরি শ্বশুরবাড়ি দুপুর রাতে হাজির।

বিষম হুড়োহুড়ি এবং দারুণ ডাকাডাকি,—
উঠল জেগে সবাই, ভেবে—ডাকাত পড়ল না কি?
চাকরেরা উঠে সবাই যষ্টি　ক'রে খাড়া,
হতভাগ্য হরিনাথকে করল বেগে তাড়া।
কর্তা বাবু উঠে,　　　ছাদে এলেন ছুটে—
কড়াক্কড় এক হুকুম দিলেন একতলায় না নামি' :
"মারো বেদম!　বজ্জাৎ চোর!"—"আমি, আমি, আমি!"
ক'রে হরিনাথ চিৎকার বললেন—"আহা! এসে—
আমি—আমি—" আর সে আমি—তার পশ্চাদ্দেশে
পড়ল আবার লাঠি,　　　যুদ্ধে নাহি আঁটি,
হরিনাথ তো উপুড় হ'য়ে নিলেন তখন মাটি।
সবাই তাকে বাঁধে,　　　পরে, নিয়ে কাঁধে
নামিয়ে তাকে বাবুর কাছে তাকে মনের সাধে

দিল মনঃপূত জোরে ছ দশ জুতো
কর্তা হাঁকেন : "বেটা ! রাখে তোরে কেটা ?
নামটা কী রে তোর ? বল্ তো শালা চোর !
দুপুর রাতে ডাকাতি ?—কে, বল্ না শালা আমায় !"
"ডাকাতও নই, নই নই চোর, শালাও নই—জামাই ।"
বললেন অবশেষে হরি ক্রমশ হাঁফ ছাড়ি' ।
"জামাই ?—তবে কোথা গেল একটা দিকের দাড়ি ?
বেটা ষণ্ডামার্ক গুণ্ডা ! আবার বলে জামাই, এঃ—
আধখানা তোর দাড়ি কোথায় ?"—"আজ ফেলেছি কামায়ে ।"

পরে পাহাড় সমান, হরি দিলেন প্রমাণ—
যে তিনি ঠিক ডাকাত নহেন, জামাইই বস্তুত ।
তখন শ্বশুর মশয় হলেন দারুণ অপ্রস্তুত, ও
লাজে যেন কাঁথা চুলকিয়ে তাঁর মাথা
বলেন : "বটে বটে ! কিন্তু এমনও কি করে ?
চিঠি পত্র না লিখে—এ রাত্রি দ্বিপ্রহরে—
ছিঃ ছিঃ রাম রাম ! বলতেও হয় নাম !
লাঠি খেয়েও 'আমি' ছাড়া কথাও কি না সরে ?
তাতে আধেক দাড়ি লোপাট ! এমনও কি করে ?
এখনি অগত্যা হ'ত যে গো-হত্যা—
মানে—যা হোক শোও গে বাছা বাড়ির ভিতর গিয়ে ।"
স্বগত : "এ-গরুর সঙ্গেও দিইছি মেয়ের বিয়ে !"

হরিনাথ তো শুলেন গিয়ে বিনা কোনো কথা :
"সমাদরের সুরু হ'ল কিছু গুরু
হবে এটা হুগলি জেলার সমাদরের প্রথা,

খেতে দিলেও বোঝা যেত—হ'ত কড়ামিঠে
তা দিলে না মোটে, মরি খিদের চোটে,
পেটে পড়ল দ', লাঠি আর জুতো পড়ল পিঠে।
যা হোক, দেখি—প্রিয়ার মুখপঙ্কজ নেহারি'
পেটের, পিঠের জ্বালা যদি ভুলতে এখন পারি।"
ভাবছেন হরি এম্‌নি শুয়ে বিছানার উপরে।
ওদিকে সদুর মা গিয়ে তাঁর সদুকে জাগিয়ে,
হরিনাথের ঘরে দিলেন আদর ক'রে পাঠিয়ে!

প্রবেশিলেন ঘরে সদু, সহ হৃৎকম্প;
অমনি হরি দিয়ে একটি ছোটখাটো লম্ফ,
তাকে বুকে নিয়ে বললেন: "অয়ি প্রিয়ে!"
হ'ল না তাঁর করতে বেশি সম্ভাষণ সুমধুর—
"ও গো মেরে ফেললে মাগো!"—মূর্চ্ছা হ'ল সদুর।
সদুর মাতা উঠে এলেন ঘরে ছুটে,
দেখলেন—তাঁর সৌদামিনী ধরায় প'ড়ে লুটে!
আর দাঁড়িয়ে জামাইটি তার মুখটি করে ফাঁক,
(একটি দিকে দাড়িশূন্য)—নিস্পন্দ, নির্বাক্!
দেখে গিন্নি আগুন, তেলে যেন 'বাগুন',
বললেন হেঁকে বিষম রেগে: "হনুমানটা কে রে?
সোনার বাছা সদুকে তুই ফেলেছিস্ যে মেরে!
সোনার মেয়েটিরে বিয়ে দিল কি রে
কায়েতের এক নিষ্কর্মার ঢেঁকি—আ মরি রে!
বাবুই তো ঘটালো আপদ্—এ তো ছিল জানাই!
আমি তাই তো বরাবরই করেছিলাম মানাই!

বেরো বাঁদর, বাড়ি থেকে!—দাঁড়িয়ে তবু? বেরো!
দেখছিস কী চেয়ে? আহা সোনার মেয়ে!
কপালেরি গেরো গো সব কপালেরই গেরো।"
তখন সতুর মা মুখে তার জলের ছিটে দিয়ে,
জাগিয়ে তু'লে সঙ্গে ক'রে চ'লে গেলেন নিয়ে।

দেখে ব্যাপার এই হরি তো আর নেই!
খেয়ে উক্ত তাড়া, দিলেন না কো সাড়া,
ভাবতে লাগলেন একেবারে সঙের মত খাড়া
গেল ভেঙে, হায় হায়, তাঁর সারা পথের আশা!
ভুলে গেল সৌদামিনী এত ভালোবাসা?
দুর্গেশনন্দিনী কিম্বা মৃণালিনী
কেউ কোনদিন ধপাৎ ক'রে স্বামী-দরশনে
নিয়েছিল মাটি যে—কই, পড়ে না তো মনে!
চাইলে না কো ভালো ক'রে কইলে না কো কথা!
আর, জামাইয়ের এ কী রকম সমাদরের প্রথা?
আহারের সঙ্গে তো মোটে নেই কো নামগন্ধ!
আদর সুরু লাঠি জুতায়—শেষে অর্ধচন্দ্র!
যা হোক এসব ভেবে কি জানি, যান ক্ষেপে
পাছে তিনি—ছাড়ি' সাধের শ্বশুরবাড়ি,
জেগে সারা রাত, সকালে কামিয়ে বাকি দাড়ি
পরের দিনই দিলেন জামাই ফের পাটনায় পাড়ি।

মর্ম

প্রথমত : নিজের কার্য ফাঁকি দিয়ে বড়ো
পোড়ো না কো উপন্যাস—আর যদি কিছু পড়
নিতান্তই—পোড়ো ভালো কাজের বই। ধেনো
উপন্যাসের অধিকাংশই গাঁজাখুরি জেনো।

দ্বিতীয়ত : দাড়ি কভু তাড়াতাড়ি
কামিও না কো—চ'লে যায় তা যাক না রেলের গাড়ি !
না হয় একদিন হ'লই দেরি যেতে শ্বশুরবাড়ি।

তৃতীয়ত : কাউকে বেশি করো না বিশ্বাস,
এবং নিজের বাড়ির কথা কোরো না কো ফাঁস
যাহার তাহার কাছে—এ জগতে আছে
হরেক রকম মানুষ, সেটা দেখে নিও শিখে—

শেষত : যেও না কোথাও চিঠি নাহি লিখে।

কলি যজ্ঞ

(অনুষ্টুপ্ ছন্দ)

ব্যারিস্টার উকীলাদি মহাযজ্ঞ সমাধিলা।
ভারতে ভারি অদ্ভুত আশ্চর্য মহতী সভা॥
আসিলা সে মহাযজ্ঞে মহারাষ্ট্রীয় পশ্চিমে।
মাদ্রাজী উড়িয়া শীখ বঙালী চ দলে দলে॥

কাহারো পরনে কুর্তী, কাহারো উড়ুনী উড়ে।
কাহারো বা ঝুলে চাপ্‌কান্‌, কাহারো সাহিবী ধড়া ॥
কাহারো সম্মুখে টেড়ী কাহারো পিছনে টিকী।
কাহারো উপরে ঝুণ্টী—কা কস্ত পরিবেদনা ॥
এরূপ বিবিধা মূর্তি সমাগত সভাতলে।
বক্তৃতা করিয়া—বাবা লড়াই করিতে ফতে ॥
তন্মধ্যে মুখসর্বস্ব বঙালী হি পুরোহিত !
রেজলূশন-নির্মাণে—বক্তৃতায় মহারথী ॥

এ-হেন হি মহাযজ্ঞে হৈল হে বক্তৃতা সুরু।
ইংরাজের মহা কেচ্ছা ইংরাজী রেজলূশনে ॥
ইংরাজীতে কথাবার্তা ইংরাজীতে চ বক্তৃতা।
প্যাণ্ডলের তলে আজি ইংরাজীতে খদী ফুটে ॥
"বাহবা বাহবা" শব্দ সমুত্থিত সভাস্থলে।
"বাহবা বাহবা" শব্দে করতালি চটাপট ॥
এরূপ শুদ্ধ ইংরাজী এরূপ উপমা ছটা।
"এরূপ শব্দ-বিন্যাস এরূপ দ্রুত বক্তৃতা ॥
সিসিরো, পিট, বর্কাদি কাছাকাছি ত নিশ্চয়।"—
একবাক্যে মহাহর্ষে বলিলা সব কাগজে ॥

চা-পান-নিরত প্রাতে ইংরাজ লাট সাহিব।
পড়িয়া এ-মহাবার্তা আতঙ্কে ত বিমূর্ছিত ॥
উঠিয়া দীর্ঘ নিশ্বাসি' বলিলেন অতঃপর।
"এ-জাতিকে দমে' রাখা দেখিতেছি অসম্ভব ॥
উঠিবে উঠিবে এরা ঠেকানো বড় দুষ্কর।
বুঝি যে এখন শ্রেয় মানে মানে পলায়ন ॥"

লাট সাহিব ইত্যাদি, করি উক্ত বিবেচনা।
পোঁটলা পুঁটলী বাঁধি স্বদেশে দেন চম্পট ॥
পর প্রাত হ'তে রাজ্য আর্য জাতির সংস্থিত।
পর প্রাত হ'তে কীর্ণ হিন্দুধর্ম সনাতন ॥
বিস্তীর্ণ আর্য সাম্রাজ্যে সবার সম্মতিক্রমে।
রেজলুশন নির্মাতা বঙালী হইলা প্রভু ॥
আশ্চর্যরূপ রাজত্ব বঙালীর বলে সবে।
কেবল বক্তৃতাজোরে করে রাজ্য চবৈতুহি ॥

একদা আসিয়া আফ্‌গান্‌ আক্রমিল হি ভারত।
মহাকাবু সবে খেয়ে বঙালী বক্তৃতা হুড়া ॥
তৎপরে রুবিয়া আসি' গ্রাসিতে দেশ উদ্যত।
বঙালী বক্তৃতা-চোটে করে দেশে পলায়ন ॥
বঙালী বক্তৃতা শব্দে কাঁপে ইংলণ্ড জর্মনী।
কাঁপে ফরাসী মার্কীন কাঁপে সসাগরা ধরা ॥
ধন্য ধন্য প'ড়ে গেল সর্বত্র এ-মহীতলে।
ভরিয়া গেল এ-দেশে মীটিঙ রেজলুশনে ॥

একদা তু বঙালীর হৈল হে ঘোর মুস্কিল।
কূটতর্ক উঠে এক মহাদ্বন্দ্ব ঘরে ঘরে ॥
উঠিল কুটিল প্রশ্ন সমস্যা জটিলা অতি।—
"শাস্ত্রীয় কি অশাস্ত্রীয় কচুপোড়া হি ভক্ষণ ॥"
আবার হইলা দেশে ডাকিতা মহতী সভা।
সমাগত সেই প্রশ্ন বিচার করিতে সবে ॥
আবার সে-সভাস্থানে হৈল হে বহু বক্তৃতা।
আবার বাহবা শব্দে করতালি চটাপট ॥

কিন্তু সেই মহাপ্রশ্ন মীমাংসা হইবে কিসে।
সবাই বক্তৃতাদক্ষ—সবাই বক্তৃতা করে ॥
পরিশেষে সভাস্থানে সবাই অপরাজিত।
দিলে হি বক্তৃতা চোটে উড়াইয়া তো পরস্পরে ॥
বঙালী মহিমা কীর্তি কলাপ কাহিনী যদি।
শুন মন দিয়া বাবা!—পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে ॥

কর্ণ বিমর্দন কাহিনী

(পজ্ঝটিকা ছন্দ)

জানো না কি কদাচন মূঢ়!
কর্ণ বিমর্দন মর্ম কি গূঢ়?
কর্ণ দিবার কি কারণ অন্য,
যদি না তা আকর্ষণ জন্য?
যদি বল সেটা শ্যালী ভিন্ন
অপর করে নয় আদরচিহ্ন;
তবু যদি সাহিব অঙ্গে সঙ্গে
টানে, হয় তা মধুর—বিকল্পে।
অন্তত নাসা রক্ষার্থে, সে
কানমলা হয় গিলিতে হেসে।
যাবা সে-দশ-ইঞ্চি গ্রন্থে—
বিপুল বিশাল প্রকাণ্ড হস্তে—

শূকর-গো-মৃগমাংসে পুষ্ট—
আছে রক্ষা হইলে রুষ্ট ?
কর্ণাকর্ষণ অতিশয় তুচ্ছ,
যা কয় সাহিব, নাড়িব পুচ্ছ,
"হজুর হজুর" বলি' জীবনমরণে
রব' পড়ি' ইস্তুনিন্দিত চরণে ;
—রহিও খুশি, ঘুঁষি আশ্‌টা, রাগে
মেরো না কো কেবল নাকে।
ও-ঘুঁষি পড়িলে কর্ণে, স্তব্ধ
ত্রিভুবন—শুনি শুধু ঝাঁ ঝাঁ শব্দ !
ও ঘুঁষি পড়িলে গণ্ডে জোরে,
একেবারে মাথা ঘোরে !
কাণা নিশ্চিত পড়িলে চক্ষে !
ভূমিবিলুণ্ঠিত পড়িলে বক্ষে !
পড়িলে দন্তে, বিভয় পংক্তি !
পড়িলে নাকে রক্তারক্তি !
শুধু ও-অঙ্গুলি কুড়ল স্পর্শে
শ্রবণে তো প্রভু অমিয়া বর্ষে !
বসিয়া বসিয়া নিজঘর মধ্যে
লেখা সোজা গদ্যে পদ্যে—
"সমুচিত, তুলিয়া ঘুঁষি নিজহস্তে
মারা বেগে অরাতি মস্তে !"
জানো না সে-স্থানে, একা
লাগে প্রথমত ভেবাচেকা ;
যখন পরাজয় খলু অনিবার্য—
তখন কি মুষ্টি বুদ্ধির কার্য ?

না হইলে সমসস্তিন অবস্থা,
যাক্যে বীরত্ব হি অতি সস্তা।
মাখি তৈল ঘন কুঞ্চিত কেশে,
স্নানস্নিগ্ধ উদরটা, ঠেসে
ডালে ভাতে করিয়া পূর্ণ
গণ্ডে পানে ভরিয়া তূর্ণ
চাপকান পরিয়া আপিস নিত্য
আসি হি পুরুষানুক্রম ভৃত্য,
নাকে কর্ণে, চুপে চুপে
রক্ষা করিয়া, কোনোরূপে
সংসারেতে টিকিয়া আছি—
(রহি না) ঘুঁষী ফুঁষীর কাছাকাছি॥

রমণীর মুখ

কি সুন্দরই গড়েছিলে রমণীর মুখ,
বিধি রমণীর মুখ!
মুখময় মাখা প্রেম; গোঁফ নাই মোলায়েম,
—ঈষৎ বেহায়া আর ঈষৎ লাজুক—
বিলম্বিত চারু কেশ, সিঁথিকাটা শিরোদেশ;
(বিদ্যা কি বুদ্ধির লেশ নাই বা থাকুক)
বাঁকা ভুরু, টানা চোখ, (কিম্বা টানা নাই হোক,
চাহনিতে সেরে নেয় বিধাতার চুক!)

গণ্ড দুটি পরিপাটি ; অনত্যুচ্চ নাসিকাটি ;
শ্মশ্রুহীন সুগঠিত কোমল চিবুক ;
ওষ্ঠ দুটি পুরোভাগে, দুইটি কমল জাগে
সর্বদা তাম্বূলরাগে করে টুক্ টুক্ ।
স্নেহসরলতা মাখা, যেন চিত্রপটে আঁকা,
দেখিলে করুণ স্নেহে ভ'রে ওঠে বুক ।
আধ ঢাকা ঘোমটায়, আধখানি দেখা যায় ;
ভাগ্য ব'লে মানি তার দেখি যেইটুক !
যেইটুকু থাকে বাকি কল্পনায় গ'ড়ে থাকি,
ভাবী আশা দেখিবার রাখি জাগরূক !
—পৃথিবীর সুখ প্রায় অর্ধেক তো কল্পনায়—
অপরার্ধ মাত্র তার বাস্তবিক সুখ ।

সমালোচক

টিয়া বলে "গাইতে কেহই কিছুই তো না জানে ।"
দোয়েল কোকিল ঘুঘু শ্যামা যখন ধরে গানে,
টিয়া কাছে গিয়ে অমনি করে চেঁচামিচি,
এবং তার (এ) ডানা তুলে তারে বলে "ছি ছি ।"
পিকেরা একদা মিলে অনেকখানি ভেবে,
যুক্তি ক'রে করজোড়ে কহে শুকদেবে,—
"প্রভুর আলোচনা যেরূপ গুণের পরিচায়ক,
প্রভু নিশ্চয় নিজে একটা উঁচুদরের গায়ক ;

প্রভু একবার দয়া ক'রে গেয়ে দেখান দিকি,
আমরা (শিখি নি তো কিছুই) শুনে কিছু শিখি।"
মিয়া মাথা চুলকোয়, ভেবে পায় না বল্‌বে কি যে ;
শেষে কহে, "মহাশয়গণ　　আমি অর্থাৎ নিজে—
বড় একটা গাই না—তবে—বল্‌তে বা কি হাসি—
মহাশয়গণ আমি খাসা ছি ছি কর্ত্তে জানি।"

মন্দ্র

মন্দ্র

মন্দ্র প্রকাশিত হ'লে রবীন্দ্রনাথ লেখেন :

" 'মন্দ্র' কাব্যখানি বাংলার কাব্যসাহিত্যকে অপরূপ বৈচিত্র্য দান করিয়াছে। ইহা নূতনতায় ঝল্‌মল্ করিতেছে এবং এই কাব্যে যে ক্ষমতা প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা অবলীলাকৃত ও তাহার মধ্যে সর্বত্রই প্রবল আত্ম-বিশ্বাসের একটি অবাধ সাহস বিরাজ করিতেছে।

সে সাহস কি শব্দনির্বাচনে, কি ছন্দোরচনায়, কি ভাববিন্যাসে সর্বত্র অক্ষুণ্ণ। সে সাহস আমাদিগকে বারংবার চকিত করিয়া তুলিয়াছে—আমাদের মনকে শেষ পর্যন্ত তরঙ্গিত করিয়াছে।

কাব্যে যে-নয় রস আছে, অনেক কবিই সেই ঈর্ষ্যান্বিত নয় রসকে নয় মহলে পৃথক্ করিয়া রাখেন,—দ্বিজেন্দ্রলাল বাবু অকুতোভয়ে এক মহলেই একত্রে তাহাদের উৎসব জমাইতে বসিয়াছেন। তাঁহার কাব্যে হাস্য, করুণা, মাধুর্য, বিস্ময়, কখন্ কে কাহার গায়ে আসিয়া পড়িতেছে, তাহার ঠিকানা নাই।

এইরূপে 'মন্দ্র' কাব্যের প্রায় প্রত্যেক কবিতা নব নব গতিভঙ্গে যেন নৃত্য করিতেছে, কেহ স্থির হইয়া নাই ;—ভাবের অভাবনীয় আবর্তনে তাহার ছন্দ ঝকৃত হইয়া উঠিতেছে এবং তাহার অলঙ্কারগুলি হইতে আলোক ঠিকরিয়া পড়িতেছে।

কিন্তু নর্তনশীলা নটীর সঙ্গে তুলনা করিলে 'মন্দ্র' কাব্যের কবিতাগুলির ঠিক বর্ণনা হয় না। কারণ ইহার কবিতাগুলির মধ্যে পৌরুষ আছে। ইহার হাস্য, বিষাদ, বিদ্রূপ, বিস্ময়, সমস্তই পুরুষের—তাহাতে চেষ্টাহীন সৌন্দর্যের সঙ্গে একটা স্বাভাবিক সবলতা আছে। তাহাতে হাবভাব ও সাজসজ্জার প্রতি কোন নজর নাই।

বরং উপমা দিতে হইলে শ্রাবণের পূর্ণিমারাত্রির কথা পাড়া যাইতে পারে। আলোক এবং অন্ধকার, গতি এবং স্তব্ধতা, মাধুর্য ও বিরাট্ ভাব আকাশ

জুড়িয়া অনায়াসে মিলিত হইয়াছে। আবার মাঝে মাঝে এক-এক-পসলা বৃষ্টিও বাতাসকে আর্দ্র করিয়া ঝর ঝর শব্দে ঝরিয়া পড়ে। মেঘেরও বিচিত্র ভঙ্গী;—তাহা কখনো চাঁদকে অর্ধেক ঢাকিতেছে, কখন পূরা ঢাকিতেছে, কখনো বা হঠাৎ একেবারে মুক্ত করিয়া দিতেছে—কখনো বা ঘোর ঘটায় বিদ্যুতে স্ফুরিত ও গর্জনে ধ্বনিত হইয়া উঠিতেছে।

দ্বিজেন্দ্রলাল বাবু বাংলাভাষার একটা নূতন শক্তি আবিষ্কার করিয়াছেন। প্রতিভাসম্পন্ন লেখকের সেই কাজ। ভাষাবিশেষের মধ্যে যে কতটা ক্ষমতা আছে, তাহা তাঁহারাই দেখাইয়া দেন—পূর্বে যাহার অস্তিত্ব কেহ সন্দেহ করে নাই, তাহাই তাঁহারা প্রমাণ করিয়া দেন! দ্বিজেন্দ্রলাল বাবু বাংলা কাব্য-ভাষায় একটি বিশেষ শক্তি দেখাইয়া দিলেন। তাহা ইহার গতিশক্তি। ইহা যে কেমন দ্রুতবেগে, কেমন অনায়াসে তরল হইতে গভীর ভাবায়, ভাব হইতে ভাবান্তরে চলিতে পারে, ইহার গতি যে কেবলমাত্র মৃদুমন্থর আবেশ-ভারাক্রান্ত নহে, তাহা কবি দেখাইয়াছেন।

ছন্দ সম্বন্ধেও যেন স্পর্ধাভরে কবি যথেচ্ছ ক্ষমতা প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহার "আশীর্বাদ" ও "উদ্বোধন" কবিতায় ছন্দকে একেবারে ভাঙিয়া-চুরিয়া উড়াইয়া দিয়া ছন্দোরচনা করা হইয়াছে। তিনি যেন সাংঘাতিক সঙ্কটের পাশ দিয়া গেছেন—কোথাও যে কিছু বিপদ্ ঘটে নাই, তাহা বলিতে পারি না। কিন্তু এই দুঃসাহস কোন ক্ষমতাহীন কবিকে আদৌ শোভা পাইত না।"—'বঙ্গদর্শন', কার্তিক, ১৩০৯—(আধুনিক সাহিত্য

শ্রীসজনীকান্ত দাস ঠিকই লিখেছেন :

"দ্বিজেন্দ্রলালের একান্ত বৈশিষ্ট্য তাঁহার পৌরুষ। কাপুরুষতার প্রতি যথোচিত ঘৃণা এবং ধিক্কারের দ্বারা তাহা গৌরববিশিষ্ট।" ইহাই প্রধানতঃ বিপরীত প্রকৃতিবিশিষ্ট বাঙালী সমাজে তাঁহাকে অপ্রিয় করিয়াছে। বাঙালীর প্রকৃতি এখন অনেক বদলাইয়াছে ; মনে হয়, দ্বিজেন্দ্রলালকে এ-যুগের বাঙালী সমাদর করিতে পারিবেন। সেই ভরসাতেই তাঁহার রচনাবলী প্রকাশিত হইল।" ('দ্বিজেন্দ্রলাল গ্রন্থাবলী'—সাহিত্য পরিষৎ—ভূমিকা)

মন্ত্রের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কবিতাগুলিই এখানে সংগৃহীত হ'ল। যাঁরা অন্য কবিতাগুলি পড়তে চান তাঁরা সহজেই সাহিত্য পরিষদের গ্রন্থাবলীতে সেগুলি পড়তে পারেন।

এ-সংকলনে দ্বিজেন্দ্রলালের "রাধার প্রতি কৃষ্ণ" কবিতাটি সম্বন্ধে বক্তব্য এই যে এ-কবিতাটি তিনি তাঁর প্রথম ইংরাজি কাব্যগ্রন্থ Lyrics of Ind-এর Krishna To Radha কবিতার ভাবে ও ছন্দে লিখেছেন। এ-ছন্দ পরে রবীন্দ্রনাথের বলাকায় পূর্ণাঙ্গ ও নিখুঁৎ হ'য়ে ওঠে। এ-ছন্দে দ্বিজেন্দ্রলাল আরো দুটি কবিতা লেখেন : আশীর্বাদ ও উদ্বোধন। শেষেরটি প্রথম প্রকাশ হয় আর্যগাথা দ্বিতীয় ভাগে।

দি. কু. রা.

নবদ্বীপ

গঙ্গাজলাঙ্গী সঙ্গমে নবদ্বীপপুর।
এইখানে গৌরাঙ্গের গম্ভীর মধুর
উঠেছিল সঙ্কীর্ত্তন ;—কোথায় অকূল,
বাত্যোৎক্ষিপ্ত সমুদ্রের সুনীল, বিপুল,
প্রমত্ত, প্রচণ্ড এক তরঙ্গের মত
আসি', ছেয়েছিল বঙ্গদেশ ;—শত শত
আবর্জ্জনাপূর্ণ গৃহাঙ্গন, পথ, মাঠ,
জীর্ণগৃহ, ভগ্নচূড় মন্দির, বিরাট
শ্মশান, বিধৌত করি' তাহার নির্ম্মল
নীল জলরাশি দিয়া ; করিয়া সরল,
অভিনব, সুপবিত্র, স্নিগ্ধ, শান্তিময়,
প্রেমপূর্ণ, ভক্তিনম্র,—মানব-হৃদয় ;
কাম, ক্রোধ, দ্বেষ, হিংসা, লোভ করি' দূর ;—
প্রিয়তমে !—এই সেই নবদ্বীপপুর।
আর তাও বলি, এই সেই নবদ্বীপ,
যেইখানে বীর আর্যকুলের প্রদীপ
বঙ্গেশ লক্ষ্মণ সেন, প্রবৃত্ত আহারে,
শুনি' সপ্তদশ সেনা উপনীত দ্বারে,
অত্যদ্ভুতপ্রত্যুৎপন্নমতিত্বসহিত,
পশ্চাদ্দ্বার দিয়া, নৌকারূঢ়, পলায়িত,—
একেবারে না চাহিয়া দক্ষিণে ও বামে,
দ্রুতবেগে উপনীত বারাণসী ধামে।

বঙ্গের গৌরব এই নবদ্বীপপুর ;
বঙ্গের কলঙ্ক এই নবদ্বীপ।—দূর

করি' সে কলঙ্ক, ধৌত করি' সে অখ্যাতি,
লজ্জার পুরীষপঙ্ক হইতে এ-জাতি
উঠাইয়া স্ববলে, গৌরাঙ্গদেব তার
শুষ্ক, শূন্য, প্রেমহীন, সামান্য, অসার,
ক্ষুদ্রচিত্তে, জাগাইয়াছিলেন মহতী
আশা ও সান্ত্বনা।—হেথা সেই মহামতি
মাতিয়াছিলেন প্রভু, মানবের হিতে,
প্রমত্ত উদ্দাম এক প্রেমের সঙ্গীতে।
অবিশ্বাস করিতেছ?—এই ক্ষুদ্র স্থান!
নদীতীরে কাঁচা পাকা বাড়ি কয়খান—
অধিকাংশ চালা ঘর! ময়লার খনি
শীর্ণ গলি! ওই সব মিষ্টান্নবিপণি!
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দোকানে বিলাতিদ্রব্যঘটা—
লণ্ঠন (তাহার মধ্যে হিঙ্কসের ক'টা),
জুতা (চটী, বুট, আর বোধ হয় তায়
খুঁজিলে দুজোড় ডসনেরও পাওয়া যায়),
কাঁচি, ছুরি, পেনসিল, পেন, দেশলাই,
ঘাঘরা, পাণ্ট ও টুপি (যার যাহা চাই),—
পমেটম, নানাবিধ ফিতের প্যাকেট,
—আর সর্বনাশ!—কুলবালার জ্যাকেট,—
কোথাও চেয়ার, বেঞ্চি, টেবিল, বিলাতি
আলমারি, আয়না, বুরুষ, ছড়ি, ছাতি;
গৃহাঙ্গনে 'কোপি', আরো দুই এক ঘরে
—হরি হরি!—এ কি দেখি—মুরগীও চরে!!!

পুরবাসীদেরই হায় এ কি ব্যবহার!
ধর্ম কর্ম ছাড়ি', করে সুখে নিদ্রাহার;
ভুলিয়া গৌরাঙ্গদেবে, ভুলিয়া ঈশ্বরে,
গাঁজা, গুলি, তাড়ি খায়; কেনাবেচা করে।
ছেলেপিলে নদীজলে স্নান করে বটে,
কিন্তু পূজা করা দূরে থাক্, নদীতটে
দন্তসম্মার্জন সহ কেহ ধরিয়াছে
অতীব অশ্লীল গান, যাহা কারো কাছে
বলিতেও লজ্জা করে। কেহ মিথ্যা দ্বন্দ্বে
করিছে চীৎকার। কেহ শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধে
রটাইছে কুৎসা, আর মর্দিছে স্বগাত্র;
(সম্ভব ছেলেটা কোন কলেজের ছাত্র)
কেহ বা পড়িয়া জলে করে সন্তরণ,
কুটিলকটাক্ষসহ বস্ত্রাবগুণ্ঠন
খর্ব পীন স্নানরত কুলবধূপ্রতি।
কেহ দূরে কারো সঙ্গে উচ্চৈঃস্বরে অতি
করিতেছে বিস্তৃত কুৎসিত আলাপন।
কেহ অর্চনানিরত, মুদ্রিতনয়ন,
বৃদ্ধের পশ্চাতে গিয়া, ভেঙচায় তারে,
বক্ষে পাণিযুগ রাখি'; তার ব্যবহারে
সব দুষ্ট, কিন্তু উনমৌলিক শিশুরা
করে হাস্য; চমকিয়া চক্ষু মেলি' বুড়া
শিক্ষাদানহেতু তাহাদের পানে ধায়;
ক্ষিপ্রতর পদক্ষেপে তাহারা পালায়।

সত্য বটে ; কিন্তু প্রিয়ে, তবু সত্য, এই,
এই সেই নবদ্বীপধাম ; এই সেই
তীর্থভূমি ; এই সেই চিরস্মরণীয়,
পঙ্কিল পবিত্র, কুৎসিত সুন্দর, প্রিয়
অক্ষয় স্মৃতির মঠ, চির অভিরাম,
—প্রেমের জনমক্ষেত্র—নবদ্বীপধাম।
—শ্রীগৌরাঙ্গ যে-প্রেমের উন্মত্ত, অধীর,
দুর্নিবার টানে ; কৃষ্ণতরজনীর
অন্ধকারে ; উদ্‌ভ্রান্তচরণক্ষেপে ; ছাড়ি'
মাতা, দারা, পুত্র, বন্ধুবর্গ, ঘরবাড়ি ;
—(যাহা কিছু জগতের প্রিয়, মনোরম,
মনুষ্যের ;—যাহার কারণে করে শ্রম,
বহে দাসত্বের হল ; সহে ক্ষুরধার
শত অপমানজ্বালা ; চাহিয়া যাহার
পানে—একবার শুদ্ধ চাহিয়া কেবল,
ভুলে এই দুঃখরাশি ; এই হলাহল
পান করে হাস্যমুখে, লঘুপ্রাণে হায় ;)
মনুষ্যের সে-আরাধ্য প্রিয় দেবতায়
ঠেলি' ফেলি' পায়ে অনাদরে ; করি' দূর
ফেলিল, অনতিতিক্ত, তীব্র, সুমধুর,
সুরাপাত্র অধর হইতে,—দীনবেশে,
নগ্নপদে, মুণ্ডিতমস্তকে ;—যেন ভেসে
চলিয়াছিলেন কোন্ অজানিত স্রোতে,
বৃন্দাবন পানে ;—এই নবদ্বীপ হ'তে।

বহুদিন পূর্বে, একবার মনে পড়ে,
ভারতসীমান্তে, দূর সুদূর উত্তরে,
শৈলবনচ্ছায়ে, গিরিনির্ঝরপ্রপাতে,
রাজপুত্র এক, ঘন অন্ধকার রাতে,
এইমত, পরিবার পুত্র-পরিজন
ত্যাগ করি' ; তুচ্ছ করি' রাজভোগ্য ধন,
রত্নরাশি, গজ, বাজী, প্রাসাদ, বিভব ;
—নিত্য নৃত্যগীত, নিত্য স্তাবকের স্তব,
রমণীর কলহাস্যপূর্ণ অন্তঃপুরে
নিত্য ক্রীড়া, নিত্য ভোগ,—ছুড়ে ফেলি' দূরে ;
হেন পদব্রজে, হেন অধীর, বিনিদ্র,
হেন অনশনে, হেন সামান্য দরিদ্র,
অতি দীনচিত্তে, অতি দীনতম বেশে,
—চলিয়াছিলেন দূর বন্ধুহীন দেশে।

কিন্তু সে বৈরাগ্যভরে ; —জটিল চিন্তার
কঠোর প্রচ্ছন্ন বিষে নিত্য অনিবার
জর্জরিত চিত্তে, ক্ষুব্ধ অশান্ত অন্তরে,
সংশয়ের অঙ্কুশ তাড়নে, শান্তিতরে ;—
মস্তক উপরে ঘোর ঝঞ্ঝা, চারি দিক্
অন্ধকার ;—যন্ত্রণায় ক্ষিপ্ত দার্শনিক
ছুটিয়াছিল সে, অন্ধ অধীর আগ্রহে
অস্থির আবেগভরে,—কিন্তু প্রেমে নহে।
মানব মাতিয়াছিল শুদ্ধ একবার
এইরূপ অনাবদ্ধ, মত্ত, একাকার,

দুর্নিবার প্রেমে ;—মুগ্ধ ক্ষিপ্ত হরিনামে ;
—আর তাহা শুদ্ধ এই নবদ্বীপধামে।

সে দিন এ নবদ্বীপে জীবন্ত জাগ্রত
ছিল মনুষ্যের আত্মা ; নিত্য ও নিয়ত
বাণীর বীণার মৃদুমধুর অস্থির
উঠিত ঝঙ্কার—স্বচ্ছ শ্যাম জাহ্নবীর
হিল্লোলকল্লোলসম। বিদ্যার অর্চনা,
শাস্ত্রচর্চা, তর্ক, অধ্যয়ন, অধ্যাপনা,
স্বাধীন চিন্তার স্রোত, মৃদুল তরঙ্গে
বহেছিল নবদ্বীপে প্রিয়ে তার সঙ্গে,—
অদ্য এই শুষ্ক মরুভূমে। অহরহ
সুদূর প্রয়াগ, কাশী, দাক্ষিণাত্য সহ
বহেছিল ভাবের বাণিজ্য ; অবিরত
আসিত বিদ্যার্থী জ্ঞানী, গুণী শত শত,
নদীয়ায়। প্রত্যেক গলিতে, বিদ্যালয়
পান্থশালা ছিল, এই নবদ্বীপময়।

পরে এক দিন এই পণ্ডিত-সমাজে ;
এই স্মৃতিশ্রুতিন্যায়নীতিচর্চামাঝে ;
এই কূট তর্কের আবর্তে ;—এক অতি
সুন্দর গৌরাঙ্গ যুবা, ভক্তির মহতী
দুর্দাম বন্যার মত, পড়িল আসিয়া,
ভৈরবমধুরস্বনে ; দিল ভাসাইয়া,
ভাঙ্গিয়া, বিচূর্ণ করি,—নিয়ম আচার,
সমাজনীতি ও ধর্মনীতি ও প্রথার

পুরাতন জীর্ণ বাঁধ। অমনি অধীর
পূর্ণবিকম্পিতবক্ষে ফিরিল নদীর
প্রবল চিন্তার স্রোত; আসিল উন্মত্ত
উচ্ছৃঙ্খল উপদ্রবে প্রেমের রাজত্ব,
নবযৌবনের মত, কোথা হ'তে নেমে;
অমনি উঠিল নৃত্য—মহানৃত্য প্রেমে;
আর সেই সঙ্কীর্তন—মধুর মৃদঙ্গে—
সুমধুর হরিনাম, ছাইল এ বঙ্গে।

আর তাও বেশি দিন নয়। কিন্তু হায়
সে আগ্রহ, প্রেমোন্মাদ, সে ধর্ম কোথায়
আজি, প্রিয়তমে?—তাহা বঙ্গভূমি হ'তে
কোথায় গিয়াছে ভাসি ঘটনার স্রোতে।
তার স্থলে ভাবহীন প্রাণহীন সব
শুনিছ না বৈষ্ণবের শূন্য কলরব?
সেই প্রেমরাশি অদ্য ভিক্ষাব্যবসার
পণ্য মাত্র।—আবার সে কঙ্কাল আচার,
ধর্মের মুখস পরি বিবেকের শূন্য
সিংহাসনে বসিয়াছে। ধর্ম, নীতি, পুণ্য,
ভক্তি, স্নেহ, দয়া, ন্যায়—বিনম্র লজ্জায়
রক্তিম,—নোয়ায় শির গিয়া, তার পায়।
তার স্থলে দীর্ঘ ফোঁটা, দীর্ঘতর শিখা,
গলায় হরির মালা, কৃষ্ণ ও রাধিকা
বেচারির পথে ঘাটে অপমান নিত্য—
ভণ্ডামীর ভাণ, বেশ্যাব্যবসায় বিত্ত,

জুড়ি চৈতন্যেরই সেই পুণ্য বঙ্গধাম।
—অহো কি ধর্মের কি কঠোর পরিণাম!

তবু এই সেই নবদ্বীপ ; ধৌত করে
সেই গঙ্গা, সে জলাঙ্গী, আজও ভক্তিভরে,
তার পদরজ। প্রিয়ে, শিরে লও তুলি,
প্রেমে সুপবিত্র আজো তার স্বর্ণধূলি ;
হোক সে পঙ্কিল আজি,—বিলুপ্তবিভব,
বিহীনসৌন্দর্যজ্ঞানপ্রতিভাগৌরব,
তবু চির পুণ্যময় তাহা, স্বর্গসম—
অবনত কর শির—প্রেয়সি, প্রণম।

মিলন

(গান)

এসো, আঁখি ভ'রে আজ দেখি হে তোমার হাসিভরা মুখখানি।
এসো শ্রবণ ভরিয়ে শুনি ও-মধুর অধরে মধুর বাণী।
এসো, হৃদয় ভরিয়ে করি নাথ, তব পরশন-সুধাপান।
আজ, প্রাণ ভ'রে ভালোবাসিয়া আমার জুড়াই তাপিত প্রাণ।
বঁধু, জানো কি, ছিলাম কত আশা ক'রে এত দিন পথ চেয়ে ?
আজ, সে-পুণ্যফলে পেলাম স্বর্গ—তোমারে নিকটে পেয়ে !
আজি তোমারি বিমল কিরণছটায়, উজল নিখিল ধরা ;
আজি তোমারি মধুর কলকণ্ঠস্বরে গগন সঙ্গীতভরা ;

আজি তোমারি ও-অঙ্গ পরশে, আকুল অধীর পবন চলে ;
আজি ফুটিছে সুগন্ধ ফুল রাশি রাশি তোমার চরণ-তলে।

জানো, কত দিন আমি গোপনে হৃদয়ে ব'রেছি তোমারে, প্রভু ?
কত ভেবেছি অভাগী আমি এ-জনমে পাব কি তোমারে কভু ?
কত প্রভাত শিশিরে, সন্ধ্যার সমীরে, নিশার তিমিরে, জাগি',
আমি রহিতাম কত উদ্‌ভ্রান্ত হৃদয়ে তোমার দরশ লাগি !
শুনি' স্তনিত জলদমন্দ্র, চমকিয়া চাহিতাম তুলি' মুখ ;
দেখি অরুণউদয় দুরু দুরু করি' কাঁপিয়া উঠিত বুক ;
কত নবীন বসন্তে শিহরিতাম গো, তব আগমন গণি' ;
কত চাহিতাম, শুনি কিশলয়-দলে মলয়ের পদধ্বনি।
—আজি সে তুমি আমার, মিটেছে গো সব প্রাণের বাসনাগুলি ;
আজি জীবন আমার সফলকামনা—পেয়ে তব পদধূলি।

না না, মিটে নি মিটে নি বাসনা, শুধুই ভেঙে গেছে তার বাঁধ ;
শুধু ফুটিয়া উঠেছে মুকুলিত মম প্রাণের সকল সাধ ;
শুধু সুধা পেয়ে যেন বাড়িয়াছে ক্ষুধা, ধন পেয়ে ধন-আশা ;
তব পরশে হরষে জেগেছে প্রাণের ঘুমন্ত এ-ভালোবাসা।
যদি পেয়েছি তোমারে প্রাণ ভ'রে আজি ডাকিব 'আমার' ব'লে ;
আজি এ-কোমল ভুজবন্ধন দিব গো পরায়ে তোমার গলে ;
আজি শুনাব নিভৃতে, হৃদয়ে রচিয়া রেখেছি যে-সব গান ;
নাথ, তোমারে আজিকে ছেয়ে দিব দিয়ে প্রণয়ের অভিধান ;
মম ধরম করম বিকাইব তব কমলচরণতলে ;
আজি হাসিব কাঁদিব মরিব ডুবি' এ-অগাধজলধিজলে।

সমুদ্রের প্রতি

(পুরীতে)

হে সমুদ্র! আমি আজ এইখানে বসি, তব তীরে—
ঠিক তীরে নয়, এই সুপ্রশস্ত ঘরের বাহিরে,
বারান্দায়, আরাম-আসনে বসি, সুখে, এই ক্ষণে—
'দুনিয়াটা মন্দ নয়' এই কথা ভাবিতেছি মনে।
হায় শুদ্ধ অন্নচিন্তা যদি না থাকিত, ও অন্ততঃ
দিবায় ছয়টি ঘণ্টা পরদাস্য না করিতে হ'ত!—

সে আরামাসনে বসি', নাসিকার অগ্রভাগ তুলি,
সংসারকে দেখাইতে পারিতাম জোরে বৃদ্ধাঙ্গুলি;
ভুলিতাম দেশ, কাল, পাত্র, মর্মদুঃখ শত শত,
ধর্মনীতি, রাজনীতি, সামাজিক মিথ্যা দ্বন্দ্ব যত,
প্রভুর তাড়না, স্ত্রীর অভিমান, সন্তানের রোগ,
ও তার আনুষঙ্গিক অন্য অন্য নানা কর্মভোগ।
সত্যটি বলিলে লোকে চটে, তাই চেপে যাই সিন্ধু!
কিন্তু মনুষ্যত্বে আর ভক্তিশ্রদ্ধা নাই একবিন্দু।
দেখি সকলেই বেশ আপনার আহারটি খোঁজে;
আর সেটা পেতে হয় কী রকমে তাও বেশ বোঝে;
কার কাছে কতখানি কী রকমে নিতে হয় কেড়ে,
চেয়ে-চিন্তে, ধ'রে-বেঁধে, ফাঁকি দিয়ে, তাও বোঝে 'বেড়ে'!

—না না এ-ভাষাটা কিছু বেশি গ্রাম্য হয়ে গেল ঐ হে!
কিন্তু গ্রাম্য কথাগুলো মাঝে মাঝে ভারি লাগসৈ হে!
ভারি অর্থপূর্ণ—নয়?—হে সমুদ্র!—বোলো ভাই, বোলো,
মাফ কোরো কথাগুলো; অশ্লীলটা না হ'লেই হোলো;

তোমার যে-প্রাপ্য মান্য তার আমি করিব না হানি ;—
যারে যেটা দেয়—সেটা—রত্নাকর ! আমি বেশ জানি।
শোনো এক কথা : তুমি বেড়াইছ সদা কারে খুঁজি ?
কাহারো যে তক্কা তুমি রাখো না কো সেটা বেশ বুঝি ;
কিন্তু তাই ব'লে এই তোমার যে—'দিন রাত নাই'—
তর্জন গর্জন আর মত্তখেলা ভালো হচ্ছে ভাই ?
কাহার উপরে ক্রুদ্ধ সেইটেই বল না হে খুলে ;
কেন ধেয়ে আস ঐ শুভ্রফণাফেনরাশি—তুলে ?

ধরণীর উপরে কি ক্রুদ্ধ ? যে সে তব ভার্যা হ'য়ে,
তোমার ও রাক্ষসী স্বভাব ছেড়ে, ধরিছে হৃদয়ে
স্নেহময়ী মাতৃসমা, দীনা সেই, সহিষ্ণু সে নারী,
ধরিছে হৃদয়ে—শস্যফলপুষ্পস্নিগ্ধমিষ্টবারি,
পালিছে সন্তানগুলি ধীরে সযতনে একমনে,
তোমার ও রুক্ষ বক্ষে এত প্রেম সহিবে কেমনে ?

কিংবা তব স্বেচ্ছাচার প্রেমে বুঝি চায় রোধিবারে ;
উত্তালতরঙ্গভঙ্গে, তাই ধাও বিচূর্ণিতে তারে ?
তাই গর্জ দস্যুবর ? ইচ্ছা বুঝি গিয়া তারে গ্রাসো,
ক্ষুধা-অন্ধ হিংস্র জন্তুসম, তাই বুঝি ধেয়ে আসো
বার বার, বর্বর ! ভাঙিতে তার অসহায় বুকে ?
—এত নির্যাতন, সিন্ধু ! তবু যার বাণী নাহি মুখে।

শোনো : তুমি শুনি যে হে পৃথিবীর তিন পোয়া জুড়ে
ব'সে আছ, তা কি ভালো ? হাঁ হাঁ, বটে তুমি নও কুঁড়ে,

সেটা মানি ;—শুদ্ধ ঘুরে অহোরাত্র বেড়াইছ টো টো,
নির্বিবাদে, নিখর্চায় ইউরোপে আফ্রিকায় ছোটো,
তাও জানি। কিন্তু কোন্ কাজে লাগো, যাক্ দেখি শোনা
এতখানি নীল জল-রাশি বটে, কিন্তু সব লোনা।

দিনরাত ভাঙো শুধু বিশ্ব জুড়ি বসুধার তীর ;
বালুরাশি দিয়ে ঢাকো শস্যশ্যামলতা পৃথিবীর ;
ক্ষুরসম ঢেকে রাখো গিরিশৃঙ্গ তুঙ্গ কিংবা ক্ষুদ্র ;
—উপরেতে মোলায়েম, যেন কিছু জানো না সমুদ্র ;
একটু বাতাসে মত্ত ; ঝটিকায় দেখো না তো চক্ষে ;
—অভাগা সে জাহাজ, যে সে সময়ে থাকে তব বক্ষে।

তুমি রত্নগর্ভ ? কিন্তু রাখো রত্নে দুর্গম গহ্বরে।
তুমি পোষো জল-জীবে ? তারা কার উপকার করে ?
তুমি ভীমপরাক্রম ? কিন্তু দেখি ব্যক্ত তাহা নাশে।
তুমি নীলবারিনিধি ?—কিন্তু তাতে কার যায় আসে ?
কি !—তুমি অপরিসীম ?—আকাশ তো তার চেয়ে বড়ো !
ও !—তুমি স্বাধীন ?—তবে আর কি, আমার ঘাড়ে চড়ো !

তুমি যে হে গর্জিছই !—চটো কেন ? শোনো পারাবার !
দুটো কথা বলি শোনো। তোমার যে ভারি অহঙ্কার !
শোনো এক কথা বলি !—দিন রাত করিছ যে শোঁ শোঁ—
তোমার কি কাজকর্ম নাই ?—আহা চটো কেন ? রোসো।
শুদ্ধ নিন্দাবাদী আমি ? তবে শোনো দুটো স্তুতিবাণী ;
বলেছি—"যা প্রাপ্য মান্য তাহা আমি করিব না হানি।"

—না না ; তুমি ভাঙো বটে—করো চূর্ণ যাহা পুরাতন ;
কিন্তু তুমি নবরাজ্য পুনরায় করিছ সৃজন ;
ব্যাপ্তিসম, কালসম, সৃজনের বীজমন্ত্রম'ত,
এক হাতে নাশ তব, এক হাত গঠনে নিরত ;
যুগে যুগে ব'য়ে যাও গম্ভীর কল্লোলি', নিরবধি ;
ন্যায়সম নিঃসঙ্কোচে নিজ কার্য সাধিছ জলধি !

তুমি গর্বী ; তুমি অন্ধ ; তুমি বীর্যমত্ত ; তুমি ভীম ;
কিন্তু তুমি শান্ত ; প্রেমী : তুমি স্নিগ্ধ ; নির্মল ; অসীম ;
অগাধ, অস্থির প্রেমে আসো তুমি বক্ষে ধরণীর,
বিপুল উচ্ছ্বাসে, মত্তবেগে, দৈত্যসম তুমি বীর।
চাহো বক্ষে চাপিতে তাহারে ঘন গাঢ় আলিঙ্গনে ;
বুঝ না সে ক্ষীণদেহা—অত প্রেম সহিবে কেমনে ?

কিংবা তুমি বুঝি কোন যোগিবর, দূরে একমনা
বিপুল ব্রহ্মাণ্ডে ; কোন মহাযোগ করিছ সাধনা ;
ধর তব বিশাল হৃদয়ে আকাশের গাঢ়তম
ঘননীলছায়ারাশি যোগিচিত্তে মোক্ষ-আশা সম !
কভু তুমি ধ্যানরত, মুদিতনয়ন, স্থির, প্রভু !
সমুত্থিত মুখে তব মেঘমন্দ্রে বেদগান কভু।

দাও অকাতরে নিজ পুণ্যরাশি যাহা বাষ্পাকারে,
প্রার্থনায়, উঠি নীলাকাশে, পুনঃ পড়ে শতধারে,
দেবতার বরসম, প্লাবি' নদনদীহ্রদহৃদি,
জাগাইয়া বসুধায় শস্যপুষ্পরাজত্ব, বারিধি !

তুমি কভু বক্রভাষী ; তুমি কভু শান্ত, মৌন, স্থির ;
অতল ; অপরিমেয় ; দিব্য ; সৌম্য ; উদার ; গম্ভীর

কল্লোলিয়া যাও সিন্ধু ! চূর্ণ কর ক্ষুদ্রতার দম্ভ ;
ধৌত কর পদপ্রান্তে ভূধরের মহত্ত্বের স্তম্ভ ;
সৃষ্টির সে প্রেমান্ধ সঙ্গীত তুমি যুগে যুগে গাও ;
—যাও চিরকাল সমভাবে বীর কল্লোলিয়া যাও।

কার দোষ

কহিলেন স্বামী—"এ কি অত্যধিক আশা ?
কর্ম হ'তে শ্রান্তদেহে ক্লান্তপদে ফিরি' গেহে,
ওই হাসি পান করি' মিটাব পিপাসা ;
এ কি প্রিয়ে বড় বেশি আশা ?
এ শুষ্ক নয়ন 'পরে চুম্বিয়া সোহাগভরে,
দিবে শান্তি, দিবে তৃপ্তি, দিবে ভালোবাসা ;
এ কি বড় বেশি আশা ?
"এত সুখ খায় না গো" কহিলেন প্রিয়া—
"কর্ম হ'তে শ্রান্তদেহে ক্লান্তপদে ফিরি 'গেহে !
রেখেছ আর কি তবে মাথাটি কিনিয়া !"
ব্যঙ্গভরে কহিলেন প্রিয়া—
"আমাদের কর্ম নাই ! আমরা বসিয়া খাই !
ঘুমাই সারাটি দিন ঘরে দোর দিয়া ?"
তবে—কহিলেন প্রিয়া।

"তোমরা কি সদা তার লবে প্রতিশোধ ?
স্খলিত চরণে যদি পড়ে যাই—নিরবধি
শত বিঘ্ন বাধা যার করে গতিরোধ ;
তোমরা কি লবে প্রতিশোধ ?
করি যদি একবার অপমান অত্যাচার
করি যদি অপরাধ আমরা অবোধ ;
তাই লবে প্রতিশোধ ?"
"খুব নেবো।—তোমরা কি ছেড়ে কথা কহ ?
স্খলিত চরণ যদি প'ড়ে যাই নিরবধি !
আমাদের দোষ হ'লে—চুপ ক'রে রহ ?
বড নাকি ছেড়ে কথা কহ ?"
এক হাতে বাজে তালি ?— আমরাই বকি খালি ?
তোমরা নিরীহ জীব—জানো না কলহ !
বড় ছেড়ে কথা কহ ?"
কহিলেন পিতামহী—"হয়ে থাকে বটে ;
আমাদের সময়েও এইরূপ হ'ত সেও,
স্বামী স্ত্রীতে চিরকাল—পুরাণেও রটে ;—
এইরূপই হয়ে থাকে বটে।
তবে যেই রূঢ় কহে তার তত দোষ নহে ;
বেশি দোষ তার ভাই, যে তাহাতে চটে।
—তবে কিনা এ রকম হয়ে থাকে বটে।"

জীবন-পথের নবীন পান্থ

অনিন্দ্য, পেলব, ক্ষুদ্র অবয়ব ; অনিন্দ্যসুন্দর কোমল আস্য ;
ক্ষুদ্র কণ্ঠে তোর কলকণ্ঠরব ; ক্ষুদ্র দন্তে তোর মোহন হাস্য ;
কচি বাহু দুটি প্রসারিয়া, ছুটি আসিস্, ঝাপিয়া আমার বক্ষে ;
ক্ষুদ্র মুষ্টি তোর ক্ষুদ্র করপুটে ; তুষ্ট দৃষ্টি তোর উজ্জ্বল চক্ষে ;
ক্ষুদ্র দুটি ওই চরণবিক্ষেপে, কক্ষ হ'তে কক্ষান্তরে প্রলম্ফ ;
ধরিয়া আমার অঙ্গুলিটি চেপে, সোপান হইতে সোপানে ঝম্প !

আমি স্বপ্রকোষ্ঠে বসি একা, দূরে করি শুষ্ক কার্য নিবিষ্টচিত্তে ;
তুই এসে সব দিস্ ভেঙে চুরে, ও মনোমোহন মধুর নৃত্যে ;—
ফেলি উলটিয়া মসীপাত্র, সুখে লেখনীটি ভাঙি, ধরিয়া দন্তে,
হাতে মসী মাখি', মসী মাখি' মুখে, পড়িয়া ছিঁড়িয়া কাগজ গ্রন্থে,
উলটি পালটি সাপটিয়া, রোষে, ফেলিস্ ছুঁড়িয়া, তুই নৃশংস !
নাদিরের মত, পরম সন্তোষে চাহিয়া, দেখিস্ স্বকৃত ধ্বংস !

ব্যস্ত হয়ে ডাকি জননীরে তোর, "দেখ এসে, মোর স্বর্গের সূত্র
পুত্ররত্ন করে অত্যাচার ঘোর,—নিয়ে যাও এসে তোমার পুত্র।"
তুই কিন্তু বসি' মেজের উপরে, নির্ভীক, প্রশান্ত, স্থির ঔদাস্যে ;
গান ধ'রে দিস্, হর্ষে, তারস্বরে ; মুগ্ধ ক'রে দিস্ চাহনি হাস্যে ;
গলদেশ ধরি', ধরি' মোর শিরে অনতিনিবিড় চিকুরগুচ্ছ ;
উপহাস করি' পিতা জননীরে বারণ তাড়ন করিয়া তুচ্ছ।

কোথা হ'তে পেলি, বল্ বৎস মোর, মোর পরিবারে দখলী পাট্টা ?
মায়ের সহিত নিত্য এই জোর ? বাপের সহিত নিয়ত ঠাট্টা ?

ইঙ্গিতে করিস্ বিবিধ আদেশে—যেন আমি তোর অধীন ভৃত্য ;
পরাভব দেখি', খল খল হেসে, করতালি দিয়া করিস্ নৃত্য !
ও দুর্বল দুটি সুকোমল করে ভুবনবিজয়ী, কার সাহায্যে ?
উড়ে এসে জুড়ে বসি' বক্ষ 'পরে, কেড়ে কুড়ে নিস্ প্রেমের রাজ্যে !

করি' দিবসের শুষ্ক কার্য, হায় দাসত্বের ধূলি মুছিয়া অঙ্গে,
ফিরি গৃহে, বৎস !—উৎসুক আশায়—করিব আলাপ তোমার সঙ্গে ;
বর্ষায় চড়িয়া বক্ষোপরি, ফিরে, চাহিয়া শুনিবি জীমূতমন্দ্রে ;
বসন্তে, গাহিবি মলয় সমীরে ; শরতে, হাসিয়া ডাকিবি চন্দ্রে ;
উচ্চারিবি ধীরে অমিয়সম্ভার সম্বোধনে, মিষ্ট বচনখণ্ডে ;
শুধু প্রশ্নে দিবি উত্তর কথার ; দিবি সিক্ত চুমা ভরিয়া গণ্ডে ।

ভাঙিবি চুরিবি পাত্রদ্রব্য সব ; দংশিবি নাসিকা ; মারিবি পৃষ্ঠে ;
মন্থর মস্তিষ্কে, নিত্য, অভিনব প্রচুর অনিষ্ট করিবি সৃষ্টি ।
আমি যদি যাই ধেয়ে পানে তোর, তাড়া দিতে তোরে এহেন ক্ষেত্রে ;
অমনি ভর্ৎসিবি ভর্ৎসনা কঠোর, ছল ছল দুটি সজল নেত্রে ।
অমনি ভুলিয়া সব উপদ্রব, নাহি করি' আর কোনো প্রতীক্ষা,
এ স্নেহ-গদ্‌গদ বক্ষে তুলে লব, চুম্বনে চুম্বনে মাগিব ভিক্ষা ।

কী বন্ধনে তুই বেঁধেছিস্ মোরে, এড়াতে পারি না এ চিরদাস্যে ;
কি ক্রন্দনে তুই সর্বজয়ী, ওরে ক্ষুদ্র বীর !—ও কি মোহন হাস্যে
করিস্ আলাপ ; কি ভাষা অস্ফুট শিখেছিস্, ও কি মধুর ছন্দ ;
চরণে কমল, হস্তে মুঠো মুঠো কমল, আননে কমলগন্ধ ;
নিত্যই নূতন, নিত্যই সুন্দর—সঙ্গীতময় ও চরণ ভঙ্গে,
বেড়াস্ গৃহের চন্দ্র, প্রিয়বর, আপনার মনে, আপন রঙ্গে !

দেখেছি সন্ধ্যায়, শান্ত হৈমকরে রঞ্জিত মেঘের গরিমা দীপ্ত ;
দেখেছি উষায়, নীল সরোবরে অমল কমল শিশিরলিপ্ত ;
নিদাঘে, নির্মেঘ প্রভাতের ছটা ; বসন্তের নব শ্যামল কান্তি ;
বর্ষায়, বিদ্যুতে দীর্ণ ঘন-ঘটা ; শরতে, চন্দ্রের স্বপনভ্রান্তি ;—
এ বিশ্বে সৌন্দর্য যেই দিকে চাই, রাশি রাশি রাশি হয়েছে সৃষ্ট ;
তেমন সৌন্দর্য কিন্তু দেখি নাই, শিশুর হাসিটি যেমন মিষ্ট !

আমরা পতিত, বিশুষ্ক, নিরাশ, অন্ধকারময় গভীর গর্তে ;
পরী-পদক্ষেপে তুই চ'লে যাস্ কিরণময় ও শ্যামল মর্ত্যে ;
গান গেয়ে গেয়ে পাপিয়ার ম'ত, নিশ্চিন্ত নির্ভয়ে, নিরবরুদ্ধ
নীলাম্বরে, উর্ধ্ব হতে উর্ধ্বে রত, নিমগ্ন, বিমুগ্ধ, বিভোর, শুদ্ধ
আপন সঙ্গীতে ; দেখিস্ কেবল দিগন্তবিতান,—সুনীল, শান্ত ;
স্নিগ্ধ সূর্যরশ্মি, উদ্ভাসি' নির্মল গগন হইতে গগনপ্রান্ত !

আমরা পড়িয়া রহি পদতলে—মলিন, নিলীন ধূলায়, ত্যক্ত,
দ্বন্দ্বরত, মগ্ন মিথ্যাকোলাহলে, ভীত, শীর্ণ, ব্যগ্র, বিষয়াসক্ত।
এইরূপে দিন চ'লে যায় ধীরে, ক্রমে ঘনাইয়া আসে সে রাত্রি,—
থমকি' দাঁড়ায় যে-ঘন তিমিরে সকল পথিক, সকল যাত্রী।—
আমাদের লীলা সাঙ্গ হয়ে যায়, এখন তুই রে, মধুর, কান্ত ;
প্রিয়তম ! তুই নেচে নেচে আয়, জীবন-পথের নবীন পান্থ !

আশীর্বাদ

আজি পূর্ণ ব্রত।
বালিকা-জীবনে তুই নিত্য ও নিয়ত
যে কামনা যে-অর্চনা যে ধ্যান-নিরত
ছিলি ;—শত
উদ্বেগ, আশঙ্কা, আশাআকাশকুসুম ; শিশুজীবনের শত
সাধ, ভাঙা-গড়া কত, কত ইচ্ছা অসঙ্গত ;
আজি তাহা পরিণত
দৃশ্য স্পৃশ্যফলে ; আজি শান্ত সে বাসনা অসংযত ;
বালিকার একান্ত সাধনা সেই পতি মনোমত।
আজি তোর পূর্ণ সেই ব্রত।

আজি এই কোলাহলে ;
এ উৎসবে এ আনন্দরবে ; এই পুষ্প-পরিমলে
এ মঙ্গলবাদ্যে ; এই চন্দ্রাতপতলে,
পশিছ, জানিও, এক সুপবিত্র মন্দিরে বিমলে !
পূর্বজন্মকৃত পুণ্যফলে।
—আজি, শান্তিজলে
পবিত্রে ! দাঁড়াও, নারীজীবনের এই সন্ধিস্থলে ;
আমি আশীর্বাদ করি শান্তি ও কুশলে
থাক পরিণীতে ! পতি সখী ও সচিব হও—আর সুমঙ্গলে।
ধন্য হও নিজপুণ্যবলে।

উদ্বোধন

এসেছিলে তুমি
বসন্তের মত মনোহর
প্রাবৃটের নবস্নিগ্ধ ঘনসম প্রিয়।
এসেছিলে তুমি
শুধু উজলিতে; স্বর্গীয়,
সুন্দর
কভু ভাবি মনে,
তুমি নও শীত
ধরণীর;
কোন স্বর্ণালোক হতে এসেছিলে নেমে
এক বিন্দু কিরণ শিশির;
শুধু গাথা—গীত,
আলোক ও প্রেমে;
লালিত ললিত এক অমর স্বপনে।

আগে যেন কোথা ভালো দেখিছি তোমারে—
কোথা বলো দেখি?
মর্মর প্রতিমা এক 'টাইবার' ধারে
দেখেছিনু;—সে কি তুমি?
অথবা সে
তুমিই দিব্যালোকে দেবি আলোকি ছিলে কি
রাফেলের প্রাণে,
যবে তাহা সহসা-উল্লাসে
বিকশিত হয়েছিল "কুমারী"-বয়ানে?

কিম্বা শুনেছিনু বনলতা-
শকুন্তলাফুলময় কথা
কালিদাসমুখে, মনে পড়ে!—সে কি তুমি?

হাঁ তুমিই বটে।
কিন্তু আসিয়াছ সত্য ও সুন্দরতম
আজি তুমি আমার নিকটে
আসো নি আজি সে বেশ পরি ;—
মর্মরে, সংগীতময় বর্ণে, কবিতার
স্কন্ধে ভর দিয়া।—
এসেছ ঢাকিয়া
মাংসের শরীরে আজি সোদ্বেগ তোমার
জীবন্ত হৃদয় ;
—নয় কল্পিত সৌন্দর্যে ; নয়
কবির নয়নে দেখা—পরীস্বপ্নসম ;
এসেছ প্রত্যক্ষ, স্বীয় দেবীরূপ ধরি'।

আরো ;—সে মধুরে
ছিল না জীবন যেন। অতীব সুন্দর মুখখানি,
কিন্তু যেন চক্ষু দুটি চাহিয়া রহিত কোথা দূরে।
তখন কি জানি,
কিরূপ সে যেন উদাসীন, চাহিত হৃদয়হীন প্রাণে।
চাহিত না অর্থপূর্ণ হেন মোর পানে।
তখন নক্ষত্রসম ছিলে দূরস্থায়ী!
তখন সৌন্দর্যে এসেছিলে,
'প্রেমে' আসো নাই।

কিন্তু আজি যৌবন সোত্তম ;
প্রভাতশিশির-
সম স্নিগ্ধ ; বীণাধ্বনিসম
স্বর্গীয় ; বিশ্বাসসম স্থির ;
গাঢ়, নীল আকাশের ম'ত ;—
সে, দৃঢ়নির্ভরপ্রেমে মোরই পানে নত।
আহা—
যদি কোন মন্ত্রবলে সুন্দর ধরণী
হইত আবদ্ধ এক স্বরে—
যদি অপ্সরার সংমিলিত গীতধ্বনি
হ'ত সত্য—নৈশ নীলাম্বরে
প্রত্যেক নক্ষত্র যদি প্রাণোন্মাদী সুর
হইত—অথবা যদি হেম
সন্ধ্যাকাশ অকস্মাৎ একটি দিগন্তব্যাপী হইত ঝঙ্কার—
হইত আশ্চর্য তাহা ;
কিন্তু হইত না অর্ধমধুরসংগীত তার,
যেমতি মধুর
স্বপ্নময়, কুহুময় 'প্রেম'।

নববধূ

বাপের বাড়ি এলাম ছাড়ি', যখন অতি শিশু ;
মায়ের কাছে শুতাম যবে, করিত কোলে বিশু ;
ভায়ের সনে বিবাদ করি', সইয়ের সনে খেলা,
হাসির ম'ত, স্রোতের ম'ত, কাটিত যবে বেলা ;
স্বাধীন ভাবে বেড়াইতাম আপন গৃহে ভুলি',
কাননে, মাঠে, পথে ও ঘাটে, মাখিয়া গায়ে ধূলি ;
জুটিত যবে গাছের তলে পাড়ার মেয়ে ছেলে ;
অপার সুখে কাটিত বেলা কতই খেলা খেলে ;
যেতাম যবে তুলিতে চাঁপা, পিয়িতে ফুলমধু ;
—চলিয়া গেল সে-দিন, আমি হলাম নববধূ।

একদা শেষ নিশীথে জাগি, অর্ধঘুমঘোরে
বাবার মা'র তর্করবে ভাঙিল ঘুম ভোরে।
তখন মাঘ, সকাল বেলা, বিশেষ তাড়াতাড়ি
উঠিতে বড় ইচ্ছা নাই লেপের মায়া ছাড়ি' ;
শুনিলাম যে কহেন মাতা—"হইল মেয়ে বড়,—
এখন তবে পাত্র দেখ, একটা কিছু কর।"
কহেন পিতা—"এত কি বেশি হয়েছে বড় মেয়ে ?"
কহেন মাতা—"তুমি কী জানো ? তুমি কি দেখ চেয়ে ?
সারাটি দিন বাহিরে থাকো, খেলিছ গিয়ে দাবা,
আমিই ব'সে পাহারা দেই" ; কহেন তবে বাবা—
"সে কি গৃহিণি ? মেয়ে তো মোটে পড়েছে এই দশে ;
কাহার ক্ষতি করিছে ? হেসে খেলেই বেড়ায় সে ;
থাক না কেন বছর দুই।" জননী ক্রোধে তবে
শয্যা ছাড়ি', গাত্র ঝাড়ি', কহেন ঘোররবে

ঝঙ্কারিয়া—“তোমার মেয়ে—আচ্ছা, বেশ, থাকো ;
কাটিতে হয় কাটো, কিম্বা রাখিতে হয় রাখো ;
আমার ভারি দায়টি ! আমি সহিতে নারি তবে
লোকের এই গঞ্জনাটি—তা যা হবার হবে—
আমি তো হেথা টিকিতে নাহি পারিব, যথা তথা
চলিয়া যাই, খরচ দাও—এ-বেশ সোজা কথা।”
কহেন বাবা—“কথাটি তুমি ভাবিছ সোজা যত,
তত সে সোজা নহে, গৃহিণি, নহে সে সোজা তত ;
বাপের বাড়ি চলিয়া যাও, নাহিকো তাহে মানা,
যথায় খুশি চলিয়া যাবে ?—অবাক্ কারখানা !
—ছাড়িয়া যাবে কিরূপে তুমি, বুঝিতে নারি আমি,
সোনার ছেলে, সোনার মেয়ে, সোনার হেন স্বামী !
কেবল স্বামী নয় সে প্রিয়ে—বলিলে নাহি ক্ষতি,—
পুরুত ডেকে দূর্বা দিয়ে বিবাহ-করা পতি !”
কহেন মাতা—“যাবোই যাবো।” কহেন পিতা—“বটে ?
যাও না যদি আমার সনে তোমার নাহি পটে ;
গর্ব ভারি !—চলিয়া তুমি গেলেই সব মাটি !
চলিয়া গেলে অন্ধকার হইবে মোর বাটী !
চলিয়া গেলে, বিরহে আমি—হয়তো তুমি ভাবো,—
তোমার তরে—হতাশ হয়ে পাগল হয়ে যাবো !
কাঁদিয়া পথে ফিরিব শুধু, পৃথিবীময় চ'লে,
কোথায় প্রিয়া কোথায় প্রিয়া কোথায় প্রিয়া ব'লে !
যাবে তো যাও, নিত্য ভয় দেখাও কেন সদা ?
মারো না কোপ, এরূপ কেন জবাই ক'রে বধা ?

অনেক কথা হইল পরে, নাহিকো মনে দিদি,
কান্নাকাটি, ঝগড়াঝাঁটি,—কলহ যথাবিধি।
পরের দিন, মুখটি ভার করিয়া, মা ও মাসি
গোছান যত গহনা আর বস্ত্র রাশি রাশি;
জনক মোর, আহার পরে, লইয়া হাতে লাঠি,
গেলেন চ'লে, রাত্রে নাহি ফিরেন নিজ বাটী।
দুদিন পরে বম্বে ট্রেনে এলেন তবে মামা,
এলেন মাতা, এলেন পিতা;—হইল স্থলোনামা-
বৈশাখে কি জ্যৈষ্ঠে, হয় প্রলয় যদি ভবে,
পাত্র দেখে একটা মোর বিয়ে দিতেই হবে।

—সে রাত্তি বড় সুখের রাত্তি! আমার বিয়ে দিতে
মাথার পরে ন'বৎ বাজে সাহানা রাগিণীতে;
পাড়ার যত গৃহিণীদল জুটিল এসে তবে,
ভরিয়া গেল ভিতর-বাড়ি তাদের কলরবে!
কেহবা বলে "ময়দা কৈ?" কেহবা ডাকে "শশী!"
কেহবা কহে "কোথায় জল?" "কোথায় বারাণসী?"
"সিঁদুর?"—"আহা বাদ্যটাকে বাজাতে বল রাজু"!
কেহবা কহে "তাবিজ কৈ? জসম কৈ? বাজু?"
বাহিরে গোল—"গেলাস কৈ?" "কর্তা কৈ?" "কেন?"
"করো না চুপ"! "মিষ্টি কৈ?" "বৃষ্টি হবে যেন!"
"আরে ও মতি ভেড়ের ভেড়ে!"—"চেঁচাও কেন দাদা?"
"ফরাস বিছা"! "সরিয়ে রাখ্ পাতার এই গাদা!"
"তামাক কৈ?" "আনছে, খুড়ো থামাও না এ গোলে!"
"এখনো বর এলো না!"—"আহা, এই যে এলো ব'লে!"

অমনি দূরে বাজনা বাজে প্রবল ঘন রবে,
হৃদয়খানি উঠিল নাচি' পুলকে মোর তবে ;
নেত্রপথে উদিত হ'ল আলোক সারি সারি,
কতই লোক কতই গাড়ি—গণিতে নাহি পারি ;
লোহিত এক হাওদা 'পরে, কেন্দ্র তার মাঝে,
মুকুট শিরে, ভূষিত তনু লোহিত নব সাজে,
আমার বর—দেবতা মোর—আমার ভাবী পতি,
সুখদুঃখবিধাতা মোর, চিরজীবনগতি !

সে রাত্তি বড় সুখের রাত্তি—শঙ্খ হুলুরবে
সসম্মানে পতিরে মোর আহ্বানিল সবে।
আসিল এক জনতা ঘন বাহিরে, দলে দলে,
মিশিয়া গেল বাঁশির তান হর্ষকোলাহলে।

তাহার পরে সাজাতে মোরে বসিল পুরনারী ;
খেলার সাথী বন্ধু সবে ঘেরিয়া, সারি সারি।
তাহার মাঝে কেন্দ্র আমি, যেন রাণীর মত ;
আমার পরে হিংসাভরে সকল আঁখি নত।
—নারীর পোড়া জীবনে এই একটি দিন তবু
সুখের বড় !   এ-হেন দিন আসে না আর কভু।

আসিলে বর ভিতরে, সবে যেখানে যারা ছিল,
করিল ঘন শঙ্খরব, উচ্চ হুলু দিল।
তাহার পরে বন্ধন সে সপ্তপাকছলে ;
চারিচক্ষুসম্মিলন আচ্ছাদনতলে ;

ধূপ ও ধুনা, মন্ত্রপাঠ ; হোম দূর্বাধানে,
অগ্নিদেবে সাক্ষী করি সভার মাঝখানে,
হইল পরে—বর্ণনা কী করিব আর দিদি,
সে মধুরাতি, মোদের সেই বিবাহ যথাবিধি !

পরের দিন, বিদায় যবে নিলাম এই ভবে
মাতার কাছে পিতার কাছে স্বজন কাছে তবে,
দিলাম শোধি পিতার ঋণ কড়ি ও ধান দিয়ে,
সহসা মনে প্রশ্ন মোর উঠিল—এই বিয়ে ?
আটটি মাস জঠরে যার গঠিত এই দেহ,
বর্ধিত এ দীর্ঘকাল পাইয়া যাঁর স্নেহ,
আজিকে সেই মাতার সেই পিতার কাছ ছাড়ি',
কোথায় আজি, কাহার সনে, চলেছি কার বাড়ি ?
চিনি না যারে, দেখি নি যারে, শুনি নি নাম কভু,
তিনি আমার দেবতা আজি ? তিনি আমার প্রভু ?
তাঁহার সাথে চলিয়া যাবো ? ছাড়িয়া যাবো পিছু,
এ-ছার নারীজীবনে ছিল মধুর যাহা কিছু ?

সে-দিন বড় দুখের দিন, কাঁদেন পিতা এসে,
কাঁদেন মাতা ; অশ্রু সনে অশ্রুজল মেশে ;
খেলার মোর সাথীরা এসে দাঁড়ায় সারি সারি,
সবার মুখ মলিন—কেন বলিতে নাহি পারি ;
ভাবিছে যেন চলিয়া আমি যেতেছি বনবাসে ;
নয়নে মোর সহসা গেল ভরিয়া জলরাশি ;
ভাবিলাম যে আমার মত দুঃখী নহে কেহ,
রহিল সব, আমিই ছেড়ে চলেছি নিজ গেহ !

কহেন পিতা—"শঙ্কা কি মা ? দুদিন পরে গিয়ে
আসিবে লোকে আবার তোরে বাপের বাড়ি নিয়ে ;
বিয়ের পরে শ্বশুরবাড়ি যাইতে হয়" ; চুমি'
কহেন মাতা—"মানিক মেয়ে, লক্ষ্মী মেয়ে তুমি !"
গেলাম চ'লে, নিঃসহায়, পতির সনে তবে,
পতির গৃহে, ভাবিয়া—"পরে যাহা হবার হবে।"

তাহার পরে শ্বশুরঘরে, কাহারে নাহি জানি—
বেড়াই গুরুজনের মাঝে ঘোমটা শিরে টানি' ;
দেখিয়া যায় ঘোমটা খুলি' প্রতিবেশিনী যত,
নীরবে রহি দাঁড়ায়ে, করি' নয়ন অবনত ;
কেহবা কহে—'দিব্যি বৌ', কেহবা কহে—'ভালো',
কেহবা কহে—'মন্দ নহে', কেহবা কহে—'কালো'।
চলিয়া যায় বিবিধ সমালোচনা করি' হেন,
আমি একটা নূতন-কেনা ঘোড়া কি গরু যেন !
নিয়ত গুরুজনের সেবানিরত আমি ভয়ে,
আদর, মৃদু তাড়না পাই তাহার বিনিময়ে ;
—পরের ঘর আপন করা, পরের মন মত,
নব বঙ্গবধূর মহা কঠিন সে ব্রত।

—কোথায় সেই পথের ধার ! কোথায় সেই ধূলি
কোথায় সেই আম্রবন ! খেলার সাথীগুলি !
কোথায় ফল পাড়িয়া দিতে ভাইরে ধ'রে সাধা !
বিনা কারণে মায়ের সেই আঁচল ধ'রে কাঁদা !
সন্ধ্যা হ'লে হাম্বারবে আসিত ফিরে গাভী !
কোথায় সেই মুক্তবায়ু !—এখন তাই ভাবি।

ক্রমশঃ দিন চলিয়া গেল সন্দেহে ও ভয়ে,
কাটিয়া গেল ভাবনা-ভীতি নিকট পরিচয়ে ;
বুঝিলাম যে আমার পতি, আমার সখা তিনি,
ভুবন 'পরে এমন আর কাহারে নাহি চিনি ;
পেয়েছি বটে মাতার প্রেম, পিতার এত স্নেহ,
বুঝেছি আমি এমন আর আপন নহে কেহ ;
পূরাজনমে তাঁহারি ধ্যান করেছি ব'লে জানি ;
পরজনমে তাঁহারে মোর দেবতা ব'লে মানি ;
এ দেহ মন দিয়াছি আমি তাঁহার পদে সঁপি,
জীবনে যেন মরণে যেন তাঁহারি নাম জপি ।

জাতীয় সঙ্গীত

বিশ্বমাঝে নিঃস্ব মোরা, অধম ধূলি চেয়ে ;
চৌদ্দ শত পুরুষ আছি পরের জুতা খেয়ে ;
তথাপি ধাই মানের লাগি ধরণী মাঝে ভিক্ষা মাগি !
নিজ মহিমা দেশবিদেশে বেড়াই গেয়ে গেয়ে !
বিশ্বমাঝে নিঃস্ব মোরা, অধম ধূলি চেয়ে ।

লজ্জা নাই ! 'আর্য' বলি চেঁচাই হাসিমুখে !
মুখে বলি তা, বাজে যে কথা বজ্র সম বুকে ;
ছিলাম বা কি হয়েছি এ কি ! সে কথা নাহি ভাবিয়া দেখি ;
নিজের দোষ দেখালে কেহ মারিতে যাই ধেয়ে !
বিশ্বমাঝে নিঃস্ব মোরা, অধম ধূলি চেয়ে ।

কেহই এত মূর্খ নয় ; সবাই বোঝে, জেনো,
হাজারি 'গীতা' পড়, তুমিও পয়সা বেশ চেনো ;
এ সব তবে কেন রে ভাই, তুমিও যাহা আমিও তাই-
স্বার্থময় জীব !—কাজ কি মিছে চীৎকারে এ ?
বিশ্বমাঝে নিঃস্ব মোরা, অধম ধূলি চেয়ে।

ব্যবসা কর, চাকরি কর, নাহিকো বাধা কোন ;
ঘরের কোণে ক্ষুদ্র মনে রৌপ্যগুলি গোণ ;
চারটি ক'রে খাও ও পর, স্ত্রীর দুখানা গহনা কর,
আর্যকুল বৃদ্ধি কর, ও পার কর মেয়ে।
—বিশ্বমাঝে নিঃস্ব মোরা, অধম ধূলি চেয়ে।

তাজমহল

'খাসা' ! 'বেশ' ! 'চমৎকার' ! 'কেয়াবাৎ' ! 'তোফা' !
কহিয়াছে নানাবিধ—সকলেই বটে,
দেখিয়াছে, তাজ ! কভু যে তোমার শোভা,
উপবন অভ্যন্তরে, যমুনার তটে।
কেহ কহিয়াছে, তুমি "বিশ্বে পরীভূমি" ;
কেহ কহে "অষ্টম বিস্ময়" ; কেহ কহে
"মর্মরে গঠিত এক প্রেমস্বপ্ন তুমি,"
আমি জানি—তাজ তার একটিও নহে ;
আমি কহি—না না, আমি কিছু নাহি কহি,
আমি শুদ্ধ চেয়ে চেয়ে দেখি, আর স্তব্ধ হয়ে রহি।

কী ভালোই বাসিত, তোমারে সাজাহান,
মমতাজমহল ! যে বাছি এ নির্জন,
নিস্তব্ধ, ঋষির ভোগ্য, এই রম্য স্থান ;
এ প্রান্তর ; এ কবিত্বপূর্ণ উপবন ;
এ কল্লোলময়ী স্বচ্ছশ্যামযমুনার
পুলিন ;—রচিয়াছিল সেখানে সুন্দর,
অপূর্ব প্রাসাদ, শুদ্ধ রক্ষিতে তোমার
মর দেহ ; এ জগতে করিয়া অমর
তোমার রূপের স্মৃতি ; করি মূর্তিমতী
সম্রাটের অনিমেষ ভালোবাসা সম্রাজ্ঞীর প্রতি ।

এত প্রেম আছে বিশ্বে ? এই বিসম্বাদী,
এই প্রবঞ্চনাপূর্ণ, নীচ মর্ত্যভূমে
হেন ভালোবাসা আছে,—হে শুভ্র সমাধি !—
যার নিষ্কলঙ্ক মূর্তি হ'তে পারো তুমি ?
তদুপরি ভারতসম্রাট্—দিবানিশি
যাহার তমিস্র, গূঢ়, অন্তঃপুরাবাসে,
রহিত রক্ষিত, বদ্ধ, সহস্র মহিষী,
বধ্য মেষপালসম ;—কদর্য বিলাসে,
লিপ্সায় মজ্জিত, প্লুত, দুর্গন্ধ জীবনে,
সে কি সত্য, এত ভালো বাসিতে পারিত একজনে ?

তবু পারে নাই রক্ষা করিতে তোমারে,
হে সম্রাজ্ঞি ! অনুপম সে সৌন্দর্যরাশি ;—
পৃথিবীর রত্নরাজি স্তুপ একাধারে ,
বিম্বিত সাগরবক্ষে শুক্লপৌর্ণমাসী ;

তাহারো পশ্চাতে, মৃত্যু, দাঁড়ায়ে নীরবে,
অপেক্ষা করিতেছিল ?   স্পর্শে যার, সেও—
সে সৌন্দর্য পরিণত পরিত্যাজ্য শবে ;
ক্রমে ক্রমে দুর্গন্ধ, গলিত সেই দেহ
ভক্ষে আসি'—মৃত্তিকার ঘৃণ্য কীটগুলি ;
পরিণামে সেই দেহ—আবার সে—যে-ধূলি সে-ধূলি

এই শেষ ?   মনুষ্যের এইখানে সীমা ?
এত সুখ, এত প্রেম, এত রূপ, এত
ভোগ, এত বাঞ্ছা, এত ঐশ্বর্য মহিমা,
সব এইখানে শেষ !   খ্যাত ও অখ্যাত,
উচ্চ নীচ, কুৎসিত সুন্দর, ঋষি শঠ,
জ্ঞানী মূর্খ, দুঃখী সুখী, সকলেরি শেষে
এখানে সাক্ষাৎ হয় ; সুদূর নিকট,
মহাসৌরজগৎ ও কীট, হেথা এসে
মেশে একাকারে।—মৃত্যু কে বলে বিচ্ছেদ ?
মৃত্যু এক প্রকাণ্ড বিবাহ, যাহে লুপ্ত বস্তুভেদ।

সে বিবাহে প্রদীপ জ্বলে না—সে-বিবাহে
সুগন্ধ পুষ্পের মালা দোলে না তোরণে ;
নেপথ্যে উঠে না শঙ্খ হুলুধ্বনি তাহে ;
নাহি জনকোলাহল ; সেই শুভক্ষণে
বাজে না মঙ্গলবাদ্য সুমধুর রবে,
সিংহদ্বারে।—সে-বিবাহ সম্পাদিত হয়
গাঢ় অন্ধকারে, ঘন স্তব্ধ নিরুৎসবে ;
যার সাক্ষী পরকাল মহাশূন্যময় ;

যায় পুরোহিত কাল ;—আশীর্বাদে তার,
ব্যাপ্তি সহ মেশে সৃষ্টি, জ্যোতিঃ সহ মেশে অন্ধকার ৮

—-বিলাসের চরম করিয়া গেছে ভবে
মোগল।—গুলাবস্নান মর্মর আগারে ;
উজ্জ্বল বসন, পূর্ণ আতর-সৌরভে ;
পোলাও কালিয়া খাদ্য ; মখমল ঝাড়ে
মণ্ডিত ভূষিত কক্ষ। ময়ূর আসন ;
উদ্যান ; নির্ঝর ; প্রভাতে সন্ধ্যায় দূরে
মধুর ন'বৎ বাদ্য ; নূপুরনিক্কণ,
সারঙ্গ, বিভ্রম নৃত্য, নিত্য অন্তঃপুরে ;
মরণেরও জন্য চাই সুপ্রশস্ত কক্ষ ;
মরণের পরে স্বর্গ—তাও সেই রূপসীর বক্ষ

আর আর্যজাতি ? ঠিক তার বিপরীত।—
রূপ—প্রকৃতির শোভা ; রস—পৃথিবীর ;
স্পর্শ—স্নিগ্ধ বায়ু ; শব্দ—নিকুঞ্জ-সঙ্গীত ;
গন্ধ—যা বহিয়া আনে উদ্যান-সমীর।
পুণ্যনদীজলে স্নান ; অঙ্গে শুভ্র বাস ;
আহার—তণ্ডুল ঘৃত ; শয্যা—ব্যাঘ্রচর্ম ;
আবাস—কুটীরকক্ষ ; চরম বিলাস
জীবনের—তীর্থযাত্রা ; বিবাহও—ধর্ম ;
এ সংসার—মায়া ; মৃত্যু—মোক্ষ দুঃখহীন
শ্মশানে, নদীর তটে ; স্বর্গ—হওয়া পরব্রহ্মে লীন।৫

—হে সুন্দর তাজ ! আমি জ্যোৎস্নায়, আলসে,
দেখেছি দাঁড়ায়ে. দূরে, ও মৌনমন্দির ;
আগ্রায়, প্রাসাদশিরে দাঁড়ায়ে, দিবসে
দেখেছি ও শুভ্রমূর্তি ; গিয়া সমাধির
অভ্যন্তরে, দেখেছি সুন্দর, তার পাশে,
পুষ্পবীথি, পয়োবাহ, নির্ঝর, ভিতরে ;
ভেবেছি যে, কভু এ-বিশ্বের ইতিহাসে,
হয় নি রচিত বর্ণে, ছন্দে, কিম্বা স্বরে,
এ হেন বিলাপ। ধন্য ধন্য সেই কবি,
প্রথম জাগিয়াছিল যাহার সুস্বপ্নে এই ছবি।

সুন্দর অতুল হর্ম্য ! হে প্রস্তরীভূত
প্রেমাশ্রু ! হে বিয়োগের পাষাণ-প্রতিমা !
মর্মরে রচিত দীর্ঘনিশ্বাস।—আপ্লুত
অনন্ত আক্ষেপে, শুভ্র হে মৌন মহিমা !
—এত শুভ্র, এত সৌম্য, এত স্তব্ধ, স্থির,
এত নিষ্কলঙ্ক, এত করুণসুন্দর,
তুমি হে কবর !—আজি তুমি সম্রাজ্ঞীর
স্মৃতি সঞ্জীবিত করো এ-বিশ্বভিতর ;
কিন্তু যবে ধূলিলীন হইবে তুমিও,
কে রাখিবে তব স্মৃতি ? হে সমাধি ! চিরস্মরণীয় !

রাধার প্রতি কৃষ্ণ

(প্রলাপ)

—ভুলিব ? সে আমার প্রথম ভালোবাসা ?
সে প্রভাতশুকতারা জীবন-আকাশে ?
যার নির্বাপিত হাস্ত—আজি এ দুর্দিনে,
দূরাগত বংশীধ্বনি সম মোর প্রাণে ভেসে আসে !

ভুলিব ? এ জীবনের সৌন্দর্যগরিমা ?
নবীন বসন্তে স্নিগ্ধ মলয় বায়ুর সেই প্রথম উচ্ছ্বাস ?
না সখি, না, পারিব না, যদিও কাঁদিতে হয় স্মরিয়া,—কাঁদিব ;
সেও ভালো—তথাপি সে ক্রন্দনও বিলাস ।

—আহা ! সেই জীবনের প্রথম গভীর সুখদুঃখ ; সেই প্রথম আবেগ ;
বিরহ, মিলন নব ;—প্রথম জীবনে !
নবীন প্রাণের গাঢ়, গভীর উদ্দাম ভালোবাসা,—
ঘন কুঞ্জবনচ্ছায়ে, নিস্তব্ধ নির্জনে ।

—কেন ভালোবাসিয়াছিলাম !
জানিতাম যবে ;
আমাদের মধ্যে, প্রিয়ে, যোজন অন্তর ?
কেন পান করিয়াছিলাম সেই আপাতমধুর বিষ ?
হইতে আমরণ সেই বিষে জরজর ।

—গাঢ় দুঃখময় স্মৃতি অশ্রুময় নয়নের পাশে ভেসে আসে ;
পাগল হইয়া যাই স্বর্গীয় বিষাদে, প্রিয়ে !
একদিন যে কিরণে অঙ্গ ঢালি' করিতাম স্নান,
অন্ত হেরি তাহা রহি' রুদ্ধ এই অন্ধ কারাগৃহে ।

তবু দুঃখ নাই। ভালোবাসিয়াছি যদি এক দিনও তরে
হেন ভালোবাসা—
হেন তন্ময়, চিন্ময়, স্তব্ধ, গাঢ় ভালোবাসা ;
সেই অর্ধ সুপ্তি, অর্ধ জাগরণ ;
আর সেই দীর্ঘ পান, তথাপি প্রাণের সেই অতৃপ্ত পিপাসা।

কভু মনে হয় সে কি স্বপ্ন ? তুমি মোর পাশে ;
ঢুলিত সমীরে, নীহারসজল বনে, মল্লিকা মালতী ;
মস্তক উপরে বাসরপ্রদীপ সম পূর্ণিমার শশী ;
পদতলে নিস্তব্ধ শ্যামল বসুমতী ;

সম্মুখে বহিয়া যায় যমুনা ; পাপিয়া গাহে দূরে,
একান্ত নির্জন, স্তব্ধ, শান্ত কুঞ্জবনে ;
মোদের মিলিতবক্ষকম্প সহ শত বীণাধ্বনি ;
শত স্বর্গ কেন্দ্রীভূত একটি চুম্বনে।

—কাঁদিতেছ তুমি ? কাঁদো !
তোমার অশ্রুর যদি আমিই কারণ, তবে কাঁদো, বিম্বাধরে !
তাহাতেও পাইব সান্ত্বনা ; জুড়াইব এ তপ্ত হৃদয় ;
বুঝিব, এখনো আমি জাগি ও অন্তরে।

নিতান্ত নিষ্ঠুর আমি ! আজিও তোমারে তাই কাঁদাইতে চাই !
হাঁ আমি নিষ্ঠুর ! যদি কহি সত্য কথা ;
কে চাহে বিস্মৃত হ'তে ? বিচ্ছেদে, অন্তর হ'তে চিরনির্বাসন !
হানে বক্ষে তীক্ষ্ণতম ব্যথা।

"কেন ভালোবাসিয়াছিলাম ?"

কেন বা আসিয়াছিলে সম্মুখে আমার—হে সুন্দরি !
তোমার ও-শুভ্র রূপে, কলকণ্ঠে, সুবাস নিঃশ্বাসে,
নবজ্যোৎস্না সম ঘননীলাম্বর পরি' !

উষা কি হইবে ক্রুদ্ধ, যদি মেঘকুল তারি হৈমকিরণে রঞ্জিত
নিস্পন্দ নয়নে চাহে গাঢ় প্রেমভরে ?
চম্পক ফিরাবে মুখ ক্রোধভরে, যবে শত মধুমত্ত অলি
প্রাণময় প্রেম তার অর্পিবে অধরে ?

—তব প্রেমে প্রেমী আমি। তাই আছি কত অপবাদ,
কত মিথ্যাবাণী, কত তিরস্কার স'য়ে।
কারণ—আমার প্রেম হয় নি পার্থিব ;
হয় নি বিক্রীত, ক্রীত, বদ্ধ, পরিণয়ে।

প্রেম পরিণয় নহে। পার্থিব আলয় নহে তার ;
তার গৃহ প্রভাতের উজ্জ্বল আকাশে।
মানে না সে ধনমান, দূরত্বের ব্যবধান ;—
সঙ্গীত হইয়া যায়, প্রেম যাহে হাসে।

দূর স্থান, দূর কাল, ভিন্ন জাতি, ভিন্ন ধর্ম, ভিন্ন বর্ণ,
নাহি কিছু রাজত্বে ইহার ;
ইহার রাজত্ব নয় গণনায়—নিত্য ব্যবসায় ;—
প্রেম হৃদয়ের সমতান, সঙ্গীত আত্মার।

—আয় মোর প্রণয়িনি ; আয় রাধে ;
ঐ সন্ধ্যা মিলাইয়া যায় ;-
এলাইয়ে পড়ে দূরে কোকিলের ধ্বনি ;
আঁধারিছে স্বর্ণমেঘ ! হাসিল নক্ষত্রে নীলাকাশ ;
নীরবে নীহারজলে কাঁদিল ধরণী ।

ভ্রমরগুঞ্জন স্তব্ধ ; বহে ধীর মলয় সমীর ;
দিবার সমাধি 'পরে ঝিল্লী গান গায় ;
অধরে মধুর হাসি, নয়নে প্রেমের জ্যোতি,
হৃদয়ে আবেগ লয়ে—আয় !

আয় তবে, প্রিয়তমে ! এ-বক্ষে আবার
দুঃখের পাহাড়'পরে স্বর্ণ ঢেউ প্রায় ;
তোর করে পরশি বিদ্যুৎ ;
তোর স্বরে শুনি বীণাধ্বনি ;
আয় তবে—নিন্দুক জগৎ—রাধে ! আয় ।

সুখমৃত্যু

"আমি যবে মরিব, আমার নিজ খাটে গো,
'আয়েসে' মরিতে যেন পারি ;
চাকরির জন্য, যেন আমার নিকটে গো,
কেহ নাহি করে উমেদারি ;

পাচক ব্রাহ্মণ যেন ঝঙ্কার না করে গো,
উচ্চকণ্ঠে হুহুঙ্কাররোলে ;
শুনিতে না হয় যেন কলহ করিয়া গো,
মানভরে, ঝি গিয়াছে চ'লে ;
অসহ্য উত্তাপ যদি, বাতাস করিও গো,
বরফশীতল দিও বারি ;
মশা যদি হয়, তবে খাটাইয়া দিও গো,
শ্যামবর্ণ নেটের মশারি ;
লেপি চারু 'মাথাঘষা' কবরীকুন্তলে গো,
কাছে এসে বসে যেন প্রিয়া
একটি পেয়ালা পাই স্বর্ণ সুরভি, গো,
চা খাইতে, দুগ্ধ চিনি দিয়া
রূপসী শ্যালিকা পড়ে একটি কবিতা গো,
যার শীঘ্র অর্থ হয় বোধ ;
গাহিতে হাসির গান যেন সে সময় গো,
কেহ নাহি করে অনুরোধ !"

কোন এক ডেপুটির উক্তবৎ ইচ্ছা শুনি
প্রিয়া তার কহে, হেসে উঠি'—
"এত সুখ একসঙ্গে যাহার কপালে, ওগো,
সে কি কভু হইত ডেপুটি !
এত সুখ একসঙ্গে !—মরণ আর কি ! মরি !
কপালেতে ঝাঁটা, মুখে ছাই !
সহজ ভাষায় বলো, আসল কথাটি যাহা,
মরিতে তোমায় ইচ্ছা নাই ।"

ডেপুটি 'ধপাৎ' করি, আকাশ হইতে যেন
পড়িলেন ভূমিতলে চিৎ ;—
"এমন সুখের স্বপ্নে বাধা দেওয়া প্রিয়তমে !
তোমার কি হইল উচিত ?
এ কথাটি এ-সময়ে অতি গন্তময়ী—ইহা
হাঁটিয়া আসিতে পথে, শেষে,
গ্যাসের থামের ম'ত, লাগিল আঘাত যেন
মদিরাবিভোর শিরে এসে ।
এই আর্য সতী !—অহো এই আর্য সতী বুঝি !
পতি যার আরাধ্য দেবতা !
সতী সাবিত্রীর কুলে উদ্ভবা কি এঁরা সব ?
তবে একী অশাস্ত্রীয় কথা !
'মরিবার ইচ্ছা নাই !' তবে বলো, আমি বুঝি
মরিলেই, বাঁচো তুমি, ধনি !
উপরন্তু এ ব্যবস্থা, সতীর বদনে শুনি'
পতির কপালে সম্মার্জনী !

'মরিবার ইচ্ছা নাই !' বল কি প্রেয়সী ? আপাতত
ইচ্ছা নাই বটে । কিন্তু সে অনিচ্ছা নহে কি সঙ্গত ?
মরিবার ইচ্ছা বলো কার আছে ?—চিররুগ্ন জন
পানাহারে অনাসক্ত ; বিহারে অক্ষম ; অনুক্ষণ
অবসাদে অবসন্ন ; যেন নাহি যায় দীর্ঘদিন ;
নাহি সুখ, নাহি আশা ; দীর্ঘ রাত্রি শান্তিসুপ্তিহীন :
সে বাঁচিতে চাহে । সেও ঔষধ সেবন করে উঠে ।
অতীব দরিদ্র—যার এক বেলা অন্ন নাহি জুটে,

নাহি 'চাল' নাহি 'চুলা' ; পরিধানে শতগ্রন্থি চীর ;
শয্যা ছিন্ন কন্থা মাত্র, কিম্বা ধূলিমাত্র পৃথিবীর :
সে বাঁচিতে চাহে। দূর এণ্ডামানে চিরনির্বাসিত,
আত্মীয় স্বজন হ'তে বিচ্ছিন্ন ; একাকী অবস্থিত
বিশ্বমাঝে শূন্য সম ; জীবনে উদ্দেশ্য নাহি যার ;
কেহ নাহি এ বিপুল ব্রহ্মাণ্ডে বলিতে আপনার ;
চেয়ে দেখে নীল ক্ষুব্ধ জলধির পানে, দেখে শুধু
তার জীবনের মত জলরাশি করিতেছে ধূধূ,
যত দূর দেখা যায়—সেও চাহে বাঁচিতে প্রেয়সী !
আমি তো ডেপুটি ! আমি মান্য ব্যক্তি—এজলাসে বসি'
তবু তো ফাটক দিতে পারি। আমি এমনি কি হীন,
দুঃখী, তুচ্ছ, যে মরিব এত শীঘ্র, থাকিতে সুদিন ?

মরিবার ইচ্ছা নাই ! সত্যই তো ইচ্ছা নাই। তবে সোজা ভাষা
বলিলেই হয়—কেন ঘুরাইয়া বলি, তাই করিবে জিজ্ঞাসা ?
পৃথিবীতে এইরূপই সর্বত্র দেখিবে প্রিয়ে ! মানব সকলে
লজ্জার খাতিরে অতি সহজ অপ্রিয় সত্য ঘুরাইয়া বলে।
নিমন্ত্রিত ব্যক্তি যদি গমনে অনিচ্ছু, কহে—'পীড়িত দুঃখিত'।
'পার্শ্বে পাতে লুচি নাই' কহে বরযাত্রী। 'ত্রুটি মার্জনা বিহিত
করিবেন নিজগুণে'—কহে কর্তা অভ্যাগতে মার্জিত বিনয়ে।
'বড় টানাটানি' কহে কৃপণ, ভিক্ষুকে।—'বাড়ী নাই' ঋণী কহে।
ইহার কি অর্থ আছে ? ইহার সদর্থটুকু, বুঝিতে অন্যথা
হয় কি কাহারো কভু ?—শীলতার অন্য নাম 'শুভ্র মিথ্যা কথা'।

মরিবার ইচ্ছা নাই—সত্য কথা—ধরো
বলিলাম অকপটে ; কী করিবে করো।

কেন বা মরিব ! কোন্ দুঃখে সোনামণি !
কে চাহে করিতে ত্যাগ এমন ধরণী,
এমন জগৎ আমাদের ?—শস্যভরা
পুষ্পভরা, সুগন্ধসুন্দর বসুন্ধরা ;
এই জ্যোৎস্না ; এই স্নিগ্ধ সমীরহিল্লোল ;
পক্ষীর কাকলি ; এই নদীর কল্লোল ;
বৃক্ষের মর্মর ; শত ফল সুমধুর ;
নির্ঝরের মিষ্ট বারি ; এ সুখ প্রচুর ।
তদুপরি যার ভাগ্যে ঘটে—জননীর
স্নেহ ; প্রেয়সীর প্রেম, দুহিতার স্থির,
সংযত সভক্তি সেবা ; পুত্রের মধুর
মুখচ্ছবি ; অকৃত্রিম প্রণয় বন্ধুর ?

তদুপরি—মরণের পাছে
কি জগৎ লুক্কায়িত আছে !
এই কৃষ্ণ জলধির পারে
কোন্ দেশ আছে ! অন্ধকারে
আচ্ছন্ন, যে দেশ হ'তে কেহ
ফিরে নাই আর নিজ গেহ ।
কিম্বা, এইখানে শেষ সব ;—
এত আশা ; প্রণয় বিভব ;
এই বুদ্ধি ; এ উগ্র প্রতাপ,
যাহা অনায়াসে পরিমাপ,
করে পৃথিবীর ভার, প্রতি
গ্রহের নির্ণয় করে গতি,

তপনের আয়ুনিরূপণ,
নক্ষত্রের রশ্মিবিশ্লেষণ ;
এই শক্তি—হায় নাহি জানে
হয়তো বা সমাপ্ত এখানে !

—মরিবার ইচ্ছা নাহি ! সত্য, না মরিতে চাহি ।
তথাপি মরিতে হবে—সৃষ্টির নিয়ম ।
জন্মিলে মরিতে হয় ; তবে কেন এই ভয় ?
এই শঙ্কা, এই দ্বিধা ?—ভ্রম, ভ্রম, ভ্রম ।
মরিয়াছে পিতৃগণ, মরিয়াছে সর্বজন :
বুদ্ধ ও বিক্রমাদিত্য—পুণ্যাত্মা, মহৎ ।
আমি কী সামান্য তুচ্ছ ?— গেল দেশ কত, উচ্চ
গ্রীস, আসীরিয়া, রোম, মিসর, ভারত ;—
কালের প্রবাহে, কত, জলবুদ্বুদের ম'ত,
উঠি' নব জীব জাতি অদ্য অধোগামী !
এ পৃথিবী লুপ্ত হবে ; ওই সূর্য গুপ্ত হবে ;
আমার মরিতে ভয়—তুচ্ছ জীব আমি ?
না, মরণে শঙ্কা নাই : আমি তো প্রস্তুত, ভাই,
যাদের ছাড়িয়া শেষে যাব এই ভবে,
তারাও আসিছে পিছে, কার জন্য শোক মিছে ?
পরে যাহা আছে, আছে—ভাবিয়া কী হবে ?
আর যদি, পরমেশ ! এ-জগতে এই শেষ ;
এই ক্ষুদ্র জীবনের মৃত্যুই অবধি ;
যদি নাই পরলোক ;— তবে কে করিবে শোক,
মৃত্যুর অপর পারে আমি নাই যদি ?

"আর যদি আমি থাকি, তাহাতেই দুঃখ বা কী ?
মৃত্যু যদি সুখশূন্য, মৃত্যু দুঃখহীন।
বিনা সুখদুঃখভার একাকার নির্বিকার,
নির্ভয়ে হইয়া যাব পরব্রহ্মে লীন।
তবে এক সাধ আছে— মরিব যখন, কাছে
রহে যেন ঘেরি' প্রিয়া পুত্রকন্যাগণ ;
আর, বন্ধু যদি কেহ, করে ভক্তি, করে স্নেহ
রহে যেন কাছে সেই প্রিয় বন্ধুজন ;
খুলে দিও দ্বার !—ভেসে পড়ে যেন মুখে এসে
নির্মুক্ত বাতাস, আর আকাশের আলো ;
দেখি যেন শ্যাম ধরা শস্যভরা, পুষ্পভরা,
এতদিন যাহাদের বাসিয়াছি ভালো ;
আসে যদি মৃদুমন্দ পবনে, চামেলিগন্ধ ;
একবার বসন্তের পিকবর গাহে ;
হয় যদি জ্যোৎস্না রাত্রি ;— আমি ও-পারের যাত্রী
যাইব পরম সুখে জ্যোৎস্নায় মিলায়ে।"

আলেখ্য

আলেখ্য

আলেখ্য প্রকাশ হয় ১৩১৪ সালে। দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁর নানা "গান" ইতিপূর্বে স্বরবৃত্ত ছন্দে রচনা ক'রে থাকলেও এ-ছন্দে "কবিতা" লেখেন সবপ্রথম আলেখ্যে। সে-সময়ে "স্বরবৃত্ত" পারিভাষিক নামটি চালু হয় নি, যদিও এ-ছন্দের ইউনিট যে সিলেব্‌ল্ ও প্রতি সিলেব্‌ল্ একমাত্রিক তা কবি ও ছন্দোবিৎরা সবাই জানতেন। দ্বিজেন্দ্রলাল সিলেবিক ছন্দকে "মাত্রিক" নামে অভিহিত করতেন—অক্ষরবৃত্ত ছন্দকে আক্ষরিক নাম দিয়ে। শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেন প্রথম বাংলা ছন্দকে তিনটি মূল ভাগে ভাগ ক'রে নামকরণ করেন অক্ষরবৃত্ত ওরফে যৌগিক, মাত্রাবৃত্ত ও স্বরবৃত্ত। কিন্তু দ্বিজেন্দ্রলাল আলেখ্যে যে-স্বরবৃত্ত লিখেছেন চলতি স্বরবৃত্ত থেকে সে একটু তফাৎ। তাই আমার ছান্দসিকী গ্রন্থে আমি একে স্বরাক্ষরিক নাম দিয়েছি। এ-ছন্দের বৈশিষ্ট্যটি বোঝাতে "ছান্দসিকী" থেকে একটু উদ্ধৃতি দিই অল্প বদলে :

"ছন্দের দুটো দিক আছে : এক ছন্দোবন্ধ বা ছন্দের কাঠামো—যাকে ইংরাজিতে বলে metre—আর এক ছন্দস্পন্দ বা ছন্দের আন্তর কল্লোল—যাকে বলে rhythm। এমন অনেক সময়েই হয় যে ছন্দোবন্ধ নিখুঁৎ অথচ তাতে জাগল না এই ছন্দস্পন্দ, অর্থাৎ ধ্বনির নির্দোষ প্রতিমায় হ'ল না কাব্যের প্রাণপ্রতিষ্ঠা। স্বরাক্ষরিক ছন্দের বৈশিষ্ট্য এই যে এতে স্বরবৃত্তের চলতি মৌখিক ক্রিয়াপদের ব্যবহার সত্ত্বেও ফুটে উঠেছে অক্ষরবৃত্তের পৌরুষ ও গাম্ভীর্য—যেকথা প্রবোধচন্দ্র চমৎকার ক'রে বলেছেন দ্বিজেন্দ্রলালের স্বরাক্ষরিক ছন্দের বৈশিষ্ট্যের আলোচনাসূত্রে।

"দ্বিজেন্দ্রলালের একটি মস্ত কৃতিত্বই এইখানে যে, তিনি স্বরবৃত্ত ছন্দে অক্ষরবৃত্তের সমাহিত কদম মিশিয়ে এক নবছন্দের রসসৃষ্টি করেছেন—এমন কি মৌখিক হসন্তমধ্য ক্রিয়াপদের প্রয়োগ বজায় রেখে। আমরা অক্ষরবৃত্ত ছন্দের আলোচনায় দেখেছি যে, সে-ছন্দে হাল আমলে এক হসন্তমধ্য ক্রিয়াপদ ছাড়া

আর সব মৌখিক ক্রিয়াপদই পাংক্তেয় হয়েছে (যথা, পেরেছি, ছিলাম, দিয়েছিল···)। দ্বিজেন্দ্রলাল সবপ্রথম দেখালেন যাচ্ছি কর্‌ছি কর্‌তে খেল্‌তে বস্‌লাম কর্‌লাম জাতীয় হসন্তমধ্য ক্রিয়াপদ এনেও অক্ষরবৃত্তের গাম্ভীর্য অক্ষুণ্ণ রাখা সম্ভব।"

একথার মর্ম পরিগ্রহ করা যাবে আলেখ্যের নানা কবিতায়ই। অপিচ স্বরাক্ষরিক ছন্দ খানিকটা অক্ষরবৃত্ত-ধর্মী ব'লেই দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁর নবপ্রবর্তিত স্বরাক্ষরিক ছন্দে শব্দান্তে হসন্ত শব্দকেও সময়ে সময়ে অক্ষরবৃত্তভঙ্গিম ক'রে দ্বিমাত্রিক ধরেছেন, যথা তাঁর বিপত্নীক কবিতায় :

গাঢ় সহ। বেদনায়। সপ্রশ্ন নয়নে ॥ শুদ্ধ চেয়ে থাকে—এখানে "বেদনায়"কে অক্ষরবৃত্তভঙ্গিমায় চতুর্মাত্রিক ধরা হয়েছে, স্বরবৃত্তে "বেদনায়" ত্রিমাত্রিক।

আলেখ্যে দ্বিজেন্দ্রলাল একটি নতুন ছন্দ রচনা করেছেন ষট্‌স্বরপর্বিক—ষাণ্মাত্রিক অক্ষরবৃত্তের ভঙ্গিতেই। যথা :

উচ্চৈঃস্বরে মহা | বীর্যে আর্য জাতি | গালি দিচ্ছে যত | যবনে
কি

তোমার টাকা আছে | আছে না হয় টাকা | তোমার কাছে আমি |
কিছু চাচ্ছি নাক

স্বরবৃত্ত ছন্দে এ নব প্রবর্তন বৈ কি। স্বরাক্ষরিক ছন্দের অন্য সব বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে ছান্দসিকীতে সবিস্তারে আলোচনা করেছি। ইতি—

দি. কু. রা.।

ভূমিকা

আমার কতকগুলি পূর্বে মাসিক পত্রিকাদিতে প্রকাশিত ও কতকগুলি অপ্রকাশিত কবিতা একত্রিত ক'রে আলেখ্য নামে ছাপান গেল। আমার এগুলি পুস্তকাকারে ছাপাবার আদৌ মতলব ছিল না। জনকতক বন্ধুর বিশেষ অনুরোধে ছাপালাম।

যখন এ কবিতাগুলি বহির আকারে ছাপালামই, তখন এগুলির ছন্দ, ভাষা ও ভাব সম্বন্ধে কিছু বলা দরকার বিবেচনা করি।

প্রথমতঃ ছন্দ। এ কবিতাগুলির ছন্দ মাত্রিক (Syllabic); 'অক্ষর হিসাবে' ছন্দ নয়। দাশরথি রায়ের সময় কি তার পূর্ব হতে এ ছন্দ বঙ্গদেশে প্রচলিত আছে। ভারতচন্দ্র ও তাঁর পরবর্তী কবিগণ প্রায়ই এ ছন্দ বর্জন ক'রে 'অক্ষর হিসাবে' ছন্দ প্রবর্তিত করেন। আমি সেই পুরানো মাত্রিক ছন্দেই এ কবিতাগুলি রচনা করেছি। তফাৎ এই যে, আমি সেই ছন্দকে সম্পূর্ণভাবে মাত্রার ও তালের অধীন করতে চেষ্টা করেছি।

১ম উদাহরণ। |প্রাতরাশে |ব্যস্ত ছিলাম |আমি

|প্রান্তে, একা |বাটীর মধ্যে |নিচে ;

এ কবিতায় প্রতি পংক্তিতে মাত্রা দশ (অক্ষর যতই হোক); ও তাল বা ঝোঁক (কোথায় কোথায় ঝোঁক পড়বে, তা মাথায় দাঁড়ি টেনে দেখানো হয়েছে) প্রতি পংক্তিতে তিন।

২য় উদাহরণ। |কথায় |কথায় |যাচ্ছে শুধু |কথা বেড়ে

|গানে |গানে |ছেয়ে পড়লো |দেশটা।

এখানে মাত্রা প্রতি দুই পংক্তিতে পর্যায়ক্রমে বারো ও দশ। তাল প্রতি পংক্তিতে চার। প্রতি দ্বিতীয় পংক্তির শেষ মাত্রা (দশম মাত্রা) যুক্তাক্ষরধ্বনিক।

|　　|　　|　　|　　|
৩য় উদাহরণ।　কাব্য　নয়ক　ছন্দোবন্ধ
|　　|　　|　　|
মিষ্ট শব্দের কথার হার

এখানে মাত্রা পর্যায়ক্রমিক আট ও সাত।　তাল প্রতি পংক্তিতে চার।

|　　|　　|　　|
৪র্থ উদাহরণ।　সহে না ক কিছুই বেশি সহে না ক রাজাধিরাজ
|　　|　　|　　|
অতি দম্ভী অত্যাচারী পেতে হবে সাজা।

এখানে মাত্রা আনুক্রমিক ষোল ও চৌদ্দ।　তাল প্রতি পংক্তিতে চার।

তাল বিভাগ ক'রে আরো বাড়ানো যায়; তবে তাতে ছন্দ রচনা করা একটু অধিক দুরূহ হয়। অনেক সময় তাল ঠিক কোন্ জায়গায় পড়বে, তা অর্থের উপর নির্ভর করে।

আর উদাহরণ দেওয়ার প্রয়োজন নাই বোধ হয়। একবার ব্যাপারটা অভ্যস্ত হয়ে গেলে পরে এ ছন্দ পড়া অত্যন্ত সোজা হবে। আর এই ছন্দের মধ্যে একটা বিশেষ শৃঙ্খলা সঙ্গীত ও শক্তি লক্ষিত হবে।

এ ছন্দ যে প্রচলিত ছন্দের চেয়ে অধিক স্বাভাবিক, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। "কোমল তরল জল" কেহ "কো-ম-ল-ত-র-ল-জ-ল" পড়ে না, "কোমল্ তরল্ জল্" পড়ে। এ ছন্দেও শেষোক্ত রূপ উচ্চারণ (অর্থাৎ শব্দের যেরূপ উচ্চারণ কথাবার্তায় ব্যবহৃত হয়, সেই রকম উচ্চারণ) করতে হবে। অন্যরূপ উচ্চারণ করলে ছন্দ মাত্রিক হবে না ও যতি ভঙ্গ হবে।

তার পরে ভাষা। যতদূর স্বাভাবিক ও প্রচলিত ভাষা ব্যবহার করতে পারি (সুশ্রাব্যতা, মর্যাদা ও সদর্থ বজায় রেখে) চেষ্টা করেছি। ক্রিয়াপদের সর্বত্রই প্রচলিত আকার ব্যবহার করেছি—যেমন যাচ্ছি, করছিলাম ইত্যাদি। অন্য পদ নির্বাচনে আমার লক্ষ্য প্রধানতঃ প্রচলিত শব্দ ব্যবহার করা। তবে অপ্রচলিত শব্দ একেবারে বর্জন করি নি। নানা খনি হতে রত্ন আহরণ করায় ভাষার ক্ষতি নাই, বরং তাতে সমূহ লাভ। তবে আমার ধারণা এই যে,

যেখানে বাংলা শব্দ বা বচন আসল বাংলা ভাবটি বেশি জোরে প্রকাশ করে, অথবা যেখানে বাংলা শব্দটি বা বচনটি বেশ নিজের জোরে দাঁড়াতে পারে, সেখানে সেই বাংলা শব্দ ও বচনই ব্যবহার করা কর্তব্য। তাতেই বাংলা কবিতা হবে। ইংরাজি বা সংস্কৃত বচন অনুকরণ ক'রে লিখলে সে ইংরাজি বা সংস্কৃত কবিতার অনুকরণ হবে। কবিতা হবে না। "গুঁতোর চোটে বাবা বলায়" কি "ভাতে মেরো না" এই রকম জোরের বচন ইংরাজিতে বা সংস্কৃততে কেহ অনুবাদ করুন দেখি। ইতি—

গ্রন্থকারস্য

ঘুমন্ত শিশু

হেমন্তে,—নিস্তব্ধ স্নিগ্ধ শান্ত দুপুর বেলা,
বকুলতলায় ঘাসের উপর, একান্ত একেলা,
ধুলা নিয়ে আপন মনে খেলা ক'রে খানিক,
ঘুমিয়ে গেছে যাদু আমার, ঘুমিয়ে গেছে মানিক।

ধুলার প্রাসাদ তৈরি ক'রে বাছার গরব ভারি ;
নিজের বাহাদুরিটুকু করতে যেন জারি,
বাজাচ্ছিল কাঠি দিয়ে কাঠের বাক্স ভাঙা,
হাস্যে আরো মিষ্ট ক'রে ওষ্ঠ দুটি রাঙা,
আপন মনে তৈরি সুরে আপন মনে গেয়ে ;—
এমন সময় ঘুমটি এল নয়ন দুটি ছেয়ে,
অঙ্গ এল অবশ হয়ে, খেলা গেল চুকে,
হাতের কাঠি রৈল হাতে, মুখের হাসি মুখে,
চক্ষু দুটি মুদে এল ;—শীতল শান্ত দুপর।
সোনার বাছা ঘুমিয়ে গেল শ্যামল ঘাসের উপর।

মন্দীভূত ক'রে আরো শীতের সূর্যতাপে
বহে বাতাস ;—চুলগুলি তার সেই বাতাসে কাঁপে ;
মর্মরিয়া রৌদ্রতলে তরুর পত্র নড়ে,
ঝিকিমিকি কিরণ বাছার মুখে এসে পড়ে ;
উপর দিকে ঘনশ্যামল চন্দ্রাতপ রাজে ;
নিচের শাখে ঘুঘু ডাকে পাতার কুঞ্জ মাঝে ;
ঘিরে তারে চারি ধারে, হরিৎক্ষেত্র হেন
রবির করে ছবির মতন,—নড়ে না ক যেন ;

বৎস সঙ্গে চরে ধেনু দূরে দলে দলে ;
বাজায় বেণু রাখাল বালক আম্রগাছের তলে ;
সিঁচোয় বারি কৃষকনারী আলুর ক্ষুদ্র মাঠে ;
সুদূর জলায় পুরুষগুলি শীতের ধান্য কাটে ;
পথের গায়ে ইক্ষুছায়ে হরিণ ব'সে থাকে ;
যাচ্ছে ঘরে গ্রাম্যবধূ পূর্ণকুম্ভ কাঁকে ;
—চারি দিকে এমন শান্ত, নীরব, মধুর ছবি ;
ধূ ধূ করে ধূসর আকাশ, কিরণ দিচ্ছে রবি ;
তার মাঝেতে, সবার সেরা, সবার মধ্যস্থলে,
ঘুমিয়ে গেছে বাছা আমার বকুলগাছের তলে।

ওগো তোরা কতই জিনিস দেখেছিস্, না জানি ;
দেখেছিস্ কেউ কোনখানে এমন ছবিখানি ?
একা একা—না হতে তার সাঙ্গ ধুলাখেলা,—
এমন স্থান, এমন নিদ্রা, এমন দুপরবেলা ;—
পায়ের তলে ফেটে পড়ে তরুণ স্বর্ণপ্রভা ;
ঘুমিয়ে দুইটি মুঠোর ভিতর দুইটি রক্ত জবা ;
দুইটি গণ্ড 'পরে দুইটি রক্তপদ্ম ফোটে ;
অরুণ লেখা লেপেছে কে দুইটি রাঙা ঠোঁটে ;
বৃক্ষমূলে হেলান দিয়ে, বৃক্ষে রেখে মাথা ;
বিরল দুইটি ভুরুর নিচে আঁখির দুইটি পাতা ;
বকুলগাছটি চৌকি দিচ্ছে মাথায় ধ'রে ছাতি ;
মাটির উপর দিয়েছে কে শ্যামল শয্যা পাতি' ;
চরণে তার গড়ায় পৃথ্বী, উপরে নীল গগন ;—
মাঝখানে তার যাদু আমার গভীর নিদ্রামগন।

শরৎকালের পূর্ণশশী বড়ই মধুর বটে,
তারায় যখন ঘিরে থাকে নীল আকাশের পটে ;
দেখতে মধুর—শৈবালেতে ঘেরা শতদলে,
যখন একটি ফুটে থাকে সুনীল স্বচ্ছ জলে ;
—নাইক কিন্তু বিশ্বে কিছু এমন মনলোভা,
শ্যামল বনের মাঝে যেমন আমার বাছার শোভা।
তাহার শুধু শোভার জন্য সবার সৃষ্টি হেন ;
গরবিনী পৃথ্বী তারে বক্ষে ধ'রে যেন !
দেখতে সবাই পিছে যেন সারি বেঁধে দাঁড়ায়,—
বসুন্ধরা নিয়ে তারে ঘুমটি কেমন পাড়ায় !

এ কী খেয়াল বাছা রে তোর ? গাছের তলে, ভুঁয়ে,
কেবল দুটো ঘাস বিছানো ধুলার উপর শুয়ে ?
মৌরুষি তোর মায়ের কোলে, বাপের বুকে, হেন
ছেড়ে এসে, বাছা রে তুই হেথায় শুয়ে কেন ?
আয় রে আমার ননীর পুতুল, আয় রে আমার পাখি,
—ধুলায় কেন ? আয় রে তোরে বুকে ক'রে রাখি।

না না ;—ঘুমা এমনি ক'রে—আহা মরি, এ কি
মধুর ছবি !—ঘুমা, আমি নয়ন ভ'রে দেখি !
এমন বকুলতলায়, এমন শান্ত বনভূমে,
আরো খানিক থাক্ রে যাদু, মগ্ন গাঢ় ঘুমে।
চিত্রকরটি হতাম যদি, তোরে এমন দেখে,
রেখে দিতাম যত্ন ক'রে সোনার পটে এঁকে।
ঘুমা এমনি মুগ্ধ হ'য়ে দেখি আমি খানিক,
ঘুমা আমার সোনার যাদু, ঘুমা আমার মানিক।

কার্ত্তিক, ১৩০৮

———

পুত্রকন্যার বিবাদ

প্রাতরাশে ব্যস্ত ছিলাম আমি,
প্রাহ্নে, একা বাটীর মধ্যে নিচে ;—
সম্মুখে এক সম্মার্জনী ছটা ;
ছেঁড়া চটির একটি পাটি পিছে
ডাইনে বামে কিয়ৎ পরিমাণে—
ঘড়া এবং ঘটি এবং বাটি ;
মাথার উপর সিকেয় তোলা গদি ;
ঘরের কোণে জড়ানো এক পাটি ;
রাস্তার উপর কুকুরদলের বিবাদ ;
আশে পাশে বিড়াল বেড়ায় ঘুরে ;
দাঁড়ে ব'সে চেঁচাচ্ছে এক টিয়া ;
রসুই-বামুন চেঁচাচ্ছে অদূরে ;
উপরতলায় দাসের এবং দাসীর
মহাতর্ক,—কলধ্বনি তুলি ;
গৃহিণীটি ব্যস্ত গৃহকাজে ;
করছে ঝগড়া পুত্রকন্যাগুলি।

পুত্র কন্যার কলহ কি কারণ
খুঁজতে গিয়ে, দেখ্‌লাম নহে কিছু—
কন্যা একটি রঙিন পিঁড়েয় ব'সে,
পুত্র তারে ঠেলা দিচ্ছেন পিছু ;
পুত্র যাচ্ছেন আসন করতে দখল,
কন্যা কিন্তু নাছোড়বন্দ তাহে ;—
একজন রাজ্য-আক্রমণকারী,
আর একজন তা রক্ষা করতে চাহে।

পুত্র কিন্তু বয়োজ্যেষ্ঠ, বিশেষ
বলিষ্ঠ সে স্বতই কন্যার চেয়ে ;
যতই পুত্র পিঠে দিচ্ছেন ঠেলা,
ততই উচ্চ চেঁচাচ্ছেন তাই মেয়ে ;
অন্তরে বিরক্ত হচ্চি ক্রমেই,
কথা কিছু কচ্ছি না ক কাকে ;
বিচার করছি কেবল মনে মনে—
ছেলে পিলে অমন ক'রেই থাকে।

ব্রাহ্মণ দিতে খাবার করছে দেরি,
সে দিক্ পানে আশায় চেয়ে আছি ;—
ঘরের বাইরে বিষম রকম গরম,
ঘরের মধ্যে বিষম রকম মাছি।
পরে যখন খাবার এল শেষে,
(নহে চর্ব্য চূষ্য লেহ্য পেয়)
যৎসামান্য তণ্ডুল এবং ডাউল,
বিষম রকম গরম দেখি সে-ও ;
—এখন ধরুন আমি কোনো কালেই
নহি যোগী ঋষি কিম্বা মুনি,
ধাতু কিম্বা প্রস্তর কিম্বা মাটি,
কিম্বা কোনো বিশেষ রকম গুণী ;
আমি একটা সাদাসিদে মানুষ ;—
তপ্ত অন্নের সংস্পর্শেতে এসে,
সমান তপ্ত হ'ল আমার মেজাজ,
বিশ্বের উপর চ'টে উঠলাম শেষে।

ঠিক এ সময়, পুত্ররত্ন দ্বারা
সর্বাপেক্ষা প্রবল ধাক্কা খেয়ে,
চিৎপাত হ'য়ে মাটির উপর প'ড়ে,
চীৎকার ছেড়ে কেঁদে উঠ্‌ল মেয়ে।

তখন আমি ধৈর্যচ্যুত হ'য়ে
পুত্রে দিলাম ভীষণ তাড়া হেন ;
থেমে গেল কন্যার রোদন ভয়ে,
পুত্রও ভয়ে কেঁপে উঠ্‌ল যেন।

—এখন সবাই আমায় বলেন, আমি
কন্যার চেয়ে পুত্রের দিকেই টানি ;
সেটা যা হোক, এটা কিন্তু দেখি :
কন্যার চেয়ে পুত্রই অভিমানী।—
তাড়া খেয়ে, পিঁড়ের মায়া ছেড়ে,
মেয়ের সঙ্গে ঝগড়াঝাঁটি ফেলে,
উঠে গিয়ে কাঁদো কাঁদো মুখে,
দাঁড়াল এক ঘরের কোণে ছেলে।
তখন মেয়ে—বল্‌ব আমি খুলে ?
বিশ্বাস হয়ত করবে না ক তুমি—
যখন দেখল যুদ্ধে সে-ই জয়ী,
পরিত্যক্ত শূন্য যুদ্ধ-ভূমি ;
নিষ্ঠুর তাহার অত্যাচারী 'দাদা'
নিতান্তই পরাস্ত সে স্থানে,
দুঃখে অবনত চক্ষু দুটি
ছল ছল, ক্ষোভে, অভিমানে ;

তখন মেয়ে—বল্‌তে গিয়ে আজি,
বাষ্পে হঠাৎ ছেয়ে আসে আঁখি,
এমন মধুর বিমল দৃশ্য আমি
পৃথিবীতে অল্পই দেখে থাকি—
তখন কন্যা আসন থেকে উঠে,
গেল চ'লে দাদার কাছে ছুটে,
ছল ছল চক্ষে সকাতরে
ধ'রে দুটি দাদার করপুটে—
কহে "দাদা ব'সো"—এই ভাবে
যেন সেই-ই কতই অপরাধী—
"ব'সো দাদা, আসন দেছি ছেড়ে,
ব'সো দাদা হাতে ধ'রে সাধি।"

মরি! মরি! এ কী মধুর ছবি!
ওরে শিশু! ওরে ক্ষুদ্র নারী!
এই মায়ায়, এই স্বার্থত্যাগে
পেলি কোথা বুঝতে নাহি পারি!
কোথা গেল বৈজ্ঞানিকী বাণী?
—তোরে শিশু শেখায় নি ত কেহ—
পৃথিবীটা স্বার্থভরা যদি,
তুই রে কোথা পেলি এত স্নেহ?
অঙ্কুরিত এই পুষ্পবীজই,
বিশ্বের এই আবর্জনার স্তূপে,
পরে বুঝি হয় রে প্রস্ফুটিত
'সরলা' কি 'সূর্যমুখী'রূপে।

পুরুষেরা ত স্বার্থমগ্ন : যদি
রৈত স্বার্থ নারীর প্রেমমূলে,
আমাদের এই পাপের বসুন্ধরা
পাপে ভ'রে উঠ্‌ত কূলে কূলে।

মরি! মরি! এ কী দৃশ্য! এ কী
ধরিলি রে আমার চোখের কাছে!
এ-পদার্থ কোথা হতে এল!
এও না কি পৃথিবীতে আছে!
মিথ্যাদ্বন্দ্বহিংসালিপ্সাভরা
স্বার্থময় এ-শুষ্ক ধরাতলে,
এও আছে?—দেখে যে এ-ছবি
চক্ষু ভ'রে আসে বাষ্প-জলে!

মনে হ'ল—শুধু স্বার্থ নহে,
স্বার্থত্যাগও আছে এ সংসারে;
পৃথিবীটা যত খারাপ ভাবি,
তত খারাপ না হতেও পারে।

মাঘ, ১৩০৯

নূতন মাতা

"আয় চাঁদ আ'রে		চিক্ দিয়ে যা রে" !
নূতন মেয়ে কোলে		মাতা, মধুর বোলে,
কত না আহ্লাদে,		ডাক্‌ছে পূর্ণ চাঁদে—
"আয় চাঁদ আ'রে		চিক্ দিয়ে যা রে।"

সুনীল সন্ধ্যাকাশে		শরচ্চন্দ্র ভাসে,
পূর্বাঙ্গনে। ধীরে,		সুমন্দ সমীরে,
পুষ্পগন্ধ মধুর		ভেসে আস্‌ছে, অদূর
ফুলের বাগান হ'তে,		অন্তঃপুরে। পথে
বালকবৃন্দ চলে,		উচ্চ কোলাহলে,
উজ্জ্বল হাস্যমুখে,		চিন্তাশূন্য সুখে।
গাছের উপর থেকে		উঠ্‌ছে ডেকে ডেকে
পাপিয়া এক। দূরে		প্রবল মিঠে সুরে,
ব'সে কোন্ এক চাষী,		বাজায় মেঠো বাঁশি,
—বাঁশির ধ্বনি ধেয়ে,		সুনীল আকাশ ছেয়ে,
পড়্‌ছে গিয়ে শেষে		ধরার উপর এসে,
ছড়িয়ে ইতস্ততঃ		তারাবাজির ম'ত।

এমন সময় ব'সে		বাড়ির মধ্যে, ও সে
নূতন মাতা,—কোলে		একটি পুষ্প দোলে—
ডাকছে মধুর ডাকে,		পূর্ণ চন্দ্রমাকে—
"আয় চাঁদ আ'রে		চিক্ দিয়ে যা রে !"

চাঁদের কিরণ এসে,		মেয়ের মায়ের কেশে,
কোমল মুখে, দেহে,		পড়েছে সে, ছেয়ে।

চাঁদের কিরণ, এসে
মেয়ের কচি মুখে,
ঢ'লে পড়েছে সে
মেয়ের কচি বুকে।

ডাকছে মাতা চাঁদে,
বড় আদর ভরে,
"আয় চাঁদ আ'রে,
বড় মনের সাধে,
বড মধুর স্বরে—
চিক্ দিয়ে যা রে!"

চাঁদটি ব'সে হাসে
শান্ত নীলাকাশে
জানি না কোন্ প্রাণে
রয়েছে সেখানে,
এ ডাক শুনেও বসি'
কঠিন শরৎ শশী।
ডাকে মা "চাঁদ আ'রে
চিক্ দিয়ে যা রে!"
এক বার তাকায় সাধে
আকাশের ঐ চাঁদে,
আবার তাকায় সুখে
কোলের চাঁদের মুখে।
হাসে মেয়ে! ডাকে
শরচ্চন্দ্রমাকে
সঙ্গে সঙ্গে—"আ'রে
চিক্ দিয়ে যা রে"
—হাসে মেয়ে। হাসে
চন্দ্র নীলাকাশে।
হাসে মা।—এ ধরায়,
তিনের হাসি গড়ায়
লুকিয়ে লুকিয়ে আমি,
মেয়ের মায়ের স্বামী
লুকিয়ে আমি কবি
তুলে নিলাম ছবি।

কার্ত্তিক, ১৩১০

বুড়োবুড়ি

যাপন করি দীর্ঘ দিবা, দুঃখে সুখে একত্রে সে,—এখন সন্ধ্যাবেলা,
—এখনো সে পরস্পরে বিভোর আছে হৃদয় দুটি, খেল্‌ছে প্রেমের খেলা।
কত ঝঞ্ঝার মধ্য দিয়া প্রবাহিয়া, যুগ্মতরী, প্রকৃত প্রস্তাবে,
আজি পৌছিয়াছে শেষে দ্বীপের উপকূলে এসে অবিচ্ছিন্ন ভাবে।

অঙ্কুরিত হয়েছিল প্রায় অর্ধশতাব্দী পূর্বে, এ প্রেম—সঙ্গোপনে,
নিভৃতে, এক গ্রামের কোণে, শুভক্ষণে, অলক্ষিত, দূরে, উপবনে।
জেগেছিল সুদিনে সে ;—সূর্যের মধুর কিরণ গায়ে লেগেছিল এসে ;
বহেছিল মধুর বাতাস ; গেয়েছিল পাখি ; আকাশ চেয়েছিল হেসে।
সে-তরুটি ক্রমে ক্রমে বড় হ'ল ; কুসুমরাশি ফুট্‌ল কত গাছে ;
কত শীতে, কত রৌদ্রে, কত ঝঞ্ঝায়, এ-তরুটি আজো টিঁকে আছে।

বড়ই মধুর প্রথম প্রেমের প্রথম আবেগ, প্রথম বিকাশ, প্রথম মিলন আশা
বড়ই মধুর পরস্পরে চুরি করা প্রথম দৃষ্টি, প্রথম প্রেমের ভাষা।
বুড়োবুড়ির প্রেমে নাই সে উচ্ছ্বাসটি, সে-তরঙ্গ, কল্লোল, আজি যদি ;
এ-প্রেম বহে সুনীল, স্বচ্ছ সমুদ্রসঙ্গমের ম'ত, গভীর নিরবধি।
দুইটি হৃদয়, দুইটি ইচ্ছা, একটি সূত্রে চিরজীবন, বাঁধা আছে যবে ;
হয় নি কভু তাদের বিবাদ, বিলাপ, বিরাগ পরস্পরে, কে শুনেছে কবে ?
মানুষ স্বতই স্বার্থমগ্ন ; নিজের সুখটি সবার চেয়ে নিত্য বোঝে বটে ;
যে তার বাধা, যে তার বিঘ্ন—তা অবশ্যম্ভাবী হ'লেও তার উপরে চটে।
ছেয়ে তাদের যুগল-জীবন গেছে হেন কতই বিবাদ, বিপদ-আপদরাশি ;
এখনো ত টিঁকে আছে ; হর্ষ আছে মনের ভিতর, মুখে আছে হাসি।

তাই ত বলি এ দৃশ্যটি একটি অতি মধুর বস্তু—এ অপূর্ব জুড়ি ;
পরস্পরে বিভোর আজো পরস্পরের হাতটি ধ'রে—বুড়ো এবং বুড়ি।

জ্যৈষ্ঠ, ১৩১

বিপত্নীক

শ্রান্ত দেহে, সন্ধ্যাকালে, ফিরে এসে, যখন
আপন ঘরে যাব ;
কাহার কাছে বলব এসে তখন আমি ?—কাহার
মুখের পানে চা'ব ?
ক্ষুদ্র দুঃখসুখের কথা কইব আমি এখন
কাহার কাছে এসে ?
যাহার কাছে কইতাম নিত্য,—গৃহ আঁধার ক'রে
চ'লে গিয়েছে সে।

অপমানে খিন্ন প্রাণে পড়তাম যখন, এসে,
তাহার কাছে লুটে ;
শান্তিসুধারাশি দিয়ে, ধুয়ে দিত ক্ষত,
কোমল করপুটে ;
শুভদৃষ্টি ছড়িয়ে দিত তাহার রূপের প্রভায়
পরিপূর্ণ ঘরে ;
বাড়ির যত কর্কশ ধ্বনি ঢেকে যেত, তাহার
কোমল কণ্ঠস্বরে।
বাণবিদ্ধ পাখির মত, বহির্জগৎ হতে
আসতাম যখন নীড়ে ;
তখন, নিত প্রাণের মধ্যে আমারে সে গভীর
স্নেহ দিয়ে ঘিরে।
ভাবতাম তখন—বহির্জগৎ আঁধার বটে আমার,
শূন্য বটে, মানি ;
তবু একটি স্নিগ্ধজ্যোতি বিমল হাস্যে পূর্ণ
আমার গৃহখানি।

অতি বিজন, গাছে ঘেরা, পরিত্যক্ত মাঠে,
বেঁধেছিলাম কুঁড়ে ;
ভেবেছিলাম, বাকি জীবন তাতেই কাটিয়ে দেবো ;
—তাও গেল পুড়ে।
সংসার পেতে নিয়েছিলাম, সাজ ক'রে আমার
সাধের বেচা কেনা ;
বসেছিলাম, মিটিয়ে দিয়ে, হিসাব নিকাশ ক'রে,
সবার পাওনা দেনা ;
যাহা কিছু এ-জগতে আমার ব'লে দাওয়া
করতে পারি, জানি,
তাহাই দিয়ে, যত্ন ক'রে, সাজিয়ে নিয়েছিলাম
আমার কুঁড়েখানি ;
পূর্বদিকের জানালাতে টাঙিয়ে দিয়েছিলাম
রঙিন একটি "চিকে" ;
একটা ছোট সরু রাস্তা তৈরি করেছিলাম
বাড়ির উত্তর দিকে ;
লাগিয়েছিলাম পশ্চিম দিকে গোটাকতক ঝাউয়ে,
বেড়ার ধারে ধারে ;
দক্ষিণ দিকে গোটাকত বেলাফুলের গাছে,
কেয়াফুলের ঝাড়ে ;
এমন সময় এসে, কে গো আমার বাগানখানি
লুটে পুটে নিল !
—এমন সময় এসে, কে গো আমার কুঁড়ে ঘরে
আগুন ধরিয়ে দিল !
অমনি আমার কুঁড়ের সঙ্গে, সোনার স্বপ্ন আমার
হ'য়ে গেল ছাই ;

গেছে, গেছে, সবই গেছে উড়ে পুড়ে গেছে,
—চিহ্ন মাত্র নাই।

চাই নি আমি কখনো ত কারো কাছে কিছু,
দেয় নি কিছু কেহ ;
কেবল তুমি, প্রিয়তমে, দিয়েছিলে, গভীর
অযাচিত স্নেহ।
তোমায় আমায় বিবাদ হয় নি, এমন মিথ্যা কথা
কেমন ক'রে কই ?
কখনো বা আমার কসুর, কখনো বা তোমার,
হবে অবশ্যই।
তুমি মানুষ, আমি মানুষ, গড়া দোষে গুণে,
—একটু বেশি কম ;
তদুপরি অনেক সময়ই, বুঝতে পরস্পরে
হ'তে পারে ভ্রম।
তবু, তুমি আমায় ভালবেসেছিলে, জানি,
ভ'রে তোমার বুক,
হেথায় অনেক স্বামীর ভাগ্যে ঘটে না সর্বদা
যে সৌভাগ্যটুক্।

অনেক সময় অনেক বিপদ্, অনেক জ্বালা, ছিল—
অনেক দুঃখরাশি ;
করেছিলে, তুমি প্রিয়ে, আমার আঁধার নিশায়
শুক্লপৌর্ণমাসী।
বহেছিলে কোথা থেকে এসে, স্বচ্ছতোয়া
নির্ঝরিণী তুমি।

করেছিলে সুশ্যামলা, তোমার স্নেহে, আমার
হৃদয়-মরুভূমি।
আমার হৃদয়-সরোবরে পদ্মফুলের মতন
তুমি ফুটেছিলে।
আমার নীরস বৃক্ষকাণ্ডে বনলতার মতন
জড়িয়ে উঠেছিলে।
পুষ্পিত অটবী দিয়ে, দিয়েছিলে পাহাড়
ঘেরে চারি দিক্।
গেয়েছিলে আমার বাব্‌লা গাছের উপর এসে,
হে বসন্ত পিক!

বিধির কাছে আমরা, প্রিয়ে!—অনেক স্তুতি ক'রে,
পেয়েছিলাম, চেয়ে,
এমন কিছু বেশি নহে,—একটি মাত্র ছেলে,
একটি মাত্র মেয়ে,
মেয়েটি তার মায়ের আদর, ছেলেটি তার বাপের,
বিভাগ ক'রে নিয়ে,
খেলা করত, বিবাদ করত, নালিশ করত, তাদের
মায়ের কাছে গিয়ে।
এখন তারা তাদের মায়ে কোথাও পায় না খুঁজে
—ছুটি মাতৃহারা—
চাহে আমার মুখের পানে, অমনি বেগে আমার
চক্ষে বহে ধারা।
যখন তারা বিবাদ করে, নালিশ করে, এখন
আমার কাছে এসে;

দোষী এবং নির্দোষীকে ধরি সমভাবে
জড়িয়ে বক্ষোদেশে।

যেমন কেহ, বিষম যদি আঘাত লাগে শিরে,
—প্রশ্ন করো তাকে :
'কোথায় লেগেছে ?' সে সেটা বল্‌তে পারে না ক-
স্তম্ভিত হয়ে থাকে।
এরাও বুঝ্‌তে পারে না ক, কোথায় ব্যথা তাদের
সরল ক্ষুদ্র মতি !
জিজ্ঞাসাও করে না ক কী হয়েছে তাদের,—
সে কী মহা ক্ষতি ;
দেখ্‌লে বিষাদ মুখে আমার, চক্ষে আমার বারি,
—জড়িয়ে আমাকে
গাঢ় সহবেদনায় সপ্রশ্ন নয়নে,
শুদ্ধ চেয়ে থাকে।

দিবসের পর দিবস আসে, মাসের পরে মাস,
আসে এই ভাবে ;
বর্ষের পরে বর্ষ কত জানি না এরূপে
এসে চ'লে যাবে !
চলেছি ত এইরূপেই এ-জীবনপথে,
শান্তিসুপ্তিহীন ;
জানি নাও কখনো কি তাহার সঙ্গে দেখা
হবে কোন দিন !

যতখানি দেখা যাচ্ছে,—ধূ ধূ করে শুধু
অসীম বারিনিধি!
অহো—কী মনুষ্যজন্মই তোমার বিশ্বে তৈয়ের
করেছিলে বিধি!

জ্যৈষ্ঠ, ১৩১১

মাতৃহারা

সাঙ্গ হ'লে দিনের খেলা, খেয়ে চারটি তাড়াতাড়ি,
সন্ধ্যাটি না হতে হতেই, গাঢ় ঘুমের ঘোরে,
ঘুমোচ্ছিস্ রে মানিক আমার, মাতৃহারা ও রে!
পাঁচ মিনিট না যেতে যেতেই, ঘুমিয়ে গেছিস্, নেতিয়ে গেছিস্,
বাছা আমার আদুরে!
—ওরে আমার যাদু রে!

কে দিল তোর মাথায় বালিশ? কে দিল তোর চাদর গায়ে?
কে পাড়াল ঘুম?
ওরে আমার ভাঙা ঘরে চাঁদের আলো! ওরে আমার
বৃন্তচ্যুত ভূলুণ্ঠিত মন্দার কুসুম!
শুনৃত হুকুম, করত পেয়ার,
যে জন, এখন নাই ত সে আর;
মায়া কাটিয়ে চ'লে সে ত গেছে এখান থেকে;
তোকে যাদু আমার কাছে রেখে!

যতদিন সে ছিল হেথায়, তোর জন্যেই সে ছিল আকুল,
তুই ব'লে সে সারা ;
এখন একবার চোখের দেখা চেয়েও দেখে না সে তোরে,
—ওরে মাতৃহারা !
কোথায় যে সে চ'লে গেল
কিছুই তো না ব'লে গেল ;
এইটে কেবল বুঝিয়ে গেল সার,—
যে, ফির্বে না সে আর ।
যাহা কিছু বিশ্বাস ক'রে দিয়েছিলাম তাহার কাছে,
সে তা নিয়ে গেল ;
রচেছিলাম যে সংসারে এত দিনে, এত শ্রমে ;
—ভাসিয়ে দিয়ে গেল ।
এখন আবার নূতন যত্নে, নূতন শ্রমে, নূতন ক'রে
নূতন সংসার রচি ;
আমি না হয় সেটা পারি, তুই যে নেহাৎ কচি !

না না, তুইই সইতে পারিস্, আমিই সইতে পারি না ক ;-
কী জিনিস যে হারিয়েছিস্ বুঝিস্ না ক তুই ।
এখন রে তোর কাছে,
তুল্যমূল্য স্বর্ণ লোষ্ট্র, দুই ।
তাহার উপর, শিশুর হাড়ে ভেঙে গেলে জোড়া লাগে,
আমাদের আর লাগে না ক জোড়া ;
তোদের যদি শুকায় গাছটি, শুকায় শুধু গাছের ডগা,
আমাদের যা একেবারে গোড়া ।

টানে ছুরি রেখা যদি জলের উপর, মিলায় সেটা ;
মিলায় না যা পাষাণ কেটে লেখে ;
আসে যদি প্রবল বাত্যা, নুইয়ে যায় সে ক্ষুদ্র তরু,
উচ্চ বৃক্ষে যায় সে ভেঙে রেখে।

সে যদি তোর থাক্‌ত, খানিক আবদার করতিস্ শোবার আগে,
দাবি করতিস চুমা ;
টেনে নিত বুকের মাঝে, গাইত সে সুমৃদুস্বরে
"ঘুমা যাদু ঘুমা !"
নাই সে যদি, নিজেই নিয়ে
চাদরখানি, গায়ে দিয়ে,
বালিশ দিয়ে মাথায় ;
ঘুমটি অমনি ছেয়ে এল আঁখির দুই পাতায় !
পাঁচ মিনিট না যেতে যেতেই, ঘুমিয়ে গেলি, নেতিয়ে গেলি,
ছেঁড়া একটা মাদুরে,
ওরে আমার যাদু রে !

বুঝিস্ না তুই নিজের দুঃখ, ওরে সুখী বালক—
তাই ত আছিস্ সুখে ;
বিজ্ঞ আমি, বুঝি সূক্ষ্ম,
বুঝি বেশি, তাই এ দুঃখ
বেশি বাজে বুকে।
তুই ত খাসা ঘুমাচ্ছিস্ রে বেটা !
আমার চোখেই নাইক নিদ্রা, পদ্য লিখছি আমি ব'সে,
তাহার উচিত মূল্য বুঝে আমার যত লেঠা !

তুইও বুঝবি বড় হ'লে, মনে পড়বে যখন
ছেলেবেলার কথা—
মায়ের যত্ন, মায়ের সেবা, সর্বদা, সর্বথা।
নিজের মায়ে আদর ক'রে ডাক্‌বে যখন কেহ ;
তখন রে তোর মনে পড়বে, বিশ্বজগৎ হতে
লুপ্ত মাতৃস্নেহ ;
তখন পড়বে মনে,
তুইও একদিন "মা মা" ব'লে ডাকতিস্ কোনো জনে।
—হা রে শিশু, এই কথাটি বড়ই বাজে প্রাণে—
যে তোর কাছে আছে এখন এই যে মধুর 'মা' শব্দটি
শুদ্ধ অভিধানে !
কী সে দুঃখ, কী সে দৈন্য, কী সে গভীর মহাক্ষতি,
এখন তুই আর সেটা
বুঝবি কী রে বেটা।

বুঝবি তখন পড়বি যখন মাতৃস্নেহের গাথা
ইতিহাসে অথবা অন্যথা ;
তখন রে তোর আপন মায়ের কথা
স্বপ্নের ম'ত ভেসে আস্‌বে সব ;
তখন বুঝবি মায়ের মূল্য ;
বুঝবি নাই কেউ মায়ের তুল্য ;
তখন যাদু মায়ের অভাব করবি অনুভব।

এখন ওরে মূঢ় শিশু, এখন কি তোর কাছে
মায়ের মূল্য আছে ?

এখন রে তোর কাছে মা কি মাসী পিসী মামী,
একটুখানি আদর দিলেই একই রকম দামী।
এখন, যখন জঠর জ্বলে, পেলেই হ'ল খাদ্য কিছু ;
কাছে একজন শুলেই হ'ল রাতে।
যে সে হোক না, বললেই হ'ল ভূতের কিম্বা বাঘের গল্প
খেলার সাথী পেলেই হ'ল, সাথে ;
এখন কী তুই বুঝবি ওরে মূঢ় !
সে সব যত প্রাণের কথা গূঢ় ?
মায়ের মূল্য—সেটা,
বুঝবি কী রে বেটা ?

—হায় রে যাদু, সকল দুঃখের বাড়া দুঃখ এই
নিজের দুঃখ বুঝতেও না পারা !
সেই দুঃখে দুঃখী যে তুই—ওরে মাতৃহারা ?
তাই না তোরে দেখে এমন ভূমিতলে একা অসহায়,
ওরে আমার হৃদয় ফেটে যায় ;
ওরে আমার চক্ষে বহে ধারা ;
ওরে মাতৃহারা !

বিধবা

গভীর দু'পর পৌর্ণমাসী নিশি ;
নিস্তব্ধ, নিস্পন্দ, দশ দিশি ।—
স্তব্ধ ভুবন, স্তব্ধ গগন ; ধরণীটি নিদ্রামগন ;
চাঁদের কিরণ পড়েছে তার মুখে,
শস্যক্ষেত্রে, বনস্থলে, কালো দীঘির কালো জলে,
বিজন পথে, বিজন মাঠের বুকে ।
গাভীরা সব ঘুমায় পীঁড়ে ; পাখীরা সব ঘুমায় নীড়ে ;
মানুষরা সব ঘুমায় নিজের ঘরে ;
আকাশে মেঘ ঘুমিয়ে আছে ; পুষ্পগুলি ঘুমায় গাছে ;
ঘুমায় সবাই বিশ্ব-চরাচরে ।
কেবল ধীরে, অতি ধীরে, ঢেউয়ের মত, বিশ্বতীরে
মাঝে মাঝে বাতাস লাগ্‌ছে আসি ;
কেবল দূরে, অতি দূরে, ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে, মেঠো সুরে,
উঠ্‌ছে কোন্ এক হতভাগ্যের বাঁশি ।

* * * *

এমন সময়, শূন্য ঘরে, কে গো তুমি ভূমি 'পরে,
ব'সে মুক্ত বাতায়নের মূলে ?
একাকিনী আছ চেয়ে, কে তুমি সুন্দরী মেয়ে,
স্রস্তবসন, স্রস্ত এলোচুলে ?
ছড়িয়ে দুটি রাঙা পায়ে, হেলান দিয়ে কবাট-গায়ে,
মরালগ্রীবা বাঁকিয়ে বাইরের দিকে ;
একটি হস্ত ন্যস্ত ক্রোড়ে, একটি গরাদেটি ধ'রে,
চেয়ে আছ কে গো অনিমিখে ?

দেখছ কি মা ?—পথে, গাছে, এমন কী মা! দেখ্‌বার আছে,
এতক্ষণ যা দেখ্‌তে লাগে ভালো ?
কুঞ্জ-বনের শ্যামল কায়া ? মাঠের হরিৎ ? গাছের ছায়া ?
দীঘির জলে, চাঁদের সাদা আলো ?
—আকাশ সুনীল, ধরা শ্যামা, কিছুই তুমি দেখ্‌ছ না মা ;
দেখ্‌ছ, ব'সে বাতায়নের ধারে,—
জীবন-গ্রন্থখানি খুলি, অতীত কালের পৃষ্ঠাগুলি,
উল্টে পাল্টে তাহাই বারে বারে।
দেখ্‌ছ মানস-চক্ষু দিয়ে, ভূত কালে ফিরে গিয়ে,
(এখন থেকে ষোড়শ বর্ষ পাছে,
স্মৃতিবলে করছ চারণ ;) করছ অতীত জীবনধারণ ;—
চর্ম-চক্ষু চেয়ে মাত্র আছে।

*   *   *   *

কত কথা মনে আসে : কত লুপ্ত ইতিহাসে,
—গাঢ়ভাবে ছেয়ে আছে স্মৃতি !
কত ক্ষুদ্র সুখ ব্যথা, বাল্যকালের কত কথা,
কত হাস্য, কত গল্প, গীতি !

মনে পড়ে—সকাল বেলা, বাড়ির ছায়ায়, ঘুঁটি খেলা ;
ফল্‌সা পাড়্‌তে গাছের উপর ওঠা।
মনে পড়ে—চাঁপায় ঘিরে ভোমরাগুলো ঘোরে ফিরে ;
মনে পড়ে অশোক কুসুম ফোটা।
মনে পড়ে—বেলা দু'পর, ছায়ায়, শ্যামল ঘাসের উপর,
রৈতে ব'সে—দেখ্‌তে চেয়ে চেয়ে—
পুরুষগুলো নাইছে ঘাটে, গাভীগুলো চরছে মাঠে,
পদ্মগুলো কালো দীঘি ছেয়ে।

মনে পড়ে,—সন্ধ্যাকালে, ফেরে গাভী পালে পালে ;
অস্তগামী রবির শোভা কত ;—
কিরণ, আকাশ ছাপিয়ে এসে, পৃথিবীতে পড়েছে সে,
সাজিয়ে তারে বিয়ের কনের মত।
রাত্রিকালে—ঘরের কোণা,—দিদিমায়ের গল্প শোনা
রামের বিয়ে, কীর্তি ভুলো ক্ষ্যাপার,
জটাই বুড়ি, হীরের মাটি, মরণ-কাটি জীয়ন-কাটি,
ভূতের যত অনাসৃষ্টি ব্যাপার।
—কত সুদিন, এমনি এসে, ভেসে চ'লে গিয়েছে সে,
সকাল, দুপুর, সন্ধ্যা, রাত্রিবেলা ;
ভাবনা চিন্তা নাহি জানে—ক্ষুধা তৃষ্ণা নাহি মানে—
কেবল হাস্য, গীতি, গল্প, খেলা।
পরে একদিন—মনে পড়ে : শুভ কোলাহল-স্বরে,
শুভ বাদ্যে, শুভ শঙ্খরবে,
দীপোজ্জ্বল গৃহাঙ্গনে, শুভ লগ্নে শুভ ক্ষণে,
সুসজ্জিত শুভ মহোৎসবে,—
আপন জনে ক'রে 'পর', গেলে তুমি পরের ঘর,—
কর্‌তে গেলে পরের জনে আপন ;
বুঝ্‌লে পতি কারে বলে, বাস্‌লে ভালো ধরাতলে,
করলে দুটি মধুর বর্ষ যাপন।

* * * *

কী মধুর সে বর্ষ দুটি : যেন একটা লাগাও ছুটি !
যেন একটা অবিশ্রান্ত গীতি !
যেন একটা মলয় হাওয়া ! যেন শুদ্ধ ভেসে যাওয়া !
যেন একটা স্বপ্নরাজ্যে স্থিতি !

এ জীবনে সে সুখ পরম! সর্ববিধ সুখের চরম!
সে-সুখে নাই কলঙ্ক কি ক্রুটি;
স্বর্গ মর্ত্ত্যে আসে নেমে; মর্ত্ত্য স্বর্গে উঠে প্রেমে;
প্রেমের সেই সে প্রথম বর্ষ দুটি!
আজি, স্তব্ধ দ্বিপ্রহরে, সে-সব কথা মনে পড়ে,—
মনে পড়ে প্রাণের কথা নানা;
প্রথম দিনে, শুভ ক্ষণে, অজানিত-পূর্ব জনে
এ-সংসারে আপন ব'লে জানা।
মনে পড়ে,—শ্বশুরঘরে, কত ক্ষুদ্র ছলভরে
নিত্য পতির কাছে দিয়ে যাওয়া;
তাহার মুখটি অতুল সৃষ্টি; তাহার স্বরটি সুধাবৃষ্টি;
লুকিয়ে শোনা, লুকিয়ে তারে চাওয়া।
মনে পড়ে,—পতির, বধূর, নিভৃতে সে মিলন মধুর;—
সে চাহনি, সেই যুক্তপাণি;
অন্তত একদিনের জন্য বুঝ্‌তে পারা ভাষার দৈন্য;
অসংলগ্ন সে অস্ফুট বাণী;
অর্থশূন্য নানা উক্তি; ভালোবাসা নিয়ে যুক্তি:
"তুমি ভালোবাস না, তা জানি!"
"বাসি", "বাসি", "বাসি",—তারে বল্‌তে হবে বারে বারে;
অবিশ্বাস্য তথাপি সে বাণী!
অভিমানে ফিরে চাওয়া; হস্ত দুয়েক দূরে যাওয়া;
দাঁড়ানো; ও ফিরে গিয়ে সাধা;
চেষ্টা ক'রে বিবাদ-সৃষ্টি; চেষ্টা ক'রে বিরাগ-দৃষ্টি;
প্রাণপণে চেষ্টা ক'রে কাঁদা।
দুটি বর্ষ গেল কি এ? চ'লে গেল কোথা দিয়ে?
বিধির বিধি এমনি পরিপাটী!

সুখের বছর হয় সে গত একটি ছোট দিনের মত,
দুখের বছর যুগের মত কাটে।

একদিন, এখন—মনে আসে—প্রথম একদিন, চৈত্র মাসে,
পূর্ণচন্দ্রজ্যোৎস্নালোকে, একা,
বসেছিলে বাড়ির ছাদে, ছিলে চেয়ে পূর্ণ চাঁদে ;
ঝাউয়ের প্রান্তে যাচ্ছিল সে দেখা ;—
বইতেছিল বাতাস মধুর ; গাইতেছিল দোয়েল অদূর
বকুলগাছে ; এমনি সুনীল গগন ;
সেও সে এমনি রাত্রি দু'পর, একা তুমি ছাদের উপর
ছিলে ব'সে, স্বামীর চিন্তায় মগন ;
কী যে গাঢ় চিন্তা, ভয় সে ? কী সন্দেহ, অনিশ্চয়, সে ?
হৃদিতলে কী সে অন্তর্দাহ ?
নাইক নিদ্রা নেত্রপুটে ; হৃদয় কেঁপে কেঁপে উঠে ;—
কেন ?—পত্র পাও নি দু' সপ্তাহ।
সে শঙ্কা,—উভয়ের ভবে হয় ত আর না দেখা হবে ;
—অমনি বিশ্ব লুপ্ত অন্ধকারে।
তবে তারো মধ্যে লেখা ছিল একটি আশার রেখা—
'হয় ত আবার দেখা হতেও পারে।'
কিন্তু আজি, শুভাশুভ জীবনের যা, জান ধ্রুব ;—
দেখ্‌ছ তুমি স্পষ্টাক্ষরে লেখা ;
নিবিড় ভাবে, কালো ছত্রে, বিশ্ব-খাতায় জীবন-পত্রে :
"তার সঙ্গে আর হবে না ক দেখা !"
—যত আছে নিগূঢ় তথ্য, এর চেয়ে নয় কিছু সত্য,
যেটা আজি দেখ্‌ছ ব'সে তুমি ;

যতখানি হেঁটে যাচ্ছ, যতখানি দেখতে পাচ্ছ,—
ধূ ধূ করছে জীবন মরুভূমি।
মহাশূন্য, দগ্ধ সে যে, জ্বলছে অন্ধ-কারী তেজে,
অগ্নি নিয়ে খেলা করছে বায়ু;
নাই ক বারি, নাই ক তরু, কেবল বালু, কেবল মরু;
—শুষ্ক তপ্ত দীর্ঘ পরমায়ু।

*　　　　*　　　　*

রাত্রি গভীর হ'তে গভীর! পট-প্রান্তে বিশ্ব-ছবির
জ্যোৎস্নালেখা মুছে গেল ধীরে;
অলস হ'য়ে এলে আঁখি—গরাদেতেই মাথা রাখি'
ঘুমিয়ে পড়্‌ল আমার জননী রে।

*　　　　*　　　　*

হায় রে মানুষ! বিধির কৃত্য চোখের সাম্‌নে দেখ্‌ছি নিত্য;
তবু আমরা চক্ষু বুজে থাকি!
খোসামোদের মন্দির খুলে, মিথ্যার কৃষ্ণ নিশান তুলে,
উচ্চৈঃস্বরে, "দয়াল!" ব'লে ডাকি!

মদ্যপ

আমি না হয় বড়ই খারাপ, তোমরা ত সব আছ ভালো!
অনেক সাদা ভেড়ার মধ্যে দুটো একটা থাকেই কালো!
আমায় কেন গালি পাড়ো? করেছি কার কি অনিষ্ট?
বলেছি কি কারো কাছে আমি একটা যিশুখৃষ্ট?

দু'পয়সা যা ঘরে আনি, নিজের শ্রমেই এনে থাকি ;
উড়িয়ে দি তা উড়িয়ে দি, আর জমা রাখি জমা রাখি।
ফতুর হয়ে যে-দিন আমি তোমার কাছে চাইতে যাব,
না হয় দু'ঘা বসিয়ে দিও নীরব হয়ে লাঠি খাব।

আমায় তুমি ভালো বাসো? বলো যা তা অনুরাগে?
আমার অধঃপতন দেখে তোমার মনে ব্যথা লাগে?
আমি এটা করছি খারাপ, তা কি বুঝিয়ে দিতে আসো?
তবু বলো ব্যথা লাগে? তবু বলো ভালো বাসো?
আমার জন্য কেউ কি কভু নিজের স্বার্থকণা ছাড়ো?
ভালোবাসার লক্ষণ কি এ—আমায় শুদ্ধ গালি পাড়ো?

দেখ হয়ত আমি একটু বুদ্ধিশূন্য স্বভাবতঃ,
(আশা করা অন্যায় সবার বুদ্ধি হবে তোমার ম'ত)
তবু আমার বোধ হয় আমি এমন বোকা নই ক ভারি ;
আমার বোধ হয়, আমায় একটা বুঝিয়ে দিলে বুঝতে পারি।
এটা খারাপ বুঝিয়ে দিলে একটুখানি ব'লে ক'য়ে,
সুরা ছাড়বো না ক শুধু, থাকব তোমার গোলাম হয়ে।
স্বার্থ ছাড়ো নাহি ছাড়ো, বুঝব আমার জন্য ভাবো,
বুঝব তুমি ভালোবাসো—এবং ভালো হ'য়ে যাব।

—এস বন্ধু কাছে বোসো ; বন্ধুভাবে তোমার কাছে,
নিতান্তই বন্ধুভাবে, আমার কিছু বলবার আছে।
বাক্যহানাহানি চক্ষুরাঙারাঙি পরিহরি',
এস একটু শান্তভাবে বন্ধুভাবে তর্ক করি।

এটা খারাপ !—কিসে খারাপ ?—এতে শরীর খারাপ করে ?
রাত্রি জাগাও খারাপ তবে যাত্রায় কিম্বা থিয়েটরে !
যে জন রাত্রি জাগে তাকে নিন্দা করো হেন ভাবে ?
আমি যদি উচ্ছন্ন যাই, উচ্ছন্ন ত সেও যাবে।
কেবলি যে শুয়ে থাকে, পোলাউ কোর্মা খাচ্ছে খালি ;
যকৃৎ খারাপ হতেই হবে ;—তাকে এমন পাড়ো গালি ?
ক্রমাগত সন্দেশ কিম্বা ইলিশ মৎস্য খেলে পরে,
উদরাময় হোক বা না হোক, শরীর নিশ্চয় খারাপ করে ;
'সর্বমত্যন্তগর্হিতম্' এটা বটে আমি মানি,
তবে কিসে খারাপ—যদি একটু আধটু ব্র্যাণ্ডি টানি ?
পয়সা বেশি খরচ হয় ?—তা হয় না আতর গোলাব মেখে ?
ল্যাণ্ডো ফেটিন হাঁকিয়ে ? কি চৌরঙ্গিতে বাড়ি রেখে ?
তাকে তুমি নিন্দা করো ?—বরং বলো : "দরাজ বটে !"
একটা গেলাস ব্র্যাণ্ডি খেলেই বিশ্বশুদ্ধ কেন চটে ?
হপ্তার মধ্যে হদ্দমদ্দ একবার ক'রে ব্র্যাণ্ডি টানি,
নিজের পয়সায় কতক এবং পরের পয়সায় কতকখানি।
এক্লা নম্বর একের দাম ত পাঁচটি মুদ্রা ; তাতে ভাবো,
পাঁচটি মুদ্রার ব্র্যাণ্ডি খেয়ে আমি ফতুর হয়ে যাবো ?

তবে যদি মাত্রা চড়ে ?—সেটা বটে গুরুতর ;
তবে কি না চড়ে না সে, ইচ্ছা যদি নাহি করো ;
চড়ত যদি নেশা হ'ত, চড়ত যদি খেতাম নিত্য ;
ব্র্যাণ্ডি আমার প্রভু নহে ; ব্র্যাণ্ডি আমার বাঁধা ভৃত্য।
একটু আধটু রঙিন নেশা—সেটায় নাই ক কোনো বাধা,
ব্র্যাণ্ডি নেহাইৎ মন্দ নহে—ব্র্যাণ্ডির নেশাই খারাপ দাদা।৮

মানি আমি সুরাপানে গোল্লায় গেছে অনেক লোকে,
অনেকে করেছে অনেক অপকর্ম নেশার ঝোঁকে ;—
স্ত্রীপুত্রদের খেতে দিতে পারে না ক কোন মতে ;
মদের জন্য বাড়ি ছেড়ে ফিরতে হচ্ছে পথে পথে ;
—তখন কিন্তু সুরাই প্রভু তাঁরা তখন সুরার ভৃত্য,
তখন ত সে হ'তে পারে গোষ্ঠীশুদ্ধর অপমৃত্যু ;
তখন সে নয় ব্র্যাণ্ডির নেশা, ব্র্যাণ্ডির নেশার নেশা সেটা,
যখন সে-জন এমন অধম, তখন সে মরুক গে বেটা।

নারীর জন্য হয়ে গেছে বিশ্বে অনেক মহা ক্ষতি,—
লঙ্কার পতন, ট্রয়ের যুদ্ধ, আণ্টোনিয়োর অধোগতি,
সুন্দ উপসুন্দের মৃত্যু, ইন্দ্রের মহা দুরবস্থা,
সত্য হীরার মতন বিরল, মিথ্যা ধুলার মতন সস্তা ;—
এ সব উদাহরণ দেখে, মানুষ কি ছাই এ-সব ভেবে,
এ সংসারে তবে বাবা বিয়ে করা ছেড়ে দেবে ?

ভূমির জন্য করে নি কি অনেক যুদ্ধ অনেক জাতি ?
কুরুক্ষেত্রের মহাসমর, জাপান রুষের মাতামাতি,
অনেক শাঠ্য, অনেক দ্বন্দ্ব ; মোকদ্দমা ভারি ভারি ;
—সে জন্য কি সবাই এখন ছেড়ে দেবে জমিদারি ?
আগুন জ্বালা ছেড়ে দেবে—কারণ অগ্নি করে দাহন ?
নদীর জলে ডোবে ব'লে করবে না কি অবগাহন ?
মানবের ত মহাশত্রু চারি দিকে পদে পদে ;
আপত্তিকর নহে কিছু, আপত্তি যা শুধু মদে ?

বলবে তুমি মদ্য খেলে লোকে বড় নিন্দা করে।
সে ত মানুষ চিরকালটা ক'রেই আসছে পরস্পরে।
নিন্দাভাজন হ'লেই কেহ, মন্দ কি তায় হতেই হবে?
ভারি বড় ছিলেন যাঁরা, নিন্দাভাজন ছিলেন সবে,
নিন্দা করে—আমার সঙ্গে মেলে না ক ব'লে না কি?
আমিও ছাই কেবল তাঁদের প্রশংসাই কি ক'রে থাকি?

তোমার মনে ব্যথা লাগে?—এটা কিছু যুক্তি নহে;
তাতে কিছু প্রমাণ হয় কি? এ কি কোন শাস্ত্রে কহে?
তোমার অনেক জিনিস আমার ভালো লাগে না ক ভেবে,
আমি কি তাই পাড়্‌ব গালি? তুমি কি তাই ছেড়ে দেবে?

বলতে পারো একটা কথা—সেটা হচ্ছে—শাস্ত্রে লেখে—
যে, বিবেকেই মানুষ আসল তফাৎ হচ্ছে পশু থেকে;
মদ্য সেটা লুপ্ত করে—অর্থাৎ কি না—সেটার মানে—
মদ্য মানুষটাকে নেহাৎ পশুর ধাপে টেনে আনে;
তা কি করা উচিত যাতে মানুষ মনুষ্যত্ব হারায়?
যাতে শেষে মানুষ—কি না—পশুর ধাপে গিয়ে দাঁড়ায়?

আমি বলি—মনুষ্যের এ-বুদ্ধিবৃত্তির তীব্র জ্বালায়
মাঝে মাঝে এমনি হয়—যে ইচ্ছা হয় যে ছুটে পালাই।
রোগে শোকে অপমানে মানুষ যখন তীব্র ক্ষত,
তখন এ-বিস্মৃতি আসে যেন একটা সুখের ম'ত;
বুদ্ধিবৃত্তির রাজ্যে সে ত প'ড়ে আছিই নিত্য কাজে;
মন্দ কি এ-নেশার রাজ্যে ছুটি নেওয়া মাঝে মাঝে?—

যখন আসে উদাস ভাবটা ; অথবা হতাশা বড় ;
যখন বাদলায় একা মনের অবস্থাটা গুরুতর ;
তখন নেশার আশ্রয় নিই, অবসন্ন হই পাছে—
আর সে, বলো দেখি দাদা সুরার মত নেশা আছে ?

তবে এটা কিসের খারাপ ?—কী হে ভায়া, কোথায় যাবে ?
ছেড়ে দিচ্ছি না ক দাদা ;—তর্ক করো বন্ধুভাবে।
কিসে খারাপ মদ্য খাওয়া ?—কোন্‌টি খারাপ কোন্‌টি নহে,
নানাবিধ এ-বিষয়ে নানাবিধ শাস্ত্রে কহে।

আমারই অনিষ্ট যদি সুরাপানে—মানিই যদি—
তোমাদের কি স্বত্ব দাদা—গালি পাড়ো নিরবধি ?
আমার নিজের ইষ্টানিষ্ট ?—সে ত সবাই ভেবে থাক ;—
বুদ্ধিমানে বোঝে সেটা, নির্বুদ্ধি তা বোঝে না ক।
নিজের ভালো নিজের মন্দ, আপাত কি ভবিষ্যতে,
সবাই একটু অধিক মাত্রায় বুঝ্‌ছে সেটা বিধিমতে।
সেটা স্বার্থ ; ধর্ম নহে !—কৃপণ যদি টাকা জমায়,
সেটা মহাধর্ম—কেহই বলবে না ক কোন সময়।
কেহ যদি স্বাস্থ্যের জন্য নিত্য ব্যায়াম করে—সেও
মহা ধার্মিক ব্যক্তি—এমন বলবে না ক কভু কেহ।
কিম্বা যে-জন পড়ে কাব্য নিত্য দুপুর রাত্রি যাপি',
কেহই বলবে না ক কভু সে-জন একটা মহাপাপী ;
—তবে পরের ইষ্টানিষ্টে ভালোমন্দ আমি মানি
পরকে দুঃখ দেওয়াই খারাপ, এইটি সত্য ধ্রুব জানি।

যখন বুদ্ধ বেরিয়েছিলেন গৃহ ছেড়ে পথে পথে,
অতি বুদ্ধির কার্য সেটা হইছিল না কোনো মতে ;
খৃষ্ট যখন পরের জন্য ক্রুশের উপর মরেছিলেন,
কেহই বলবে না যে তিনি বুদ্ধির কার্য করেছিলেন ;
যখন মাকে স্ত্রীকে ছেড়ে বেরিয়েছিলেন মহাপ্রভু,
নিজের স্বার্থ ভেবেছিলেন—কেহই বলবে না ক কভু ;
যাঁহারা এ-পৃথিবীতে হয়ে গেছেন চির ধন্য,
নিজের জন্য ভাবেন নি ক, ভেবেছিলেন পরের জন্য ।

তবে যে-জন নিজের জন্য নিজের ক্ষতিই ক'রে থাকে,
তাকে মূর্খ বলো, কিন্তু পাপী বলো না ক তাকে ;
কিন্তু আমি মূর্খ সেটাও স্বীকার করতে পারি না ক,
কিছু দিয়ে পাচ্ছি কিছু এটা যদি মনে রাখো ।
তোমরা অর্থ দিয়ে কেনো আম্র, মাংস, ঘৃত, চিনি ;
আমি বেটা টাকা দিয়ে না হয় একটু ব্র্যাণ্ডি কিনি ।
তোমরা স্বাস্থ্য-বিনিময়ে কেহই অর্থ কেনো না কি ?
আমি না হয় স্বাস্থ্য দিয়ে একটু আমোদ কিনে থাকি ।

বলবে তুমি—আমি একটা সমাজের ত অঙ্গ বটে,
আমার কুদৃষ্টান্ত দেখে কেহ যদি পিছু হটে !
আমিই না হয় সুরাপানের উচিত মাত্রা রাখতে পারি,
কিন্তু সেরূপ মনের শক্তি আছে—বল্‌বে—ক'জনারই ?
যখন আমার দেখাদেখি দশ জন ব্র্যাণ্ডি ধরতে পারে,
তখন পরের জন্য আমায় বর্জন করতে হবে তারে ।
আমি বলি—আছে বিশ্বে সুদৃষ্টান্ত এত ভাবে,
আমারই এ-কুদৃষ্টান্ত কেন বেছে নিতে যাবে ?

—নেয়ই যদি, আসুক তবে শিক্ষা নিতে আমার কাছে,
শিখিয়ে দেবো আত্মরক্ষার কত রকম উপায় আছে ;
ধাপে ধাপে উঠিয়ে নেবো হাতটি ধ'রে এমনি ভাবে,
যে তার পরে মদ্য খাওয়া ভারি সোজা হয়ে যাবে।
—যদি সাঁতার না শিখে কেউ গভীর জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে,
আমায় কি দোষ দেবে কেহ—যদি বেটা ডুবে মরে।

আসল কথা—ভোগের জন্য সবই জিনিস তৈরি ভবে ;
তবে তাদের নিজের মুঠোর মধ্যে ক'রে নিতে হবে।
সুরা যদি চালায় তোমায় তা'লে সুরা মহা অরি,
সুরায় যদি চালাও তুমি, তা'লে সুরা শুভঙ্করী।

—আমি দেখছি এটার একটা উচিত জবাব যদি না পাই,
এবং আমার কবিতাটি কাগজে কি বইয়ে ছাপাই,
সবাই ভারি নিন্দা করবে—বল্‌বে আমি মহা অরি—
শুধু সুরা খাই নে ব'সে—তার উপরে তর্ক করি।
তর্ক করি সাধে দাদা ?—তোমরা সবাই নিত্য হেন
আমার বন্ধুগণে এবং আমায় গালি পাড়ো কেন ?
নৈলে আমরা নিজের মজায় নিজেই বিভোর হয়ে থাকি,
সুরা দেবীর ভিন্ন বিশ্বে কারো না তোয়াক্কা রাখি।

এমন জিনিস আছে দাদা ! তরল সফেন রক্তবরণ !
বন্ধুর পরস্পরের প্রীতির এমন একটা উপকরণ !
পানে অতি সাদা জিনিস তাহাও দেখায় রঙিন ধরন !
অতি সামান্য যে গলা তাতে যেন বাজে বীণা !
গালি দিলে, হঠাৎ বোঝা যায় না গালি দিলে কি না !

কইতে হাস্‌তে নাচ্‌তে গাইতে থাকে না ক কোন বাধা !
থাকে না ক চক্ষুলজ্জা !—এমন জিনিস আছে দাদা ?

আছে বিপদ্ মদ্যপানে, সেটা আমি বিশেষ মানি,
তবে কেন বিপদ্‌টাকে ঘরের মধ্যে টেনে আনি ?
মদের আমোদ যদি অন্য জিনিসেতে পেতে পারি,
কেন ডাকি সেটায়, যেটা হ'তে পারে অপকারী ?
—জানো না কি বিপদ্ এবং আমোদেই ঘেঁষাঘেঁষি ?
যেইখানে বিপদ্ অধিক, সেইখানে আমোদ বেশি ?
মানুষঠেলা গাড়ি ক'রেও যাওয়া যায় না কোন গতিক ?
তাহার চেয়ে তেজী ঘোড়া চড়ায় নয় ক আমোদ অধিক ?
তাকে দমন করতে পারায়, তাকে নিজের বশে আনায়,
(যদিও তা করতে গিয়ে কেহ গিয়ে পড়ে খানায়)
তবু তাতে স্ফূর্তি একটা বিশেষ রকম আছে যেন ;
বিপদ্ আছে ব'লেই স্ফূর্তি—নৈলে লোকে চড়ে কেন ?
লাঠির চেয়ে তরোয়ালের খেলাই কেন করতে আসে ?
শশক-শিকার চেয়ে কেন ব্যাঘ্র-শিকার ভালোবাসে ?
বিপদ্ আছে মদ্যপানে ব'লেই তাতে এমন মজা !
বিপদ্‌টাকে পেড়ে ফেলে উড়ায়ে দিই জয়ধ্বজা।
আমি দক্ষিণ হস্তে নিয়ে সুরাপাত্রে সামনে ধরি,
বলি তাকে দৃঢ়স্বরে—"দেখ সুরা ভয়ঙ্করী !
তুমি কাহার হাতে জানো ? দেখ, চুপটি ক'রে থাকো,
যাই বলো না, দু আউন্সের বেশি আমি খাচ্ছি না ক ;
তুমি থাক্‌বে আমার বশে অদ্য এবং পরে নিত্য,
মনে থাকে যেন সুরা !—তুমি আমার বাঁধা ভৃত্য ;

সর্প নিয়ে খেলার ম'ত আমি তোমায় নিয়ে খেলি—"
এই কথাটি ব'লে তারে চ—ক্ ক'রে গিলে ফেলি।

—দেখ তোমরা পড়্‌বে যারা কবিতাটি—এইখানে—
ব'লে রাখি তোমরা যেন বুঝো না ভুল আমার মানে।
আমি বলছি না ক তোমরা সবাই এখন সুরা ধরো;
তা হ'লে দাঁড়াবে এখন অবস্থাটি গুরুতর।—
প্রথমত সুরার দামটা বেজায় রকম চ'ড়ে যাবে;
তাহার পরে ছেলের বুড়োর ক্রমাগত ভ্রান্তি যাবে;
শুধু খাবে না ক, খাবে নিত্য নিত্য দুটি বেলা;
সামাজিক সব কাজে হবে চারি দিকে অবহেলা;
চলবে না কেউ সোজা হয়ে; আগে যেতে যাবে পিছু;
কথা এমনি এড়িয়ে যাবে, কেহই বুঝবে না ক কিছু;
গালি দেবে পরস্পরে এমনি বিশ্রী-রকম ভাষায়,
থাক্‌বে না ক তফাৎ কিছু ভদ্র ব্যক্তি এবং চাষায়;
নিয়ম কি ভদ্রতা কিম্বা সাধুতা সব যাবে চুলোয়;
মারামারি কাটাকাটি ক'রে মরবে মানুষগুলোয়।
খেয়ো না ক কেহ মদ্য, খেয়ো না ক খেয়ো না ক,
—বলছি সেটা বারে বারে,—তোমরা সবাই সাক্ষী থাক।—
ভারি বিশ্রী জিনিস সুরা—ভয়ঙ্করী সর্বনাশী—
যে খাবে তার মাথায় দিব্য—এখন তবে আমি আসি।

এবং তিনি গেলেন চ'লে—পরে ('নয় ক বলা মিছে')
বন্ধু গড়িয়ে যেতে লাগলেন নিচে থেকে আরো নিচে;
করব না বর্ণনা আমি সে ক্রমশঃ অধঃপতন;—
(সেটা যেমন চিরকালটা হয়ে থাকে, তারি মতন।)

দেখলাম একটা তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ঝাপসা হয়ে এল ক্রমে ;
—দেখলাম একটা মহৎ হৃদয় ঢেকে আসে মতিভ্রমে ;
দেখলাম একটা মহা পুণ্য মলিন হয়ে আসে পাপে ;
দেখলাম একটা সুস্থ শান্তি ঢেকে আসে মনস্তাপে ;
ছিলেন পূজ্য, ক্রমে তিনি সামান্য মনুষ্যমাত্র,
ক্রমে বন্ধুবর্গের, ক্রমে মানুষেরও, কৃপাপাত্র।

বারো বছর পরে দেখা বন্ধুর সঙ্গে কলিকাতায়,
একটি ক্ষুদ্র ভগ্ন গৃহে, বৌবাজারের মোড়ের মাথায়,
"এ কি বন্ধু ?—এ অবস্থা ?—হেন স্থানে ? হেন বেশে ?
ওহে বন্ধু! বলেছিলাম হবে ইহাই পরিশেষে ;—
সে দিন তর্ক ক'রে ইহাই বুঝিয়ে তোমায় দিতেছিলাম।"
—বল্লেন বন্ধু করুণ হেসে—"তর্কে কিন্তু জিতেছিলাম।"

ভক্ত

তুমি করো নাই ক বক্তৃতা, কি সভায়
পড়ো নাই ক কোন প্রবন্ধ ;
শিশুগুলোর নিয়ে মস্তক ভক্ষণ ক'রে
করো নাই ক তাদের কবন্ধ ;
তুমি চায়ের সঙ্গে মিষ্ট ছন্দোবন্ধে
স্বদেশহিতৈষিতা চাখো নি ;
তুমি সভায় উঠে ঝিঁঝিট খাম্বাজ সুরে
উচ্চে "মা মা" ব'লে ডাকো নি ;

নির্জনে, নীরবে, নিভৃতে, নিতান্ত
গাঁওয়ারী জাপানী ধরণে,
আজন্ম অর্জিত ধনরাশি তোমার
দিয়াছ জননী-চরণে।

নাই ক তাতে ছন্দ, অনুপ্রাসের গন্ধ,
তোমার এ কর্তব্যনিষ্ঠাতে ;
নাই ক তাতে হয় ত মা মা বুলি বেশি,
ভাই ভাই শব্দ প্রতি পৃষ্ঠাতে ;
—কিন্তু কবিবর আজ বিনা অনুপ্রাসে,
বিনা ছন্দের কোন দায়িত্বে ;
যে কাব্য করেছ রচনা, নাহি তা
সমগ্র এ বঙ্গ-সাহিত্যে।

এতদিন ত কেবল শুনেই আস্‌ছি বাবা!
—বধির প্রায় করেছে শ্রবণে—
উচ্চৈঃস্বরে মহাবীর্যে, আর্য জাতি
গালি দিচ্ছে যত যবনে ;
শুনেই আস্‌ছি শুদ্ধ ব্যাখ্যা আধ্যাত্মিকী,—
গর্ভাধানের, টিকি-মাহাত্ম্যর,
শুনেই আস্‌ছি—"আমরা ছিলাম ভারি বড়
সন তুশ সত্তর কি বায়াত্তর";
দেখলাম না ত কিছু—দেখবার মধ্যে দেখি
হুঁকো, হুইস্কি এবং নর্তকী ;
অভিধান কি পুরাণ খুলে দেখ্‌তে হচ্ছে
এই যে আর্য শব্দের অর্থ কী ?

দেশের জন্য ভাবা, মায়ের জন্য কাঁদা,
ভায়ের জন্য দেওয়া—একালে,
এই বঙ্গদেশে, আজো যে সম্ভব, তা
হে মহাত্মা—তুমি শেখালে।

ওরে মূঢ়! ওরে প্রতারিত!—তোরা
এটার পানে নাহি চেয়ে যাস্;
এটায় ঠেলে ফেলে হুড়োহুড়ি ক'রে
বক্তৃতাটি শুনে খেয়ে যাস্;
ওরে মূর্খ! জানিস্ "মা মা" ব'লে সখের
অশ্রু ফেলা বেশি শক্ত নয়;
যে জন চেঁচায় বেশি "দীনবন্ধু" ব'লে
সে জন সত্যই বেশি ভক্ত নয়;
যে জন কার্য করে, নিভৃতে, নিভৃতে,
নির্জনে, জননীর জন্য—সেই
যোগ্য সুসন্তান, সেই মায়ের প্রিয়পুত্র,
সেই সে জগন্মান্য, ধন্য সেই।

—অন্ত অন্ধকারে পূর্বদিকে ও কী
মেঘের পার্শ্বে জ্যোতির রেখা গো!
অন্ত এ-সুগভীর নৈরাশ্যে দুর্দিনে,
আশায় মত্ত যায় কী দেখা গো!
যদি নয় সে ঊষা, যদি সে আলেয়া,
মুহূর্তে যাবে সে মিশায়ে;
তবে জেনো ধ্রুব—কখনো প্রভাত
হবে না এ অমানিশা এ।

ব্যঙ্গ-কবি আমি ?—ব্যঙ্গ করি শুধু ?
নিন্দা করি শুধু—সকলে ?
কভু না ! আসলে ভক্তি করি আমি,
ঘৃণা করি শুধু—নকলে।
যেথা আবর্জনা, ধরি সম্মার্জনী ;
তাই ব'লে আমি ত অন্ধ না ;
যেখানে দেবতা, ভক্তি-পুষ্প দিয়ে
স্তুতি ছন্দে করি বন্দনা।
—যাও এ-ছন্দ তবে—পড়ো মহত্ত্বের ঐ
চরণারবিন্দে জড়ায়ে ;
পরে ঊর্ধ্বে—আরো ঊর্ধ্বে উঠে পড়ো
সমগ্র এ-বঙ্গে ছড়ায়ে।

রাজা

তোমার টাকা আছে ?—আছে না হয় টাকা,
তোমার কাছে আমি কিছু চাচ্ছি না ক ;
যে চায়, মাথা নিচু করুক তোমার কাছে,
মাথা নিচু করতে আমি যাচ্ছি না ক।
কিসের তবে দর্প ? কিসের তবে গর্ব ?
কিসের জন্য তোমায় এত শ্রেষ্ঠ ভাবো ?
তোমার কাছে আমি ভাবো কিসে খর্ব ?
তোমার কাছে মাথা নিচু করতে যাব ?

খাচ্ছ পোলাও তুমি? খাও না—পোলাও খেয়ে
আমার চেয়ে তোমার বাড়ে নি ক ক্ষুধা;
পোলাও তোমার কাছে নয় ক তেমন স্বাদু,
যেমন এই শাকান্ন আমার কাছে সুধা।
শয়ন কর তুমি 'দুগ্ধফেননিভ'
কোমল শয্যায় যদি পাখার বাতাস খেয়ে;
ছেঁড়া মাতুর পেতে আমি ঘুমাই যদি
—তোমার নিদ্রা নয় ক গভীর আমার চেয়ে।
জুড়ি হাঁকাও তুমি, আমি যাচ্ছি হেঁটে,
আমার পানে তাইতে চেয়ো না ক নিচু;
ত্রিতল হর্ম্য তোমার মার্বেল-মোড়া যদি,
আমার কুঁড়ের চেয়ে ধন্য নয় সে কিছু।

তোমায় পশুর মত যাচ্ছে টেনে নিয়ে,
আমি হেঁটে যাচ্ছি নিজের পায়ের জোরে;
তোমার প্রাসাদ ভবন সে ত পরের দেওয়া,
আমার কুঁড়েখানি—নিজের গায়ের জোরে।
তোমার হস্ত দুখান প্রজার রক্তে মাখা,
তোমার শরীর সেও পুষ্ট পরের খেয়ে;
তোমার মাথা—যদি মাথা বলো তাকে—
নয় ক বেশি কিছু পশুর মাথার চেয়ে।
কিসের তবে দর্প? কিসের তবে গর্ব?
কিসের জন্য তোমায় এত শ্রেষ্ঠ ভাবো?
তোমার চেয়ে আমি ভাবো কিসে খর্ব,
তোমার কাছে মাথা নিচু করতে যাব?

ওরে ও ভাই চাষী! ওরে ও ভাই তাঁতি!
পড়িস্ না ক নুয়ে; জানিস্ এ সব ফাঁকি;
তোদের অন্নে পুষ্ট, তোদের বস্ত্র গায়ে,
করবে তোদের উপর রক্তবর্ণ-আঁখি?
সারিবদ্ধ হয়ে, একবার মাথা তুলে,
দাঁড়া দেখি তোরা সবাই সোজা ভাবে;—
দেখবি এই-যে দম্ভ, দেখবি এই-যে দর্প,
দেখবি এই যে স্পর্ধা,—চূর্ণ হয়ে যাবে।
উঠে দাঁড়া দেখি—মানুষ যদি তোরা—
এদের সামনে কেন মাথা নুয়ে যাবি?
সমস্বরে বল্—"এই সকলেরই মাটি,
কারো চেয়ে কারো বেশি নাই ক দাবি।"

হা রে মূর্খ, তোরা কাহার দাম্ভ করিস্?
তোদেরই যে ভৃত্য তোদেরই সে প্রভু?
তোরাই যদি তা না নিতিস্ মাথায় ক'রে,
এই যে স্পর্ধা—তারা সাহস করত কভু?
নাই ক বিচার ব'লে ভূমে পড়িস্ লুটে,
ধিক্কার দিস্ যে ভাগ্যে এ-অভিসম্পাতে;
জানিস্ না কি অন্ধ! ওরে হতভাগ্য—
তোদের ভাগ্য সে যে তোদের নিজের হাতে।

"হা রে কলি" ব'লে মাথায় হস্ত রেখে,
ভূমিতলে প'ড়ে গড়াস্ নিরবধি!
টেনে আন্তে পারিস্ আবার সত্যযুগে,
কলিকালে—তোরাই মনে করিস্ যদি।

তবে জানু পেতে একবার সমস্বরে,
ডাক্ রে ভগবানে হয়ে বদ্ধসারি—
বল্ রে "প্রভু প্রাণে সেই শক্তি দাও, এ
বিশ্বে আবার যাতে মাথা তুলতে পারি।"

কবি

মহাবিশ্ব অনুকম্পায় স্নিগ্ধ হয় নি যাহার প্রাণ ;
গাইতে হয় না রুদ্ধকণ্ঠ—তাহার মিথ্যা গাওয়াই গান।
হোক না সুন্দর স্বরের ভঙ্গি, হোক না সুন্দর তান ও লয় ;
গানের সঙ্গে নাই ক প্রাণ যার, তাহার সেই গান—গানই নয়।

সৌন্দর্য নয় দেহের বর্ণ, ওষ্ঠ অক্ষির আকার ভেদ,
গ্রীবা গণ্ডের প্রকার মাত্র—সে ত শুদ্ধই অস্থি মেদ ;
দণ্ডমাত্র আঁখির তৃপ্তি—সুখের সেব্য, প্রেমের নয় ;
যেথায় দীপ্ত প্রাণের দীপ্তি সে-সৌন্দর্যই ধন্য হয়।

কাব্য নয় ক ছন্দোবদ্ধ, মিষ্ট-শব্দের কথার হার ;
কাব্যে কবির হৃদয় নাই যার তাহার কাব্য শব্দসার।
যেথায় ভাস্বর, যেথায় মূর্ত, ঝঙ্কারিত, কবির প্রাণ ;
উৎসারিত মহাপ্রীতি—তাহাই কাব্য, তাহাই গান।

নিদাঘ সন্ধ্যায় মহান্ দৃশ্য যাহার চক্ষে বর্ণসার,
কবিই নয় সে—তাহার আত্মা শুধুই পিণ্ড মৃত্তিকার।
কবি সেই, যে সে সৌন্দর্যে দেখে একটা মহাপ্রাণ ;
কবি সেই, যে দেখে বিশ্ব গভীর অর্থে কম্পমান।

চিরবিচ্ছেদ

জান্তাম না ক চিন্তাম না ক তোমায় আমি, প্রিয়তমে, ষোল বছর আগে ;
আমার জীবন তোমার জীবন পৃথক্-গতি, এ-সংসারের ছিল পৃথক্ ভাগে।
তোমার জগৎ নিয়ে তুমি, আমার জগৎ নিয়ে আমি, ছিলাম ত সে একা ;
এক রকম ত যাচ্ছিল সে-জীবন, নিরুৎসবে কেটে ;—কেন হ'ল দেখা ?

নিশায় প্রসারিত ঊর্ধ্বে অসীম সুনীল নভস্তলের মানচিত্রে, একা,
পড়তেছিলাম গ্রহ-তারা-নীহারিকা-ধূমকেতুর—লীলাময়ী লেখা ;
হঠাৎ তুমি পূর্বাননে উদয় হ'লে, শরচ্চন্দ্র, শান্ত গরিমায় ;
ছেয়ে গেল আকাশ ভুবন, মগ্ন মুগ্ধ পরিপূর্ণ সে-শুভ্র জ্যোৎস্নায়।

এসেছিলে সে দিন তুমি, যেমন ক্লান্ত নিদ্রাবেশে—সুখ-স্বপ্ন আসে ;
এসেছিলে, আসে যেমন কান্তারে চামেলি-গন্ধ, বসন্ত বাতাসে ;
শুষ্ক তপ্ত নদীতটে উচ্ছ্বসিত কল্লোলিত ঢেউয়ের ম'ত এসে,
স্মৃতি হ'তে হারা একটি অজানা রাগিণীর ম'ত কোথা গেলে ভেসে !

দিয়ে গেলে রেখে গেলে দুইটি শিশু—দুইটি মাত্র উত্তরাধিকারে ;
আগে উদাস ক'রে, পরে তাদের দিয়ে জড়িয়ে রেখে গেলে এ-সংসারে।
কভু যদি অসীম রাজ্যে তোমারে খুঁজিতে গিয়া চাহি ঊর্ধ্বপানে ;
এরা দুজন দুইটি দিকে আমার দুইটি হস্ত ধ'রে ধুলায় টেনে আনে।

কভু ভাবি—তোমার আমার মধ্যে কি শেষ বোঝাপড়া হয়ে গেছে—ভবে ?
কিম্বা অন্য কোনো জন্মে, কি অন্য সৌর জগতে, আবার দেখা হবে।
কভু ভাবি, বিশ্বে প্রথম তোমায় যে-দিন দেখেছিলাম—প্রথম দেখা সে কি ?
কিম্বা পূর্বে আমাদিগের জন্মান্তরে হয়েছিল কোথাও দেখা-দেখি।

এই ত ছিল দেবীমূর্ত্তি—আলাপ, বিলাপ, হাস্য, রোদন, করছিল ত কাছে!
কোথায় গেল? ফিরিয়ে দাও হে বিশ্বপতি! দাবি করছি—বলো কোথায় আছে?
এই সে ছিল, গেল কোথায়? দেখা হবে আবার, কিম্বা এ চির-বিচ্ছেদ?
আমি পারলাম না ক; তবে তুমি ক'রে দাও হে প্রভু এ রহস্য-ভেদ।

—হা রে মূর্খ! কাহার কাছে কিসের জন্য দাবি করছিস্? জানিস্ না কি, ভবে
যা হবার তা হবেই হবে? মাথা খুঁড়ে মরিস্ যদি—যা হবার তা হবে!
কাহার কাছে বিচার চাচ্ছিস্?—বিচারকর্তা বহুৎ দূরে—আর্জি বড়ই ক্ষুদ্র;
তোর আর বিচারকর্ত্তার মধ্যে, প'ড়ে আছে উত্তাল এক প্রকাণ্ড সমুদ্র।
আজ পর্যন্ত শুনি নি ক—শুনে কারো আর্তধ্বনি ফিরেছে প্রবাহ;
বাত্যা থেমে গেছে; গেছে সমুদ্র শুকায়ে; অগ্নি করে নাই ক দাহ;
উঠে মাত্র আর্তধ্বনি, মিশে যেতে সমীরণে—ক্ষুব্ধ মূর্ছনায়।
আমি কাঁদি, আমি কাঁদি, এ-মহাব্রহ্মাণ্ডে তাহে—কাহার আসে যায়?

প্রিয়তমে! আজি তুমি জানি না ক কোথায় গেছ; কোথায় আছ আর;
—কোনো শাস্ত্রের কোনো ধর্মের সাধ্য নাই ক দিতে পারে তাহার সমাচার—
যেথা থাকো, (থাকো যদি,) আশা করি আছ সুখে, আশা করি তবে—
তোমার জগৎ—যাহাই হোক না—আমাদের এ-জগৎ চেয়ে কিছু ভালো হবে।

সত্যযুগ

নির্মেঘ অমাবস্যা রাত্রি ; শুয়ে আছি ঊর্ধ্বমুখে হাতে মাথা রাখি ;—
বাড়ির সবাই ঘুমিয়ে গেছে ; জেগে আছি বাড়ির মধ্যে আমিই একাকী !
স্তব্ধ রাত্রির অন্ধকারে জ্বলন্ত নক্ষত্রপুঞ্জে চেয়ে দেখি দূরে ;
ভাবি এত মহাজ্যোতি কী মহৎ উদ্দেশে ঊর্ধে মহাশূন্যে ঘুরে ?
কোথায় সীমা পরিব্যাপ্তির ? কী স্বচ্ছ কী স্তব্ধ আকাশ, কী গাঢ় ! কী কালো !
আচ্ছা—ঐ যে মহাশূন্যের কতখানি অন্ধকার ?—আর কতখানি আলো ?
প্রত্যেক নক্ষত্রটি শুনি একটি একটি সৌরজগৎ—জ্যোতিষশাস্ত্রে বলে—
আবার শুনি ধীরে ধীরে মহাশূন্য দিয়া, প্রতি সৌরজগৎ চলে !
তারাও তবে ভ্রমে বুঝি ঘেরি মহত্তর জ্যোতি, আরো দূরদেশে ;
—যাহা অনুমেয় মাত্র ; যাহার রশ্মি পৌঁছে নাই ক পৃথিবীতে এসে ;
আরো দূরে—আরো দূরে—আরো দূরে—আরো দূরে, মহাশূন্য মাঝে—
আরো নীহারিকা আছে, আরো ধূমকেতু আছে, আরো জ্যোতি আছে !
তবে জ্যোতির সংখ্যা নাই কি ? অন্ধকারের সীমা নাই কি ? শূন্যের নাই কি শেষ ?
তবে এই যে তোমার সৃষ্টি—ইহার আদি, ইহার অন্ত, কোথায় পরমেশ ?

শুনি পূর্বে ব্যাপ্তি ছিল জড়ীভূত একীভূত জ্যোতিঃ শূন্যময়ে ;
ক্রমে ক্ষিপ্ত হ'ল জ্যোতি—সূর্যে, গ্রহে, উপগ্রহে, ধীরে ক্রমান্বয়ে ;
একটি সূর্য নিভে যাচ্ছে অন্ধকারের একটি প্রান্তে, শক্তি হ'লে ব্যয় ;
অপর প্রান্তে নূতন জ্যোতি—নূতন সূর্যে নূতন গ্রহে, কেন্দ্রীভূত হয়।

কী আশ্চর্য্য ! কী সম্পূর্ণ ! কী সুন্দর এ বিশ্ব বিকাশ হচ্ছে অহরহ !
ব্যাপ্তি হ'তে নীহারিকা, নীহারিকা হ'তে সূর্য, সূর্য হ'তে গ্রহ ;
ক্রমে ক্রমে বিকাশ হতে আসে একটা মহাবিনাশ ; সৃষ্টি হ'তে লয় ;
কী তালে কী মহাছন্দে চলেছে এ-মহানিয়ম, এ ব্রহ্মাণ্ডময়।

ভাবি সে কী মহাজ্বালা—"শূন্য" পাত্রের অন্ধকারে উর্ধ্বে অধঃ হ'তে—
ফুটে উঠ্‌ছে জ্যোতির্বিম্বে, বিম্ব ফেটে পড়লে শেষে, কোথায় যাচ্ছে উড়ে ?
সে শক্তিমণ্ডলী কোথায় ?—যাহার বিকশিত শক্তি ঘোরাচ্ছে, গগনে,
বিশ্বঘড়ির কোটি কক্ষায়, কোটি এ-জ্যোতিষ্ক চক্রে, মহা আবর্তনে !

এ-দিকে এ-জড়শক্তি হ'তে বিশ্বে জীবন উদয় ; জীবন হ'তে ক্রমে
অনুভূতি ; অনুভূতি হ'তে বুদ্ধি—বহুযুগে, বহু পরিশ্রমে ;
জীবপঙ্ক হ'তে কীটে, তাহা হ'তে সরীসৃপে, তাহা হ'তে পরে
পতঙ্গে, পতঙ্গ হ'তে স্তনী জীবে, স্তনী প্রাণী পরিশেষে নরে ।

এই কি তবে অন্তিম বিকাশ ? এই কি জীবের চরম গতি ?
নাই কি কিছু পরে ?
ইহার পরে নাই কি জীবের মহৎ হ'তে পরিণতি আরো মহত্তরে ?
আবার আস্‌বে জীবন ঘুরে—যেমন মূল হ'তে কাণ্ড, শাখা পত্র, ফুল,
ফুলের পরিণতি ফলে, তাহা হ'তে সমুদ্ভূত আবার বৃক্ষমূল ?

কী আশ্চর্য্য নরজন্ম !—প্রথমত মাংসপিণ্ড রুদ্ধ গর্ভ মাঝে !
নাই ক তাহার বিশেষ তফাৎ আদিম জীবপঙ্ক হ'তে
(স্পন্দন মাত্র আছে) ।
ক্রমে ক্রমে মাংসপিণ্ড ধরে আকার মনুষ্যেরই—মায়ামন্ত্র এ কী ?
ভূমিষ্ঠ সে হবার সময়, তথাপি মর্কটের সঙ্গে সৌসাদৃশ্য দেখি ।
আছে মাত্র ক্ষুধা তাহার, ক্ষুধা পেলে কাঁদে, সেটা, তৃপ্ত হ'লে হাসে !
বাড়ে শিশু—পরে তাহার মনোবৃত্তি ক্রমে ক্রমে কোথা হ'তে আসে ?
আত্মচিন্তা ক্রমে ক্রমে বিকশিত পর-চিন্তায়—বুদ্ধি ও বিবেকে !
পরিণত মাংসপিণ্ড বুদ্ধ বা শঙ্করাচার্য্যে ক্রমে কোথা থেকে ?

বাহুবলে ক্ষুদ্র হ'লেও বুদ্ধিবলে শ্রেষ্ঠ প্রাণী—সে এই বিশ্বতলে ;
মূক ও অন্ধ পঞ্চভূতে বেঁধে ভৃত্যসম খাটায় নিজবুদ্ধিবলে !
তীর্ণ করে মহাসিন্ধু, দীর্ণ করে মহীধরে, ভিন্ন করে বায়ু,
নির্ণয় করে নক্ষত্রদের দূরত্ব ও গ্রহের গতি, সূর্যের পরমায়ু ;
পরিশেষে !—খোলো না আর, দেখায়ো না দেখায়ো না অস্তিমে কী হবে ;
ফেলে দাও এ-যবনিকা—উজ্জ্বল রঙিন রঙ্গমঞ্চ আলোকিত যবে ;
উচ্চ হর্ষধ্বনি-মধ্যে, বিজয় দুন্দুভি-মধ্যে, প্রেমসম্মিলনে,
ফেলে দাও এ যবনিকা—নিয়ে যাই এ-সুখের স্মৃতি গৃহে হৃষ্টমনে ।

কিন্তু না না বলতে হবে সত্য কথা—পূর্ণ সত্য, যেমনি সে হোক্—
সে-দিনের সে-কথা, যে দিন চ'লে যাবে শ্রেষ্ঠ প্রাণী, ছেড়ে ইহলোক ।
মৃত্যু যম রুক্ষ বেশে দাঁড়াবে এ-মহাস্পর্ধা অবরুদ্ধ ক'রে,—
বলবে—"দাঁড়াও, চ'লে এসো, এখন আমার সঙ্গে"—কোথা ?
"জানতে পারবে পরে ।"

এত বুদ্ধি, চেষ্টা ক'রে এত রকম বিদ্যা শেখা, এত চিন্তা করা,
এত স্নেহ, এত সহ্য, প্রিয়জনের জন্য এত স্বার্থত্যাগে ভরা,
এত ইচ্ছা, সুখের এত আগ্রহ ও আয়োজন সব,—এসে বলবে যম,
নিষ্ঠুর রূঢ় শুষ্ক ভাষায়—"হা রে মূঢ়, এ-সব তোমার বৃথা পণ্ডশ্রম !"

সমাজের সভ্যতার ধর্মের—সবারই সেই একই নিয়ম এ-পৃথিবীময়—
জড়ে হ'তে বিশেষে বা রাশি হ'তে পৃথকে তার পরিণতি হয় ।
পরিশেষে বর্বরতা-উচ্ছেদ-অধর্ম-স্পর্শে তাহা ভেঙে পড়ে ;
যাহা মানুষ কত পুরুষ কত শত শতাব্দীতে, এত যত্নে গড়ে !

যদি প্রলয়, যদি মৃত্যু, যদি বিনাশ প্রভৃতি বস্তুর অবশ্যই হবে ;
এ-সৃষ্টি এ-জন্ম, এত পরিশ্রমে বিশ্ব জুড়ে নিত্য কেন তবে ?

কেন এত বিজ্ঞান, দর্শন, মানুষ যত্নে তৈরি করছে এত ক্লেশে, ভবে,
পৃথিবীর প্রলয়ের সঙ্গে সেই সব মহা আবিষ্কৃতি যদি লুপ্ত হবে ?
এমন সুন্দর ! এমন মহান্ ; এমন বিশ্বব্যাপী বিকাশ—এ কি মহাভ্রম ?
এ-ব্রহ্মাণ্ড লেখামাত্র ? শিশুর ধূলির প্রাসাদ গড়া ? শুধু পণ্ডশ্রম ?
এই-যে মহাসৃষ্টি—এ কি শূন্যে উড্ডীন পরমাণুর উদ্‌ভ্রান্ত সম্পাত ?
এ আশ্চর্য বিশ্বনিয়ম এ আশ্চর্য বুদ্ধিবিকাশ—এ কি অকস্মাৎ ?
এই-যে আকাশ ব্যেপে এই-যে মহাছন্দে মহানৃত্য, গীত সুগম্ভীর—
এ কি ভাব-শূন্য প্রলাপ ? এ কি মদোন্মত্ত হাস্য ব্রহ্মাণ্ড-পতির ?

না না আছে ইহার অর্থ, আমরা খুঁজে বেড়াচ্ছি তার কাছে কাছে কাছে
বুঝতে পারছি না ক, কিন্তু এটা বুঝতে পারছি যে তার অর্থ কিছু আছে।
সঙ্কীর্ণ মনুষ্য-বুদ্ধি ; অসীম এ-ব্রহ্মাণ্ড ; আমরা বুঝ্‌ব তা কি ঠিক ?
আমরা দেখ্‌তে পাচ্ছি হেথায় সে-মহাস্ফটিকের মাত্র একটি ক্ষুদ্র দিক্।
না না সৃষ্টির আছেই আছে কোনো গুপ্ত অভিপ্রায় ও উদ্দেশ্য মহৎ ;
আছে প্রাণীর নরের বিশ্বের—একটা উচ্চতর কিছু শ্রেয়ঃ ভবিষ্যৎ !

আমি দেখছি যেন দূরে, দূরত্বে অস্পষ্ট একটা আলোকিত স্থান ;—
যেখানে সৌন্দর্য-উৎস উঠ্‌ছে, ও ঝঙ্কৃত হচ্ছে অবিশ্রান্ত গান।
গড়্‌ছি মনে মনে একটি উজ্জ্বল সুন্দর ভবিষ্যতে ব'সে আমরা কবি ;
(যেমন মাতা মনে মনে গর্ভস্থ সন্তানের একটি গড়ে মুখচ্ছবি—)
যেখানে এই পৃথিবীর এ-দুঃখজ্বালা বিষাদ বিরাগ রবে না এ-ভাবে ;
যেখানে এই বর্তমানের অভাব, ত্রুটি, অপূর্ণতা, পূর্ণ হয়ে যাবে ;
বন্ধুর হবে মসৃণ ; ও ঢেকে যাবে গিরিগুহা আলোকিত হ্রদে ;
কর্কশ যাহা—হবে মধুর ; শূন্য হবে পরিপূর্ণ সৌন্দর্য-সম্পদে ;
যেখানে অদৃশ্য হবে দৃশ্যমান ; অশ্রুত যাহা—হবে পরিশ্রুত ;
যেখানে অব্যক্ত হবে ব্যক্ত ; ও অননুভূত হবে অনুভূত ;

চিন্তা হবে বর্ণময়ী ; বৃত্তি হবে মূর্তিময়ী ; লীলাময়ী এত ;
অবোধ্য যা বোধ্য হবে ; অস্পষ্ট যা স্পষ্ট হবে ; অজ্ঞাত যা জ্ঞাত ;
দূরত্ব অতীত হবে ; জটিল যাহা সহজ হবে ; দুঃখ হবে দূর ;
পরার্থেই ইচ্ছা হবে ; ইচ্ছা হবে ফলবতী ; কার্য সুমধুর ;
আলোক সঙ্গীতে পূর্ণ, আনন্দে উল্লাসে মুগ্ধ; বিজ্ঞানে মহৎ,
স্বার্থত্যাগে স্বর্গীয়, সে গগনে গগনে ব্যাপ্ত—মহাভবিষ্যৎ !

ত্রিবেণী

নিবেদন

ত্রিবেণী প্রকাশিত হয় ১৯১২ সালে। কবিতাগুলি সম্বন্ধে তাঁর ভূমিকায় তিনি লিখেছেন :

"কবিতাগুলি তিন ভাগে বিভক্ত। (১) মিতাক্ষর—অর্থাৎ যাহার ছন্দোবন্ধ অক্ষরের সংখ্যার উপর নির্ভর করিতেছে। যুক্তাক্ষর ঐকার ও ঔকার ছন্দোবিশেষে দুই অক্ষর বলিয়া গণিত হইয়াছে। বৈষ্ণব কবিদিগের পদাবলিতে ইহার বিশেষ প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়। মৎপ্রচিত "মন্দ্র" কাব্যে সমস্ত কবিতা এই শ্রেণীর। (২) মাত্রিক—অর্থাৎ যে কবিতায় ছন্দ মাত্রা (syllable) দ্বারা পরিমিত হয়। মৎপ্রচিত "আলেখ্য" কাব্যে সমস্ত কবিতাই এই শ্রেণীর। (৩) দশপদী—অর্থাৎ মাত্রিক কবিতা, যাহাতে দশটি মাত্র পদ আছে। আমি মিতাক্ষরিক চতুর্দশপদী কবিতা না লিখিয়া মাত্রিক দশপদী কবিতা লিখি কেন, ইহার কৈফিয়ৎ এই যে, আমি ইংরাজি বা ইটালিয়ান সনেটের অন্ধ অনুকরণের পক্ষপাতী নহি। ক্ষুদ্র কবিতা লেখাই যদি উদ্দেশ্য হয়, তাহা হইলে আমার মনে হয় যে, চতুর্দশপদীর চেয়ে দশপদী ঐরূপ কবিতা রচনার পক্ষে সমধিক উপযোগী। অষ্টপদী ষট্পদী বা চতুষ্পদী কবিতা কেহ প্রচলিত করিতে চাহেন—আমার আপত্তি নাই। কিন্তু কবিতার দশটি পদ আমার কাছে বেশ 'যুৎসৈ' ঠেকে। এ কবিতাগুলি পাঠ করা প্রথমে 'আলেখ্যে'র কবিতাগুলিরই মত একটু শক্ত ঠেকিবে। একবার অভ্যাস হইয়া গেলে আর কোন কষ্ট হইবে না আশা করি।"

এ-দশপদী সনেটগুলি থেকে তিনটি শ্রেষ্ঠ সনেট এ-সংকলনে সংন্যস্ত হ'ল। এগুলির ছন্দ সম্বন্ধে সংক্ষেপে কিছু বলতে চাই।

এ-সনেটগুলির মধ্যে সনেটের আঁটসাঁট গড়ন ও অক্ষরবৃত্তের গাম্ভীর্য রক্ষিত হয়েছে—স্বরবৃত্ত ছন্দের কাঠামোয় অক্ষরবৃত্তের কল্লোল খানিকটা আমদানি ক'রে। তাই এগুলিকেও স্বরাক্ষরিক ছন্দ নাম দেওয়া সঙ্গত, কেন

না এ-কবিতাগুলির মধ্যে স্বরবৃত্তের সহজতার সঙ্গে অক্ষরবৃত্তের সমষ্টিগত ঔদার্যের সমন্বয় সাধিত হয়েছে। দু-একটা উদাহরণ দিই :

সেই সে প্রেয়সী শান্তি যেই শান্তি বিশ্বে প্রীতিভরা

এ রচনাটি নিখুঁৎ অক্ষরবৃত্তভঙ্গিম। কিন্তু তার পরেই স্বরবৃত্ত এল :

সেই সে প্রেয়সী গীতি অনুকম্পায় বাঁধা যাহার সুর

কারণ "অনুকম্পায়" এখানে স্বরবৃত্তভঙ্গিম—চার মাত্রা—পাঁচ মাত্রা নয়। ঠিক তেমনি এখানে স্বরবৃত্ত চরণ :

ইচ্ছা শুধু—পক্ষ দুটি গুটিয়ে এখন নীড়ে আসি ফিরে

অথচ তারপরেই অক্ষরবৃত্ত চরণ :

কে তুমি হে পরিচিত প্রিয় বন্ধু, কে আছ কুটিরে।

তাঁর দীর্ঘ "প্রবাসে" কবিতায় এ-ধরণের মেশামেশি ছন্দে ছন্দে লক্ষিত হবে। উদাহরণ দেওয়া বাহুল্য। ইতি—

দি. কু. রা.

আবার সে-গভীর গর্জন! চারি ধার
সেই নীল জলরাশি! দিগন্তপ্রসার
বারি-বক্ষ! সেই অন্ধ মত্ত আস্ফালন!
সেই ক্রীড়া! সেই উচ্চ হাস্য! সে-ক্রন্দন!
উত্তাল তরঙ্গ সেই! উদ্দাম উচ্ছ্বাস!
সেই বীর্য! সেই দর্প! সেই দীর্ঘশ্বাস!

হে সমুদ্র! সপ্ত বর্ষ পরে এ-সাক্ষাৎ
তোমার আমার সঙ্গে। ঘাত-প্রতিঘাত
গিয়াছে বহিয়া কত আমার হৃদয়ে;
বহে গেছে ঝঞ্ঝা কত, শোকে, দুঃখে, ভয়ে,
নৈরাশ্যে—এ-সপ্ত বর্ষে জীবনে আমার।
নুইয়া দিয়াছে সেই সপ্ত-বর্ষ-ভার
জীবনের মেরুদণ্ড—করি' খর্ব তার
উদ্দাম উল্লাস, তেজ, গর্ব প্রতিভার।
কিন্তু তুমি চলিয়াছ দর্পে সেই ম'ত
কল্লোলিয়া। কাল করে নাই প্রতিহত
তোমার প্রভাব; রেখা আনে নাই দেহে;
শুষে নেয় নাই মজ্জা।—সেইরূপ ধেয়ে
উত্তাল-তরঙ্গ-ভঙ্গে, মেঘমন্দ্রে বারি-
বক্ষ, বীর্যদর্পে দিক্‌দিগন্ত প্রসারি,
তুমি চলিয়াছ। ঊর্ধ্বে অনন্ত আকাশ;
নিম্নে চলিয়াছে তব একই ইতিহাস!

এত তুচ্ছ করেছিলে মানব-জীবন,
পরমেশ ! এই ক্ষুদ্র ক্ষীণ আয়োজন ;
তাও এত বিবর্তনশীল ! যেই মত,
সন্ধ্যার প্রাক্কালে, বর্ণ ভিন্ন হয় যত—
রক্ত, পীত, পিঙ্গল, ধূসর, পরিণত
শেষে কৃষ্ণে ; মানব-জীবনে সেই মত,
আসে বাল্য, যৌবন, বার্ধক্য ; পরে হায়,
সব শেষে সেই কৃষ্ণ মরণে মিশায় !

—সেই সে-সাক্ষাৎ হ'তে আজি, হে সমুদ্র !
সপ্ত বর্ষ কেটে গেছে আমার এ ক্ষুদ্র
পরমায়ু। ছিলাম সে-দিন স্নেহস্মিত,
উচ্চকণ্ঠ, ধর্মে-অবিশ্বাসী, গর্বস্ফীত,
উচ্ছৃঙ্খল। আজি হইয়াছি চিন্তা-নত,
জীবনের গূঢ়-তত্ত্ব-জিজ্ঞাসু নিয়ত,
গান গাই নিম্নতর ঠাটে—কম্প্র, ধীর,
ম্লান, ব্যথাপ্লুত, অশ্রুগদ্গদ, গম্ভীর।

সপ্ত বর্ষ পরে আজি, সমুদ্র, আবার
দেখিতেছি আন্দোলিত সে-মহাপ্রসার ;
শুনিতেছি সে-কল্লোল ; করিতেছি স্পর্শ
তোমার শীকর-পৃক্ত বায়ু।—এ কী হর্ষ !
কী উল্লাস ! মুদ্রালুব্ধ স্বার্থপূর্ণ হৃদি,
ছাড়ি নীচ ক্রয় ও বিক্রয়,—জলনিধি,
মিশিয়াছে নিখিলের সঙ্গে যেন আসি',
হেরি' তব অসীম-বিতত জলরাশি।

আমি দেখিতেছি শুক্লপক্ষ প্রথমার
নিশীথে, নিস্তব্ধ দ্বিপ্রহরে, পারাবার!
তোমার এ-মত্ত ক্রীড়া। যখন অবনী
ঘুমায়, উঠিছে ঐ হাহাকার ধ্বনি,
চলেছে ও-আস্ফালন।—হৃদয়ে তোমার
বহিছে ঝটিকা যেন; প্রবল ঝঞ্চার
নিষ্পেষণে মুহুর্মুহু মেঘমন্দ্র সম
উঠে মহা আর্তনাদ; বিদ্যুদ্দামোপম
জ্ব'লে ওঠে রেখান্বিত ফেনা সমুচ্ছ্বাসি',
পিঙ্গল আলোকে দীপ্ত করি' জলরাশি।
কী প্রকাণ্ড অপচয় এ-বিশ্বসৃষ্টির—
এই নীল বারিরাশি! এ-নিত্য অস্থির
সমুচ্ছ্বাস শক্তির কী নিরর্থক ব্যয়!
এ-গর্জন, আস্ফালন, ব্যর্থ সমুদয়।
কিংবা চলিয়াছ সিন্ধু! গর্জি', আর্তনাদি',
সেই চিরন্তন প্রশ্ন—"কোথা? কোথা আদি?
কোথা অন্ত? কোথা হ'তে চলেছি কোথায়?"
উৎক্ষেপিয়া ঊর্মিরাশি আঁকাড়িতে চায়
অনন্তেরে; নিজ ভারে পরে নেমে আসে।
আবার ছড়ায়ে পড়ে—গভীর নিশ্বাসে,
প্রকাণ্ড আক্ষেপে—বক্ষ 'পরি আপনার,
ব্যর্থ বিক্রমের ক্ষুব্ধ অবসাদ-ভার।
উপরে নির্মল ঘন নীলাকাশ স্থির,
কোটি কোটি নক্ষত্রে চাহিয়া জলধির
নিষ্ফল চীৎকার, ক্ষুদ্র আস্ফালন 'পরে;
রহে সে গভীর গাঢ় অনুকম্পাভরে।

দেখে পিতা যেমতি পুত্রের উপদ্রব ;
ঈশ্বর দেখেন যথা করুণা-নীরব
গাঢ় স্নেহে,—মানুষের দম্ভ অভিমানে ;
—কাছে সে চাহিয়া ক্ষুব্ধ জলধির পানে।

কী গাঢ় ও নীলাকাশ! কী উজ্জ্বল, স্থির!
নক্ষত্রে বেষ্টিয়া চতুষ্প্রান্ত জলধির।
যাহা ধ্রুব, সত্য ; যাহা নিত্য ও অমর ;
তাহা বুঝি এইরূপই স্থির ও ভাস্বর।
তবু ভাবি—ঐখানেই আলোকের নয়
শেষ, ওই ঘননীল, ওই জ্যোতির্ময়-
যবনিকা-অন্তরালে আছে লুক্কায়িত
এক মহালোক ; ঐ যবনিকাঙ্কিত
কোটি কোটি মহাদীপ্ত উদ্ভাসিত রবি
শুদ্ধমাত্র যার ছায়া, যার প্রতিচ্ছবি।
তুলে লও যবনিকা যাদুকর! তবে
কী আছে পশ্চাতে তার—দেখাও মানবে।

কবি দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের প্রতি *

আজি ভাই গৌরবের উচ্চ শিখরের 'পরে,
দাঁড়ায়ে চাহিয়া দেখ নিয়ে তিলেকের তরে!
ওই দূর তলদেশে আনন্দ-আলোকে কিবা!
ফুটিয়া উঠেছে তব জীবন-তরুণ-দিবা।

স্নিগ্ধ শ্যাম বটচ্ছায়ে সুন্দর সৈকততীরে,
পবিত্র আশ্রম দেখ ধৌত জলাঙ্গীর নীরে,
হাস্যময় সে-আশ্রম হাস্য-সবিতার করে,
হাস্যময় তপোবন সে-তপনে তৃপ্তিভরে।

সে-আশ্রমে আনন্দের মহর্ষি আসীন সুখে,
হরষলহরসুধা উঠিছে ছুটিছে মুখে;
আধি-ব্যাধি ভাসাইয়া প্রবাহিছে অবিরত,
ফুটিছে কানন ভরি' মালতি-মল্লিকা কত।

আজি দেখিতেছি তাঁরে, অপসৃত করি সুখে
কালের এ অন্তরাল, বিজড়িত সুখে দুখে,
আর তাঁর পাশে সেই সুন্দর শিশুটি তুমি;
শৈশবের সে-শোভায় উজলিয়া পুণ্যভূমি।

সুন্দর শিশুটি তুমি গাহিছ তুলিয়া তান—
"এমন সুন্দর শিশু কার ছেলে"—সেই গান।

---

* কবি দ্বিজেন্দ্রলাল ৫।৬ বৎসর বয়সকালে স্বীয় পিতৃদেব দেওয়ান কার্তিকেয়চন্দ্র রায়ের বন্ধু রায় দীনবন্ধু মিত্রকে তদীয় "এমন সুন্দর" কবিতা আবৃত্তি করিয়া মোহিত করিতেন। তখন দীনবন্ধুবাবু খড়িয়ার (জলাঙ্গীর) তীরে ষষ্ঠীতলার বাটীতে থাকিতেন। বলা যাইতে পারে, তৎকালে দীনবন্ধুর মধুর হাসি ও দেওয়ানজীর পবিত্র গান কৃষ্ণনগরের সরভাজা সরপুরিয়ার ন্যায় আর একটি বিশেষত্ব ছিল।

আহা যেন বাল্মীকির হৃদয় আনন্দে ছেয়ে
মধুময় রামায়ণ শিশুকণ্ঠে উঠে গেয়ে।

আশ্রমবালক মোরা শুনিতাম প্রীতিভরে
পিতার মধুর গাথা তোমার মধুর স্বরে ;
সে-অধ্যায় সুধাময় জীবনের সূচনায়,
শৈশবের সে-সৌহার্দ্য জীবনে কি ভোলা যায় ?

সেই চিত্র সুললিত আজি চিত্ত আঁকিয়াছে,
সাধের আলেখ্যখানি এনেছি, রাখিও কাছে ;
শৈশবের স্নিগ্ধ স্মৃতি চিরপ্রীতিকর ভাই,
প্রীতিভরে পূর্বকথা তুলিলাম আজি তাই।

সেই দীক্ষা শৈশবের ভুল নাই এ-জীবনে ;
কবিদিষ্ট কুঞ্জবনে ভ্রমিয়াছ হৃষ্টমনে ;
আজি নানাবিধ ফুলে, সাজি তব ভরিয়াছে,
পর্যাপ্ত প্রসূন-পথ সম্মুখে বিস্তৃত আছে।

'শিশু মানবের পিতা', নহে শুধু কাব্যকথা,
তোমার জীবনে তার আছে পূর্ণ সার্থকতা ;
যেই শিশু কলকণ্ঠে রোমাঞ্চিত হ'ত কেশ
আজি তাহে মুখরিত পবিত্র 'আমার দেশ'।

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র মিত্র

উত্তর

অনেক দিনের কথা—ঠিক্ নাহি আসে মনে—
মধুর শৈশবগাথা সে-প্রথম জাগরণে ;
তবু যেন মনে পড়ে স্নিগ্ধ শ্যাম বটচ্ছায়,
এখনও গভীর সেই সামগান শোনা যায়—

বিজড়িত সঙ্গে তার—সে-নিশার অবসান,—
পবনহিল্লোল আর প্রভাতের পিকতান,
প্রাতঃসূর্যবিহসিত সে-আমার জন্মভূমি,
সঙ্গে তার বিজড়িত প্রিয়বর, আছ তুমি !

মনে পড়ে আজ এই জীবনের এ-সন্ধ্যায়
যেন সেই সুগভীর মহাগীত শোনা যায় ;
তাহার মধুর স্মৃতি এখনও বাজিছে প্রাণে,
বাজিবে তাহার সুর এ-জীবন-অবসানে !

ঠিক্ মনে নাই বটে—সেই হাসি সেই গান,—
'দীনবন্ধু' 'কার্তিকেয়' দুই বন্ধু এক প্রাণ,
সেই হাসি সেই গান আমার জীবনে আসি',
বিজড়িয়া রচিয়াছে এই গান এই হাসি।

কিম্বা সব কল্পনা এ ! ভালোবাসো ব'লে তাই
সকলই সুন্দর দেখ আমার—প্রাণের ভাই !
রচিয়াছি যেই হাসি, যেই গান রচিয়াছি,
সে-হাসির সে-গানের নহে কিছু কাছাকাছি ;

অন্য কোনো নাই সুখ, অন্য কোনো নাহি আশা,
শুধু চাহি এ জীবনে তোমাদের ভালোবাসা!
যদি এই গানে হাস্তে লভিয়াছি তব প্রীতি,
সার্থক আমার হাস্ত, সার্থক আমার গীতি।

প্রভাতে এ-জীবনের হাসায়েছি বঙ্গভূমি,
করিয়াছি তীব্রব্যঙ্গ—বন্ধুবর জানো তুমি;
জীবনের এ-সন্ধ্যায় মিলায়ে গিয়াছে হাসি—
সব হাস্ত শুয়ে আছে রোদনের পাশাপাশি!

মানুষের সুখ দুঃখ, মানুষের পুণ্যপাপ,
দেবতার বর আর পিশাচের অভিশাপ,
নাটকের যে-আকারে রচিতেছি বন্ধু আজ,
ইহাই আমার ব্রত, ইহাই আমার কাজ।

ঈশ্বরের কাছে আর অন্য কিছু নাহি চাই,
আমার এ-খ্যাতি শুধু পুণ্যে গড়া হোক্ ভাই;
তোমাদের শুভ ইচ্ছা আমার মস্তকে ধরি',
যেন বন্ধ তোমাদের ভালোবাসা নিয়ে মরি।

বিবাহের উপহার

করিছ প্রবেশ আনন্দে ভাই এ-বিবাহ-মন্দিরে ;
অত দ্রুত নয়—সংযত হও, আরো ধীরে আরো ধীরে ;
দীন, নতজানু, কাতর, সাশ্রু, আগে নম জননীরে ;
আগে চাহ ভাই বিধাতার ক্ষমা, করজোড়ে নতশিরে ;
প্রার্থনা করো, পবিত্র হও, প্রবেশের আগে তুমি ;
এ নহে বিলাসবাসর তোমার—এ মহাতীর্থভূমি !

—এখন ভিতরে এসো ; চেয়ে দেখ—যুক্ত যুগ্মপাণি,
অর্চনারত দাঁড়ায়ে আছে সে-প্রেমের প্রতিমাখানি ;
মুদিত নয়ন, নীরব, শান্ত, স্পন্দনহীন, স্থির ;
যেন বা সে কোনো স্বর্গের দেবী, যেন নহে পৃথিবীর ;
তুমি তার ধ্যান, তুমি তার জ্ঞান, আছে তব পথ চাহি',
যুগযুগান্ত হ'তে—যেন তার আর কিছু মনে নাহি !

সহসা ও কী ও! আনন দীপ্ত রঞ্জিত অনুরাগে !
ঐ দেখ বুঝি নড়িল প্রতিমা—ঐ দেখ, বুঝি জাগে !
মেলিয়াছে আঁখি, চিনেছে তোমায়, তাই বুঝি মৃদু হাসে !
ঐ দেখ—দুটি বাড়ায়ে বাহু সে তোমার নিকটে আসে ।
কাছে যাও—আরো কাছে, ধরো হৃদে—সে তোমার, তুমি তার—
দুই দীপশিখা মিশে থাক্ আজ—হয়ে যাক্ একাকার ।

এক হয়ে থাক্ এক হয়ে যাক্ তবে আজ দুটি প্রাণ,
বীণার মৃদুল ঝঙ্কার সনে উঠুক গভীর গান ;
এক হয়ে যাক্ কলকল্লোলে আজ এই নদনদী ;
এক দেহ, এক মন, এক প্রাণ—অহরহ নিরবধি—

এক হয়ে যাক্ সাগর আকাশ, স্বর্গমর্ত্ত্যবাসী ;
এক হয়ে যাক্ ইন্দ্রধনুর বর্ণে অশ্রু হাসি।
—উৎসব করো উৎসব করো উৎসব করো সবে ;
আলোকে পুষ্পে হাস্য উৎসে বরণে, বাদ্যরবে,
দাও, উলু দাও, বাজাও শঙ্খ, বাজাও দক্ষ বাঁশি,
দম্পতি'পরে দেবগণ আজ বরিষ পুষ্পরাশি !

ধরো এ-রত্নে হৃদয়ে, যত্নে রেখো তারে সমাদরে,
ঘর ছেড়ে আজ পরের মেয়েটি আসিছে তোমার ঘরে।
সুখে থেকো, সুখে রেখো, দেখ চেয়ে ঘরখানি আলো ক'রে,
স্বর্গ হইতে নামিয়া তোমার বৌ আসিতেছে ঘরে।
উৎসব করো বাজাও বাদ্য গভীর মধুর স্বরে,
বাজাও শঙ্খ, দাও উলু দাও—বৌ আসিতেছে ঘরে !

প্রথম চুম্বন

নব বিকশিত কুসুমিত ঘন পল্লবে
      আবৃত, নিভৃত, অশোককুঞ্জভবনে ;
শ্যামলমোহন ; মুখর কোকিলসঙ্গীতে ;
      মৃদু কম্পিত নব বসন্ত পবনে ;

বেষ্টি' আম্রপাদপে মাধবী বল্লরী ;
      নম্র মালতীলতিকা বকুলে জড়ায়ে ;
আকাশে উঠিয়া কুসুমগন্ধ উচ্ছ্বসি ;
      মূর্ছিত হয়ে কাননে পড়িছে গড়ায়ে ;

নীরব মেদিনী ; দূরবিসর্পী প্রান্তরে,
ক্ষীণ রেখা সম নিলীন তটিনী, অদূরে ;
শ্যামল ক্ষেত্র, সুপ্ত শুভ্র কৌমুদী ;—
শ্যামলে মিশেছে শুভ্র—মধুর মধুরে ;

গগন মধুর ; মধুর ধরণী সুন্দরী ;
মধুর পবন বহিছে শনৈঃ শনৈঃ ;
তার মাঝখানে সুমধুরতম দৃশ্যটি—
সেই নির্জনে যুগল প্রথম প্রণয়ী।

মানবের এই প্রথম প্রণয়সঙ্গমে,
কী ভাবে আবেগে উঠে প্রাণ তার আকুলি' !
যেমন প্রথম মলয়, শিশির অন্তিমে
যেমন গভীর নিশীথে মুরলীকাকলি ;—

নবীন নীহার সম ; বিকশিত মল্লিকা-
সম সৌরভ ; গভীর যেমতি সিন্ধু ;
গগনের ম'ত গাঢ় ; উষা সম উজ্জ্বল ;
সুখনিমগ্ন যেমন পূর্ণ ইন্দু।

মানবের এই প্রথম পেলব যৌবনে—
যখন কেবল আশাময়ী এই ধরণী ;
যখন গোলাপবর্ণে জীবন রঞ্জিত ;
পা'ল তুলে দিয়ে চ'লে যায় শুধু তরণী ;

যখন সকলি কেবল মাধুরীমণ্ডিত—
    আকাশে, ভুবনে, সাগরে, তারায়, তপনে ;
তখন সহসা কিশোরহৃদয়মঞ্জরী
    মুকুলিত হয় প্রথম প্রণয়-স্বপনে।

এমন স্থান সে—নীরব নিভৃত নির্জনে,
    এমন শুভ্র নিশীথে, লগ্ন শুভ এ—
যুগল প্রণয়ী ;—করে করতল অর্পিত,
    নয়নে নয়ন ; নীরব বিভোর উভয়ে।

প্রকাশ করিবে তাহারা কী ভাষা উচ্চারি',
    অসীম সে-কথা, নিহিতহৃদয়বাহিনী ?
মানব রচে নি এমন ভাষা কি সঙ্গীতে,
    প্রকাশ করে যা প্রথম প্রণয়কাহিনী।

প্রকাশ করিল সে-কথা একটি শব্দেতে—
    (প্রকাশ করিতে পারে তা একটি শব্দ)—
স্ফুরিত হইল সে-কথা একটি চুম্বনে ;—
    উঠিল চমকি' কুঞ্জ বিনিস্তব্ধ।

কাঁপিল কানন ; কাঁপিল তটিনী সুন্দরী ;
    তড়িৎপ্রবাহে আকাশ উঠিল কাঁপিয়া ;
হাসিল চন্দ্র ; চাহিল পুষ্প ইঙ্গিতে ;
    শাখার উপর গাহিয়া উঠিল পাপিয়া।

প্রণয়িযুগল বেষ্টিত ভুজবন্ধনে,
মিলিত অধর অধরে, বক্ষ বক্ষে ;
বিদ্যুৎস্রোত বহিল তাদের অঙ্গেতে ;
লুপ্ত হইল বিশ্ব তাদের চক্ষে।

প্রণয়ের সেই প্রথম মধুর চুম্বনে,
সে গীতে, সর্ব কোলাহল যায় থামিয়া ;
মানবের ঘোর দৈন্যে, দুঃখে, দুর্দিনে,
আসে একবার স্বর্গরাজ্য নামিয়া।

জীবনের সার প্রথম মধুর যৌবনে ;
যৌবনসার প্রথম মধুর প্রণয়ে ;
প্রণয়ের সার প্রথম মধুর চুম্বনে ;
—মানবের অতি সুখময়তম ক্ষণ-এ।

মানবের সুখে, দুঃখে, বিপদে, সম্পদে,
একবার আসে সে-সুখ জীবনে মরণে ;
একবার দেখি মানবহৃদয়মন্দিরে—
প্রেমের প্রতিমা—মৃত্যু দলিত চরণে !

ভালোবাসা

পর্বতের পাদমূলে দাঁড়ায়ে নির্জনে,
দেখিতেছিলাম—চাহি' নিস্পন্দ নয়নে,
বিস্ময়নির্বাক্, তার অভ্রভেদী শির ;
শুনিতেছিলাম তার নীরব গম্ভীর
অকথিত মহামন্ত্র ।—সহসা, পশ্চাৎ,
নামিল কোমল কর স্কন্ধে অকস্মাৎ !
ফিরিয়া চকিতে আমি করিনু জিজ্ঞাসা—
"কে তুমি, কে তুমি দেবি !" "আমি ভালোবাসা ।-
মর্ত্ত্যে জন্ম বটে মম, তাহার শিখরে
আমার ভবন । চাহি মহা আশাভরে
উঠিতে গগনে ; কিন্তু ধরাতলপানে,
এক মহা অনুকম্পা মোরে টেনে আনে ।
ঐ যে দেখিছ উচ্চ গিরিচূড়া, তার
উপরে আমার গৃহ । নহে সে সংসার,
তথাপি নহে সে স্বর্গ । চাহ যদি তাই,
আইস মানব, আমি সঙ্গে নিয়ে যাই ।"

প্রবাসে

শান্ত এ কান্তারপ্রান্তে শ্রান্ত আমি, বন্ধুগণ !
কান্ত এই বৃক্ষতলে বসি আমি কিছুক্ষণ ;
আমারে দিও না বাধা—তোমরা একটু এগিয়ে যাও—
এ-সৌন্দর্যরাজ্যমাঝে আমায় একটু ছেড়ে দাও ।

—পড়েছে ঐ সূর্যরশ্মি গিরিচূড়ায়—মনোহর !
পড়েছে ঐ সূর্যরশ্মি তরুশিরে—কী সুন্দর !
মাঠের উপর রাঙা মাটি, সবুজ—গাছের চারি ধার,
আকাশে এক রঙের খেলা খেলে যাচ্ছে—চমৎকার !
গাভীগুলি দলে দলে বিজন পথে যাচ্ছে সব ;
পাখীগুলি ফিরছে নীড়ে—কী মধুর ঐ কলরব !
বড় বিজন বড় স্তব্ধ !—এ স্বপ্ন না ইন্দ্রজাল ?
প্রাণের মধ্যে গভীর শব্দে বেজে উঠ্ছে বাল্যকাল ।
এমনি চেয়ে দেখতাম না কি দেওঘরের গিরিবন !
তথাপি কী প্রভেদ দুয়ে !—কী আশ্চর্য বিবর্তন !
তখন একটা আশার আলোক ঘেরে থাকৃত ললাট তার,
এখন ক্লান্তির অবসাদে ঘেরে আসে অন্ধকার ;
একটা হর্ষ, একটা দীপ্তি, একটা গীতি, আজি হায়,
একটা মহামহিমা—যা মুছে গেছে বসুধায় ;
এখন চোখে ঝাপ্‌সা দেখি, মনের মধ্যে করি বাস,
এখন শুধু চিন্তা আসে, ঘনিয়ে ওঠে দীর্ঘশ্বাস ।

সে দিন আমি পাই না ফিরে !—সেই দীর্ঘ অবকাশ,
সেই দীপ্তি, সে অতৃপ্তি, সেই শক্তি, সে উল্লাস !
—আবার বালক হব আমি, শুধু আমি এই চাই—
শিশুর মত ভালোবাসি, শিশুর মত হাসি গাই ।
জীর্ণ বস্ত্র সম জরায় ছুঁড়ে ফেলে, আবার চাই—
ঘাটের উপর জুটি সবাই ; মাঠের উপর ছুটে যাই ;
গাছে উঠে ফল্‌সা পাড়ি, আঁকশি দিয়ে পাড়ি কুল ;
বিছিয়ে কাপড় শিউলি কুড়াই ; জলে হেঁটে পদ্মফুল ;

বিকেল বেলা ক্রিকেট খেলা ; সকাল বেলা পড়ার ধুম ;
সন্ধ্যাটি না হতে হতেই বিছানাতে প'ড়ে ঘুম ;
পুকুর পাড়ে ঘোড়ার বাচ্ছা ধ'রে চ'ড়ে বেগে ধাই ;
ঝম্প দিয়ে নদীর বক্ষে সাঁতার কেটে চ'লে যাই ;
যৌবনের সেই প্রথম বিকাশ নিজভাবে ওতপ্রোত ;
বাহুর মধ্যে শিরায় শিরায় নূতন শক্তির অনল-স্রোত ;
প্রথম শ্রমের পারিশ্রমিক ; নিজের পায়ে দিয়ে ভর
আবার গিয়ে সাজাই নিয়ে নিজের বাড়ি, নিজের ঘর ;
আবার করি দশের সঙ্গে যশের যুদ্ধ—করি জয় ;
বাজ্‌ছে শুনি বিজয় ভেরী উচ্চরবে শহরময় ;
শত্রুগণের পরাজয়, আর মিত্রজনের ভক্তিস্তব ;—
করি আবার নূতন শক্তি শিরায় শিরায় অনুভব ।

সুমধুর সে এলোমেলো মলয় বায়ুর পাগল ঢং,
বকুল ফুলের মুকুল গন্ধ, অশোক পাতার কচি রং,
শরৎকালের রঙিন সন্ধ্যা, গ্রীষ্মকালের পলাশবন,
বর্ষাকালের প্রথম মেঘের প্রথম গুরু গরজন,
পাড়াগাঁয়ে বৎসরান্তে 'রাজার বাড়ি' দুর্গোৎসব,
ছেলের ভাতে আঙিনাতে বন্ধুজনের কলরব,
সাগরবক্ষে প্রভাত বায়ে পাল তুলে সে-যাওয়ার সুখ,
স্বদেশেতে বাল্য-স্মৃতি, বিদেশেতে চেনামুখ,
বিয়ের রাতে সাহানাতে প্রথম নিশার অবসান,
যৌবনের সেই প্রথম স্বপ্নে চুম্বনের সেই সুরাপান,
জীবনকুঞ্জে হেনার গন্ধ আকুল অন্ধ বাসনায়,
—কে আছিস্ রে—আজকে আমার জীর্ণ প্রাণে নিয়ে আয় !

তবে—উষার মত ভূষায় সেজে হাসিগুলি চ'লে আয়!
রাঙাপায়ে নেচে নেচে আয় রে আমার কোলে আয়!
অধরপুটে দুধের গন্ধ, মুঠোর মধ্যে জবাফুল
মাথার উপর কোঁকড়া কোঁকড়া ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া কালো চুল,
দিয়ে বেতাল করতালি, বেসুর সুরে গেয়ে গীত,
নিজেই বিভোর—নিজের গানে নিজেই যেন বিমোহিত;
ওরে কান্ত, ওরে চপল, কাঁধে আমার দিয়ে ভর,
বুকের উপর লতিয়ে উঠে কণ্ঠ আমার জড়িয়ে ধর।

বাল্যে পড়া মহাভারত রামায়ণের উপাখ্যান—
বিষ্ণুর মহা যোগনিদ্রা, হিমালয়ে শিবের ধ্যান,
রামের হরধনুর্ভঙ্গ, ধনঞ্জয়ের লক্ষ্যভেদ,
যুধিষ্ঠিরের রাজসূয়, রামের যজ্ঞ অশ্বমেধ,
জন্মেজয়ের সর্পযজ্ঞ, পরীক্ষিতের সর্পভয়,
হনুমানের লঙ্কাদাহ, দশাননের পরাজয়,
জহ্নুমুনির নিঃশেষ করা গণ্ডূষেতে গঙ্গাজল,
ইন্দ্র-বৃত্রে তুমুল যুদ্ধ, বিশ্বামিত্রের তপোবল,
আলাদীনের মায়াপ্রদীপ, আলিবাবার গুপ্ত ধন,
হার্কিউলিসের বাহুবল ও আকিলিসের মহারণ,
কন্দর্পের সে পুষ্পধনু, উর্বশীর সে অভিসার,
হেলেনের সে-কামাগ্নিতে ট্রয়রাজ্য ছারখার!
ক্লিওপেট্রার কটাক্ষেতে রোমের শৌর্য নতশির,
দুইটি জাতির মহা নৃত্য রূপের তালে পদ্মিনীর;—
তোদের চক্ষে তোদের নৃত্যে, কলকণ্ঠে—সেই সব
আবার পড়ি, আবার করি প্রাণের মধ্যে অনুভব।

আবার ছুটি চিন্তারাজ্যে, প্রাণের তৃষায় করি ধ্যান—
জগতের এক নূতন তথ্য, নূতন অর্থ, নূতন জ্ঞান।
পৃথিবী উড়েছে শূন্যে সূর্যে করি' প্রদক্ষিণ ;
চাকার মত ঘুরে যাচ্ছে ক্রমাগত রাত্রিদিন ;
চৌতালেতে নৃত্য করে—জ্ব'লে উঠে নিভে যায়—
কোটি সূর্য, কোটি গ্রহ, কোটি চন্দ্র—নীলিমায় ;
এ-মহা স্ফুলিঙ্গবৃষ্টি—মহাসৃষ্টি মহানাশ—
বক্ষে ধ'রে দাঁড়িয়ে আছে ভয়ে স্তব্ধ নীলাকাশ ;
ভাবে মনে—বিশ্বপতির এ কী খেলা বিশ্বময়,
কেন বা এ-মহাসৃষ্টি ? কেন বা এ-মহালয় ?
এ কি একটা নিয়ম ? কিম্বা বিশ্বপতির স্বেচ্ছাচার ?
এ কি একটা অধঃপতন ? এ কি একটা অগ্রসার ?
ইহার আদি দেখি নাই ত, জানি না তার কোথায় শেষ ;
জান কি তা—সত্য বলো—তুমিই নিজে পরমেশ ?
নিয়ে এস সে-সব প্রশ্ন, আমার পাত্র ভ'রে দাও ;
শিরায় শিরায় ঢেলে দাও আজ, আমায় পাগল ক'রে দাও।

—না না—ঐ যে রশ্মিরাজ্য আকাশ থেকে নেমে যায় ;
ঐ যে দূরে যশের ডঙ্কা ধীরে ধীরে থেমে যায় ;
একটা তীব্র উন্মাদনা হয়ে আসে ম্রিয়মাণ,
সন্ধ্যা হয়ে আসে, দিবা হয়ে আসে অবসান।
চ'লে যা সব চ'লে যা রে—শূন্য হাসির অট্টরব ;
তাতে শান্তি ?—মনের ভ্রান্তি—নিতান্তই অসম্ভব।
বাল্যক্রীড়া, প্রেমের স্বপ্ন, যশের বাদ্য, ডুবে যায়—
মহা শোকের অশ্রুজলে, মহা গভীর সমস্যায়।

তবে আয় রে মলিনমুখী শীর্ণদেহ দীর্ণপ্রাণ!
সর্ব অঙ্গে পদাঘাত ও লাঞ্ছনা ও অপমান;
রুক্ষ মাথায় উড়্‌ছে ধূলি; রিক্ত শুষ্ক করতল;
অঙ্গ বেয়ে পণ্ডশ্রম ও গণ্ড বেয়ে অশ্রুজল;
নাই ক পেটে অন্নকণা; শীতে কাঁপে ছিন্নবাস;
অশ্রুবারি, শুষ্কনেত্র, আর্তধ্বনি, দীর্ঘশ্বাস।
—অশ্রুর রাজ্য নিয়ে আয় রে, হাসির রাজ্য মুছে যাক্;
অনুকম্পায় কেঁদে আমার সকল দুঃখ ঘুচে যাক্।

যেথায় ভগ্ন দেবমন্দির—রুক্ষশিরে তুল্‌ছে বট;
বিশাল ধূ ধূ মাঠের মধ্যে পরিত্যক্ত শূন্য মঠ;
মড়ক শুয়ে খাচ্ছে খাবি—ক্রোশের মধ্যে নাই ক কেউ;
শুষ্ক নদী, উষর ক্ষেত্র, মরুভূমির বালুর ঢেউ;
বাড়ির ভিটেয় চর্‌ছে ঘুঘু, উঠানে তার জম্‌ছে ঘাস,
মৃত গৃহস্বামীর আত্মা ফেল্‌ছে যেন দীর্ঘশ্বাস;
শীতের ঘন কুজ্ঝটিকা পাকিয়ে উঠ্‌ছে চারি ধার;
দিবার মৃত্যুর পরপারে ঘনিয়ে আস্‌ছে অন্ধকার;
ভগ্ন রাজধানীর ধ্বংস ভাব্‌ছে দিয়ে মাথায় হাত,
একটা মৃত শিল্প কর্‌ছে সিন্ধুনীরে অশ্রুপাত;
একটা লুপ্ত সভ্যতা সে অসভ্যতার ক্রীতদাস;
একটা আশার শিওরে জেগে একটা মহাসর্বনাশ;
একটা শুষ্ক ভালোবাসা পায় নি যে তার প্রতিদান;
বাৎসল্য যা হৃদয় দিয়ে কিন্‌ছে শুধু অপমান;
দাক্ষিণ্য যা ফতুর হয়ে দ্বারে দ্বারে পাত্‌ছে হাত;
দাতার প্রতি কৃতঘ্নতা, দয়ার শিরে পদাঘাত;

সে-সব দৃশ্য নিয়ে আয় রে—সুখের দৃশ্য সুখে থাক্—
আজি আমার চক্ষু দিয়ে অশ্রুধারা ব'য়ে যাক্।

নিয়ে আয় সেই সীতার ভাগ্য, দময়ন্তীর অশ্রুধার,
শকুন্তলার পরিত্যাগ, আর দ্রৌপদীর সেই হাহাকার,
যুধিষ্ঠিরের রাজ্যচ্যুতি, ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রশোক,
হরিশ্চন্দ্রের সর্বস্বান্তি—নিয়ে আয় সেই অশ্রুলোক।
সীজার হানিবলের পতন, সেকেন্দরের রাজ্যলোপ,
নেপোলিয়ন বিপক্ষেতে সারিবদ্ধ ইয়ুরোপ;
দারার মাথার উপর খড়্গ, ঔরংজীবের মৃত্যুভয়,
পানিপথে বিশ্বজয়ী মহারাষ্ট্রের পরাজয়;
যেথায় ক্লান্তি, যেথায় ব্যাধি, যন্ত্রণা ও অশ্রুজল—
ওরে তোরা হাতে ধ'রে আমায় সেথায় নিয়ে চল্।

হাস্য শুধু আমার সখা? অশ্রু আমার কেহই নয়?
হাস্য ক'রে অর্ধ জীবন করেছি ত অপচয়।
চ'লে যা রে সুখের রাজ্য, দুখের রাজ্য নেমে আয়!
গলা ধ'রে কাঁদতে শিখি গভীর সহবেদনায়;
সুখের সঙ্গ ছেড়ে করি দুখের সঙ্গে সহবাস—
ইহাই আমার ব্রত হোক, ইহাই আমার অভিলাষ।

পরের দুঃখে কাঁদতে শেখা—তাহাই শুধু চরম নয়!
মহৎ দেখে কাঁদতে জানা—তবেই কাঁদা ধন্য হয়।
কর্মের জন্য দেহপাত ও ধর্মের জন্য জীবনদান!
সত্যের জন্য দৃঢ় ব্রত, পরের জন্য দেওয়া প্রাণ,

বুভুক্ষুকে ভিক্ষা দেওয়া, ব্যাধির পার্শ্বে জাগরণ,
নিরাশ্রয়কে গৃহ দেওয়া, আর্তরক্ষা দৃঢ়পণ ;
পিতার জন্য পুরুর কুষ্ঠ, পরের জন্য ভীষ্মের প্রাণ,
ভগীরথের তপস্যা ও দধীচির সেই অস্থিদান,
গান্ধারীর সেই স্নেহের উপর স্বকীয় কর্তব্যজ্ঞান,
সীতার সে-স্বর্গীয় ক্ষমার আলোকিত উপাখ্যান,
বুদ্ধদেবের গৃহত্যাগ ও শ্রীচৈতন্যের প্রেমোচ্ছ্বাস,
প্রতাপসিংহের দারিদ্র্য ও দুর্গাদাসের ইতিহাস।
সেই রাজ্যে নিয়ে যা রে, কাঁদার মত কাঁদিয়ে দে—
জাগিয়ে দে, লাগিয়ে দে, নাচিয়ে দে, মাতিয়ে দে ;
উঠুক বন্যা, যেন তাহা স্বর্গের রাজ্যে ছড়িয়ে যায়,
শেষে প্রাণের উজান টানে মায়ের পায়ে গড়িয়ে যায়।

গাঢ় হয়ে আসে রাত্রি ; অন্ধকারের আবরণ
প'ড়ে গেছে। ছেয়ে গেছে উপত্যকা গিরিবন ;
উপরে অনন্ত শূন্যে কোটি কোটি জ্যোতিষ্মান্
ঋষিবৃন্দ সমস্বরে ধরেছে ঐ সামগান—
স্তব্ধ ধরা শিয়রেতে কাঁদে শুধু ঝিল্লীরব ;
ধরার বক্ষে দুরু দুরু করি মাত্র অনুভব।
শুধু মহামৃত্যু সম কৃষ্ণ নভ ঘন স্থির ;
পক্ষ দিয়ে ঘিরে আছে এ রহস্য পৃথিবীর।

গাঢ় হতে গাঢ়তর হয়ে আসে অন্ধকার ;
এই বিশ্বে আমি একা, কেহ যেন নাহি আর।
গভীর রাত্রি ! সহযাত্রী—কোথা তারা ?—কেহ নাই-
শ্রান্ত পদে অন্ধকারে একা গৃহে ফিরে যাই।

সোনার স্বপ্ন

সে গেছে, আমার মর্মপটে ছায়ার মত ভেসে,
সে গেছে, আমার হৃদয়-তটে ঢেউয়ের মত এসে,
তারে নয়ন ভ'রে দেখেছিলাম,
প্রাণের ভিতর রেখেছিলাম
রক্ত দিয়ে ঘিরে—
ঘুমের সিংহাসনে বসিয়েছিলাম সোনার স্বপ্নটিরে।

সে, প্রথম যে-দিন এসেছিল আমার দৃষ্টিপথে ;
সেদিন সুখের ম'ত ভেসেছিল আমার মনোরথে ;
তারে, মহারাজার মতন ক'রে
আদর ক'রে যতন ক'রে
নিয়েছিলাম তবে ;
সে দিন ভরেছিল জীবন আমার মহামহোৎসবে।

সে দিন পুষ্পে পুষ্পে কুঞ্জ-ভবন উঠ্‌ল আমার সেজে ;
সে দিন রোমাঞ্চিত ক'রে পবন, উঠ্‌ল বীণা বেজে ;
সুখে হৃদয় আমার ভ'রে গেল,
ডুবে গেল, ম'রে গেল,
—সন্ধ্যাসম মেঘে ;
যেন উঠলাম আমি জন্ম হতে জন্মান্তরে জেগে।

যখন মগ্ন আছি সুখের নীড়ে স্বপ্ন গেল টুটে ;
হঠাৎ বীণার তারটি ছিঁড়ে গেল আর্তনাদে উঠে।
এখন রহি সন্ধ্যার গভীর গানে,
বীণার স্বরে, কবির তানে,
চেয়ে নিরবধি—
সেই স্বপ্ন আমার—যুগের ঘুমে একবার আসে যদি।

স্মৃতি

একটা স্মৃতি—সকল স্মৃতির সেরা
জাগে চিত্ত মাঝে ;
একটা গীতি—দুঃখ দিয়ে ঘেরা
সুখের মত বাজে ;
কন্যার প্রতি মায়ের বিদায়বাণী,
রূপের মত নেশা,
বিরঞ্জিত সন্ধ্যার মেঘখানি—
সুখে দুঃখে-মেশা।

উঠেছিলে যখন চিত্তে নামি',
উষার মত জেগে,
কী গরিমা দেখেছিলাম আমি
আকাশে ও মেঘে !
জন্মান্তরের যেন একটি গাথা
জীবন আমার ব্যেপে,
সৃষ্টির উজ্জ্বল একখান ছেঁড়া পাতা
এল যেন কেঁপে।

ঝাঁপিয়ে গীতি লভিল সে মরণ
ঝঙ্কারেরই কূপে ;
পুড়ে গেল উষার রাঙা বরণ
নিজের তীব্র রূপে ;
ক্ষুব্ধ নই ক—আছে সেই স্মৃতি
জীবন আমার ছেয়ে ;
আকাশ থেকে আছে সেই প্রীতি
আমার পানে চেয়ে।

এসো

এসো সন্ধ্যার ম'ত ধীরে, নিশীথের ম'ত ছেয়ে,
মলয়ের ম'ত মধুর ;
এসো কন্যার ম'ত সেবায়, জননীর ম'ত স্নেহে,
ব্রীড়ায় সম বধূর ;
এসো কুসুমের ম'ত শোভায়, জ্যোৎস্নার ম'ত ভেসে,
কল্পনার ম'ত সেজে ;
এসো আকাশের ম'ত ঘিরে, প্রভাতের ম'ত হেসে,
দুঃখের ম'ত বেজে ;
এসো হতাশার উপর ধেয়ে, আনন্দের ম'ত বেগে,
করুণার ম'ত গড়াও ;
এসো আত্মার ম'ত আমার জীবনের ম'ত জেগে,
মৃত্যুর মত জড়াও।

অভিমান

হাসির তুফান তুলে দিতে পারে সে,
ফোটায় হৃদে কুসুম শত শত ;
নেমে আসে অশ্রুবৃষ্টিধারে সে,
গর্জে কভু বজ্রধ্বনির মত ;
রবির আলো মেঘের অঙ্গে খেলায়ে,
মেঘের কোলে ইন্দ্রধনু সাজায় ;
অসিখানি শমীবৃক্ষে হেলায়ে,
উদাস প্রাণে মুরলীটি বাজায়।

আর ত কৈ সে মুরলীটি বাজে না!
—এমনি কি!—কিসের দুঃখ হেন?
আর ত সন্ধ্যা তেমন ক'রে সাজে না!
—তাহার সে দোষ; আমার দুঃখ কেন?
আমারে সে কৈ ত ভালো বাসে না,
আমার উপর কিসের তাহার দাবি!
সে ত—কৈ সে আমার জন্য আসে না,
আমি কেন তাহার জন্য ভাবি?
—না না—তবু বহু দিনের বাসনা,
বহু দিনের স্মৃতি জেগে আছে,
—ওগো তুমি কেন আমার আসো না,
এসো তুমি এসো আমার কাছে!
বড় রোষে বড় অভিমানে গো,
হয়েছে এ ক্ষণিক ছাড়াছাড়ি;
সকল ব্যথা গ'লে গেছে প্রাণে গো
এসো আমার—এসো তোমার বাড়ি!

হাসির তুফান আবার দাও গো উঠায়ে,
অশ্রুজলে ভাসিয়ে দাও গো গুণী!
আবার কুসুম প্রাণে দাও গো ফুটায়ে,
আবার তোমার গভীর ধ্বনি শুনি।
অরুণবর্ণ মেঘের সঙ্গে মিশায়ে,
খেলাও আবার ইন্দ্রধনুহাসি।
দীর্ণ করি' গভীর অমানিশা এ
—এসো, আবার বাজাও তোমার বাঁশি।

আহ্বান

যখন আমার সাঙ্গ হবে খেলা তুমি আমার এসো ;
যখন ধীরে প'ড়ে আস্‌বে বেলা তুমি একবার এসো।
যখন যাবে কলরব থামি,—যখন বড় একা,
কাউকে খুঁজে পাব না ক আমি—তুমি দিও দেখা।

আমার নাই ক এমন কোন দাবি—তোমায় আমি পাবো!
আমি শুধু পূর্বকথা ভাবি—তুমিও কি ভাবো?
তোমার পানে সকল দুঃখ মাঝে আমি চেয়ে থাকি ;
যখন দুঃখ বড় বক্ষে বাজে তুমি আসো নাকি?

আমি শুনি মাঝে মাঝে যেন তোমার কণ্ঠস্বর ;
তোমার স্পর্শ তোমার হাস্য হেন করি অনুভব।
সবই ভ্রান্ত এ কি?—সবই মায়া তোমার এই প্রীতি?
শুধু স্বপ্ন!—শুধুই কি ছায়া? শুধুই কি স্মৃতি?

যখন হেথায় ছেড়ে যাব শেষে যাহা কিছু প্রেয় ;
তুমি তখন সাগরতীরে এসে সঙ্গে নিয়ে যেও ;
তুমি গেছ আগে ; তোমার আছে জানা সমুদয় ;
তুমি যদি থাকো আমার কাছে, পাব না ক ভয়।

সে দিন তুমি এসো ওগো প্রিয়—এসো আমার কাছে ;
সেই দেশে—আমায় দেখিয়ে দিও কোথায় কী আছে।
আঁধার যদি—তুমি শুধু হেসো আঁধার হবে আলো ;
তুমি আমায় এগিয়ে—নিতে এসো, তুমি বেসো ভালো।

সুন্দরী কে ?

কে সে বল সবার চেয়ে সুন্দরী স্ত্রীলোক ?
ভ্রূ দুটি যার টানা টানা ? নাসিকাটি বাঁশি-পানা ?
ওষ্ঠ দুটি রাঙা রাঙা ? পটোল-চেরা চোখ ?
নাকটি কিন্তু কুঁচিয়ে রাখে, ওষ্ঠ দুটি বাঁকিয়ে থাকে,
চাহনিতে বিরক্তি, আর কথায় কথায় 'রোখ' ;

আমি বাহির থেকে এলে, মূর্তি যেন বাঘে খেলে,
ঝগড়া একবার বাধ্‌লে পরে যেন 'ছিনে জোঁক' ;
অনেক ভেবে চিন্তে তবে, যাহার কাছে যেতে হবে,
কৈতে কথা প্রতি পদে গিল্‌তে হবে ঢোঁক ;

নয় ক নিজে কোনো কর্মা, অন্যের উপর অগ্নিশর্মা,
আমার চেয়ে বেশি আমার টাকার দিকেই ঝোঁক ;
হোক না তাহার গৌর বরণ, হোক না তাহার নিখুঁত গড়ন,
আমার চক্ষে নহে সে ত সুন্দরী স্ত্রীলোক।

তবে কে সে সবার চেয়ে সুন্দরী স্ত্রীলোক ?
সেই সে—যাহার বক্ষে প্রীতি, চক্ষে যাহার সুখের স্মৃতি,
বাক্যে যাহার কলগীতি—ঝরে পুণ্যশ্লোক ;
মুখে পবিত্রতা-রাশি, ওষ্ঠে যাহার সদাই হাসি,
তাহার আবার অন্য রূপের কিসের আবশ্যক ?

হাস্যে আমার সখী সমা, ক্রোধে মূর্তিমতী ক্ষমা,
রোগে দুঃখে চিন্তাজ্বরে—হরে সর্বশোক ;

দৈন্যে আমার উপকারী পাপে আমার পাপহারী,
তাকে অসুন্দরী বলে কে সে আহাম্মক ?

তারেই বলি দেখ্‌তে ভালো, তাহার রূপে জগৎ আলো,
তাহার রূপে মুগ্ধ আমি—যেমনই সে হোক্‌ ;
নাই বা হ'ল গৌর বরণ, নাই বা হ'ল নিখুঁত গড়ন,
তারেই বলি সবার চেয়ে সুন্দরী স্ত্রীলোক।

সুখ

সেই সে প্রেয়সী শান্তি—যেই শান্তি বিশ্বে প্রীতিভরা
সেই সে শ্রেয়সী গীতি—অনুকম্পায় বাঁধা যাহার সুর
সেই গরীয়সী চিন্তা—পরহিতে যেই চিন্তা করা ;
সেই মহাকাব্য—সহবেদনায় যাহা সুমধুর।
—সেই শ্রেয়ঃ ধর্ম—যেই ধর্ম পরদুঃখ করা দূর ;
পরার্থে-ই দুঃখ সহা—সেই মহাদুঃখ মহাসুখ।
সেই সে পরমানন্দ—পরসুখে আনন্দ প্রচুর !
সেই মহানন্দ কাছে স্বার্থের যে আনন্দ—কতটুক !
সে-সুখের তুলনায় সূর্যোদয়ে পূর্ণচন্দ্র প্রায়—
স্বার্থ-সিদ্ধির অতি তুচ্ছ এ-আনন্দ পাণ্ডু হয়ে যায়।

শান্তি

একে একে চোখের সামনে কুসুমগুলি প'ড়ে যাচ্ছে ঝ'রে,
ধীরে ধীরে পশ্চিমের ঐ পীতাকাশে নিভে আস্‌ছে আলো ;
ঝাপ্‌সা হয়ে আস্‌ছে জগৎ ; সোনার বরণ হয়ে আস্‌ছে কালো ;
চক্ষু দুটি মুদে আস্‌ছে ক্রমে ক্রমে যেন নেশার ঘোরে ;
বাজ্‌ছে দূরে বিজয়-ডঙ্কা—শুনতে পাচ্ছি লাগ্‌ছে না ত ভালো ;
ইচ্ছা শুধু—পক্ষ দুটি গুটিয়ে এখন নীড়ে আসি ফিরে।
কে তুমি হে পরিচিত প্রিয়-বন্ধু কে আছ কুটীরে ?
এইছি আমি তোমার কাছে, এখন তোমার সন্ধ্যা-দীপটি জ্বালো ;
শ্রান্ত আমি ভ্রান্ত আমি, চিনেছি গো নিজের জন্মভূমি,
দেখাও কোথায় শান্তিশয্যা পেতে আমার রেখেছ গো তুমি।

অবসান

করেছি কর্তব্য যাহা, সেইটুকু আমার যাহা জমা ;
করেছি অন্যায় যাহা, সেইটুকু খরচ—দিও বাদ।
তোমাদের যেটুকু দিয়েছি দুঃখ, কোরো ভাই ক্ষমা ;
তোমাদের যেটুকু দিয়েছি সুখ—কোরো আশীর্বাদ।
তোমাদিগের মধ্যে আমি আসি নি ক করতে বিসম্বাদ,
কেড়ে নিতে কারো অংশ, দিতে কারো মনে দুঃখ ভাই ;
দুঃখ যদি দিয়ে থাকি ভ্রান্তিবশে—ক্ষম অপরাধ ;
বিনিময়ে দুঃখ যদি পেয়ে থাকি—কোন দুঃখ নাই।
জমার চেয়ে খরচ বেশি হয়ে থাকে, তোমরা দোষী নহ ;
জমা যদি বেশি থাকে, তোমাদিগের সেটা অনুগ্রহ।

গান

গান

ইতিপূর্বে বলেছি যে, গানেই দ্বিজেন্দ্রলালের কবি-প্রতিভা সবচেয়ে বেশি উজ্জ্বল ও গভীর হয়ে প্রকাশ পেয়েছে। এখানে শুধু তাঁর গানগুলির বিন্যাস সম্বন্ধে দু-একটি কথা বলেই এ-নিবেদনের সমাপ্তি টানব।

গানগুলি পাঁচটি খণ্ডে ভাগ করা হয়েছে: পূজা, দেশ, প্রেম, প্রকৃতি ও বিবিধ। "বিবিধ"-খণ্ডে বৈরাগ্য, শিশু, অনামী, আবেশ, নাস্তিক্য ও অপেরাসঙ্গীত-বর্গীয় গান (ঘনতমসাবৃত) সংযুক্ত হোল। পঞ্চাশের আগেই তাঁর দেহান্ত হয়—যদি তিনি আর দশ বৎসরও বাঁচতেন তবে বাংলা গান আরো কত সমৃদ্ধ হোত নানাভাবে তার খানিকটা পরিচয় পাওয়া যাবে নানা ভঙ্গীর গানে তাঁর প্রতিভার আশ্চর্য সহজ বিকশন থেকে। রবীন্দ্রনাথ প্রায়ই বলতেন—জীবনস্মৃতিতে লিখেছেনও বিশদ করে—যে, গানের সুর থেকে বিচ্ছিন্ন করে শুনলে তা থেকে তার যতটা দেয় ততটা পাওয়া যায় না। তাই গানের প্রকাশ হওয়া উচিত স্বরলিপির সঙ্গেই বটে। আমাদের দেশে স্বরলিপির আরো প্রচার হলে ভবিষ্যতে গীতিকারগণ তাঁদের গান স্বরলিপির সঙ্গেই প্রকাশ করবেন। তাঁর শ্রেষ্ঠ গানের অনেকগুলি আমি ত্রিশ বৎসর আগে স্বরলিপি করে প্রকাশ করেছিলাম—অদূর-ভবিষ্যতে তাঁর আরো অনেক গানের স্বরলিপি প্রকাশ করতে অনেকেই আমাদের অনুরোধ করেছেন। আশা করি সে-কাজ সম্পন্ন করে যেতে পারব—অপরিশোধ্য পিতৃঋণ শোধ করতে নয়—স্বীকার করতে! ইতি—

দি. কু. রা.

দ্রষ্টব্য

'বঙ্গ আমার' গানের শেষ চরণে তিনি প্রথম লিখেছিলেন: 'আমরা ঘুচাব মা তোর দৈন্য হৃদয়রক্ত করিয়া শেষ'।

পূজা

ভৈরবী—কাওয়ালী।

গিরি-গোবর্ধন-গোকুল-চারী
  যমুনা-তীর-নিকুঞ্জ-বিহারী,
শ্যাম, সুঠাম, কিশোর, ত্রিভঙ্গিম
  চিত্ত-বিনোদন-কারী।
পীতাম্বর, বনপুষ্পবিভূষণ
  চন্দন-চর্চিত, মুরলী-ধারী,
যিসি রবসে মোহিত বৃন্দাবন
  উছলত যমুনা-বারি।
নূপুর-শিঞ্জিত, নৃত্য-বিমোহন,
  কপট-চপল চতুরালী,
প্রেম-নিমীলিত, নয়ন-বিলোল
  কদম্ব-তলে বনমালী।
নন্দকি নন্দন, মায়ি যশোদা,
  নয়নাঞ্জন ব্রজবাল পিয়ারী,
যিসি লাগি থি কুল ছোড়ি রাধা
  আকুল সব ব্রজনারী।
কংস-বিনাশক, মথুরাপতি জয়,
  নিখিল-ভকত-জন-শরণ,
দুর্জন-পীড়ক, সজ্জন-পালক,
  সুর-নর-বন্দিত-চরণ।
জয় নারায়ণ, শ্রীশ, জনার্দন,
  জয় পরমেশ্বর, ভব-ভয়-হারী,
জয় কেশব, মধুসূদন, জয়
  গোবিন্দ মুকুন্দ মুরারি!

কীর্তন—একতালা।

ও কে, গান গেয়ে গেয়ে চ'লে যায়
পথে পথে ঐ নদীয়ায় !
ও কে, নেচে নেচে চলে, মুখে 'হরি' বলে
ঢ'লে ঢ'লে পাগলেরই প্রায়।

ও কে, যায় নেচে নেচে, আপনায় বেচে
পথে পথে শুধু প্রেম যেচে যেচে,
ও কে, দেবতা-ভিখারী মানব দুয়ারে
দেখে যা রে তোরা দেখে যা।

(ও সে) বলে 'কৈ ত কেউ পর নাই'
(ও সে) বলে 'সবাই যে নিজ ভাই'
(ও সে) বলে 'শুধু হেসে শুধু ভালোবেসে
(আমি) ভ্রমি দেশে দেশে এই চাই।

ও কে, প্রেমে মাতোয়ারা চোখে বহে ধারা
কেঁদে কেঁদে সারা কেন ভাই ?
সব, দ্বেষ-হিংসা ছুটি' আসি' পড়ে লুটি'
(ও তার) ধূলি-মাখা দু'টি রাঙ্গা পায়।

বলে, ছেড়ে দাও মোদের, মোরা চ'লে যাই !
নৈলে প্রভু, তোমার প্রেমে গ'লে যাই !
এ যে, নূতন মধুর প্রণয়েরই পুর
হেথা আমাদের কোথা ঠাঁই ?

(ঐ যে) নরনারী সব পিছে ধায়,
(ওই) প্রতিধ্বনি ওঠে নীলিমায়,
(তোরা) আয় সবে চ'লে, মুখে হরি ব'লে,
(তোদের) ছেঁড়াপুঁথি ফেলে চ'লে আয়।

মিশ্র ভূপালী—একতালা।

তুমি যে হে প্রাণের বঁধু—আমরা তোমায় ভালোবাসি।
তোমার প্রেমে মাতোয়ারা তাই, তোমার কাছে ছুটে আসি।
তুমি শুধু দিয়ো হাসি, আমরা দিব অশ্রুরাশি,
তুমি শুধু চেয়ে দেখ, বঁধু, আমরা কেমন ভালোবাসি।
গাঁথি মালা শতদলে, দিব তব পদতলে,
তুমি হেসে ধর গলে, আমরা দেখ্‌বো তোমার মধুর হাসি;
তুমি কভু দয়া করে বাজিও তোমার মোহন বাঁশী;
শুন্‌তে তোমার বাঁশীর ধ্বনি, বঁধু! আমরা বড় ভালোবাসি।
তুমি মোদের হোয়ো প্রভু, আমরা তোমার হব দাসী;
তুমি যে হে ব্রজের বঁধু, আমরা যে গো ব্রজবাসী।
ভালোবাস নাহি বাস, নইক তার অভিলাষী—
আমরা শুধু ভালোবাসি—ভালোবাসি—ভালোবাসি।

মিশ্র খাম্বাজ—একতালা।

উঠেছে ঐ নূতন্ বাতাস, চল্ লো কুঞ্জে ব্রজনারী
বেজেছে ঐ শ্যামের বাঁশী, আর কি ঘরে রৈতে পারি।
কুঞ্জে পাখী গেয়ে উঠে গান,
বকুল গন্ধ দুকূল ছেয়ে আকুল করে প্রাণ;
বহে) চাঁদের আলোয় ঝিকিমিকি যমুনার ঐ নীলবারি।

রাধার নামে বাঁশী সেধে,
(ওসে) আকুল হ'ল কেঁদে কেঁদে ;
শত ভাঙ্গা মূর্চ্ছনাতে লুটিয়ে পড়ে মনের খেদে ;
আয় লো ফেলে মিছে কাজে,
দেখি কোথায় বাঁশী বাজে,
(ওসে) কেমন চতুর দেখ্‌বো আজি, কেমন চতুর বংশীধারী ।

ভৈরোঁ—রূপক ।

ঐ প্রণয় উচ্ছ্বাসি' মধুর সম্ভাষি' যমুনায় বাঁশী বাজে ;
ঐ কানন উছলি' 'রাধে রাধে' বলি'—যায় চলি' বনমাঝে ।
পড়ে ঘুমাইয়ে ঐ তারাকুল সই, অধরে মিলায়ে হাসি ;
ঐ যমুনায় এসে নায় এলোকেশে নিভৃতে জ্যোছনা রাশি ।
ঐ নিশি পড়ে ঢুলে যমুনার কূলে উছলে যমুনা-বারি ;
সখি ত্বরা ক'রে আয় যাই যমুনায় হেরিতে মুরলী-ধারী ।
ঐ সমীরণ ধীরে উঠিল জাগি রে, জাগিল পূরবে ভাতি ;
ঐ কুঞ্জে গীত উঠে কুঞ্জে ফুল ফুটে—সখি রে পোহাল রাতি ।

আড়ানা—ত্রিতাল ।

ভূতনাথ ভব ভীম বিভোলা বিভূতিভূষণ ত্রিশূলধারী ।
ভুজঙ্গভৈরব বিষাণভীষণ ঈশান শঙ্কর শ্মশানচারী ।
বামদেব শিতিকণ্ঠ উমাপতি ধূর্জটি পশুপতি রুদ্র পিনাকী,-
মহাদেব মৃড় শম্ভু বৃষধ্বজ ব্যোমকেশ ত্র্যম্বক ত্রিপুরারি ।
স্থাণু কপর্দী শিব পরমেশ্বর মৃত্যুঞ্জয় গঙ্গাধর স্মরহর
পঞ্চবক্ত্র হর শশাঙ্কশেখর কৃত্তিবাস কৈলাসবিহারী ।

বাউল—একতালা।

(ঐ) মহাসিন্ধুর ওপার থেকে কি সঙ্গীত ভেসে আসে ;
কে ডাকে মধুর তানে, কাতর প্রাণে, "আয় চ'লে আয়,
ওরে আয় চ'লে আয় আমার পাশে" ॥
বলে "আয়রে ছুটে আয়রে ত্বরা, হেথা নাইক মৃত্যু নাইক জরা,
হেথা বাতাস গীতিগন্ধভরা চিরস্নিগ্ধ মধুমাসে ;
হেথায় চির শ্যামল বসুন্ধরা চির জ্যোৎস্না নীলাকাশে ॥
কেন ভূতের বোঝা বহিস্ পিছে,
ভূতের বেগার খেটে মরিস্ মিছে ;
দেখ ঐ সুধাসিন্ধু উছলিছে পূর্ণ ইন্দু পরকাশে।
ভূতের বোঝা ফেলে ঘরের ছেলে,
আয় চ'লে আয় আমার পাশে ॥
কেন কারাগৃহে আছিস্ বন্ধ,
ওরে, ওরে মূঢ় ওরে অন্ধ !
ওরে, সেই সে পরমানন্দ যে আমারে ভালোবাসে।
কেন ঘরের ছেলে পরের কাছে প'ড়ে আছিস্ পরবাসে !"

ভৈরবী—খং।

পাগলকে যে পাগল ভাবে,
এখন সে পাগল কি ঐ পাগল পাগল
একদিন সেটা বোঝা যাবে।
নয় কে পাগল ভুবন 'পরে ?
কেউ বা পাগল মানের তরে,
কেউ বা পাগল রূপের লাগি', কেউ বা পাগল ধনলোভে।

নিমাই সন্ন্যাসী হ'ল প্রেমের পাগল হ'য়ে শুনি,
জ্ঞানের পাগল হ'য়ে বুদ্ধ রাজ্য ছেড়ে হ'ল মুনি,
ব্রহ্মা পাগল ধ্যান করি',
পরের জন্য পাগল হরি,
ভাবে পাগল শ্মশান-ভূমে বেড়ায় ভোলা উদাসভাবে।

বাউল—একতলা।

একবার গালভরা মা ডাকে।
মা ব'লে ডাক্, মা ব'লে ডাক্, মা ব'লে ডাক্ মাকে।
ডাক্ এম্‌নি ক'রে, আকাশ, ভুবন সেই ডাকে যাক্ ভ'রে,
আর ভায়ে ভায়ে এক হ'য়ে যাক্ যেখানে যে থাকে।
দু'টি বাহু তুলে নৃত্য ক'রে ডাক্‌রে মা মা ব'লে,
আর নেচে নেচে আয়রে মায়ের ঝাঁপিয়ে পড়ি কোলে;
মায়ের চরণ দু'টি জড়িয়ে ধ'রে আন্‌রে মায়ে লুটে,
ছেলের শুন্‌লে সে ডাক্ দেখ্‌বো সে মা কেমন ক'রে থাকে।
দিয়ে করতালি মা মা বলি' ডাক্‌রে এম্‌নি ভাবে,
উঠে প্রবল বন্যা ভাবে ভুবন ভাসিয়ে দিয়ে যাবে,
মায়ের বুকের উপর আছ্‌ড়ে প'ড়ে চক্ষু দু'টি মুদে
আমার গান ভেসে যাক্ প্রাণ ভেসে যাক্ দেখি শুধুই মাকে।

মিশ্র খাম্বাজ—ঢিমা তেতালা।

এবার তোরে চিনেছি মা, আর কি শ্যামা তোরে ছাড়ি!
ভবের দুঃখ ভবের জ্বালা (এবার) পাঠিয়ে দিছি যমের বাড়ী।
ফেলেছিলি গোলক-ধাঁধায়—মা হ'য়ে কি এমন কাঁদায়!
(শেষে) ছেলের কান্না শুনে অমনি (ও তোর) কেঁদে উঠ্‌ল মায়ের নাড়ী।

হাত ধরে' নিলি মোরে (আমি) ভাবনা ভীতি গেলাম ভুলে,
চোখের বারি মুছিয়ে দিয়ে (তখন) নিলি আমায় কোলে তুলে ;
ভবার্ণবে দিশেহারা—পাচ্ছিলাম না কূল-কিনারা,
(তখন) দেখা দিলি ধ্রুবতারা (অমনি) তারা বলে' দিলাম পাড়ি।

সিন্ধু কানাড়া—যৎ।

আর কেন মা ডাক্‌ছ আমায়, এই যে এইছি তোমার কাছে।
আমায় নাও মা কোলে দাও মা চুমা এখন তোমার যত আছে।
সাঙ্গ হ'ল ধূলা-খেলা, হ'য়ে এল সন্ধ্যাবেলা,
ছুটে এলাম এই ভয়ে মা এখন তোমায় হারাই পাছে!
আঁধার ছেয়ে আসে ধীরে, বাহু দিয়ে নাও মা ঘিরে,
ঘুমিয়ে পড়ি এখন আমি—মা তোমার ঐ বুকের মাঝে।
এবার যদি পেইছি শ্যামা, আর ত তোমায় ছাড়্‌ব না মা
ওমা, ঘরের ছেলে পরের কাছে মায়ে ছেড়ে সে কি বাঁচে।

আশাবরী—যৎ।

চরণ ধ'রে আছি প'ড়ে একবার চেয়ে দেখিস্ না মা ;
মত্ত আছিস্ আপন খেলায়, আপন ভাবে বিভোর বামা।
একি খেলা খেলিস্ ঘুরে, স্বর্গ, মর্ত্য, পাতাল জুড়ে,
ভয়ে নিখিল মুদে আঁখি, চরণ ধ'রে ডাকে মা মা।
হাতে মা তোর মহাপ্রলয়, পায়ে ভব আত্মহারা,
মুখে হা হা অট্টহাসি, অঙ্গ বেয়ে রক্তধারা।
তারা, ক্ষেমঙ্করী, ক্ষেমা, অভয়ে, অভয় দে মা,
কোলে তুলে নে মা শ্যামা, কোলে তুলে নে মা শ্যামা।

আয় মা এখন তারা রূপে স্মিত মুখে শুভ্র বাসে ;
নিশার ঘন আঁধার দিয়ে উষা যেমন নেমে আসে ;—
এত দিন ত' কালী, ভীমা,—তোরই পূজা করেছি মা,
পূজা আমার সাঙ্গ হ'ল, এখন মা তোর অসি নামা।

জয়জয়ন্তী—একতালা।

প্রতিমা দিয়ে কি পূজিব তোমারে এ বিশ্ব নিখিল তোমারি প্রতিমা ;
মন্দির তোমার কি গড়িব, মা গো! মন্দির যাঁহার দিগন্ত নীলিমা!
তোমার প্রতিমা শশী, তারা, রবি,
সাগর, নির্ঝর, ভূধর, অটবী,
নিকুঞ্জভবন, বসন্ত পবন, তরু, লতা, ফল, ফুলমধুরিমা।
সতীর পবিত্র প্রণয় মধু,—মা!
শিশুর হাসিটি, জননীর চুমা,
সাধুর ভকতি, প্রতিভা, শকতি,
—তোমারি মাধুরী তোমারি মহিমা ;
যেই দিকে চাই এ নিখিল ভূমি—
শতরূপে মা গো বিরাজিত তুমি,
বসন্তে, কি শীতে, দিবসে, নিশীথে,
বিকশিত তব বিভব গরিমা।
তথাপি মাটির এ প্রতিমা গড়ি',
তোমারে পূজিতে চাই মা ঈশ্বরী!
অমর কবির হৃদয় গভীর
ভাষায় যাহার দিতে নারে সীমা ;

খুঁজিয়ে বেড়াই অবোধ আমরা,
দেখি না আপনি দিয়েছ মা ধরা,
দুয়ারে দাঁড়ায়ে হাতটি বাড়ায়ে,
ডাকিছ নিয়ত করুণাময়ী মা।

মিশ্র বেহাগ খাম্বাজ—একতালা।

নীল আকাশের অসীম ছেয়ে ছড়িয়ে গেছে চাঁদের আলো।
আবার কেন ঘরের ভিতর আবার কেন প্রদীপ জ্বালো।
রাখিস্ না আর মায়ায় ঘেরে, স্নেহের বাঁধন ছিঁড়ে দে রে—
উধাও হ'য়ে মিশিয়ে যাই, এমন রাত আর পাবো না লো।
পাপিয়ার ঐ আকুল তানে আকাশ ভুবন গেল ভেসে;
থামা এখন বীণার ধ্বনি, চুপ্ করে শোন্ বাইরে এসে;
বুক এগিয়ে আসে মরণ, মায়ের মত ভালোবেসে—
এখন যদি মরতে না পাই, তবে আমার মরণ ভালো।
সাঙ্গ আমার ধুলা-খেলা—সাঙ্গ আমার বেচা-কেনা;
এয়েছি করে' হিসেব নিকেশ যাহার যত পাওনা দেনা।
আজি বড়ই শ্রান্ত আমি—ওমা কোলে তুলে নে না;
যেখানে ঐ অসীম সাদায়—মিশেছে ঐ অসীম কালো।

ভৈরবী—ঢিমা তেতালা।

পতিতোদ্ধারিণি গঙ্গে!
শ্যামবিটপিঘনতটবিপ্লাবিনি, ধূসরতরঙ্গভঙ্গে!
কত নগ নগরী তীর্থ হইল তব চুম্বি' চরণ-যুগ মাই,
কত নরনারী ধন্য হইল মা তব সলিলে অবগাহি',

বহিছ জননী এ ভারতবর্ষে—কতশত যুগ যুগ বাহি',
করি' সুশ্যামল কত মরু প্রান্তর শীতল পুণ্যতরঙ্গে।
নারদকীর্তনপুলকিতমাধববিগলিতকরুণা ক্ষরিয়া,
ব্রহ্মকমণ্ডলু উচ্ছলি' ধূর্জটিজটিলজটা'পর ঝরিয়া,
অম্বর হইতে সম শতধার জ্যোতিঃপ্রপাত তিমিরে—
নামি' ধরায় হিমাচলমূলে—মিশিলে সাগর সঙ্গে।
পরিহরি' ভবসুখদুঃখ যখন মা, শায়িত অন্তিম শয়নে,
বরিষ শ্রবণে তব জলকলরব, বরিষ সুপ্তি মম নয়নে,
বরিষ শান্তি মম শঙ্কিত প্রাণে, বরিষ অমৃত মম অঙ্গে—
মা ভাগীরথি! জাহ্নবি! সুরধুনি! কলকল্লোলিনি গঙ্গে!

দেশ

মিশ্র ঝিঁঝিট—একতালা।

বঙ্গ আমার! জননি আমার! ধাত্রি আমার! আমার দেশ,
কেন গো মা তোর শুষ্ক নয়ন, কেন গো মা তোর রুক্ষ কেশ!
কেন গো মা তোর ধূলায় আসন, কেন গো মা তোর মলিন বেশ!
সপ্ত কোটি সন্তান যার ডাকে উচ্চে "আমার দেশ"—

উদিল যেখানে বুদ্ধ-আত্মা মুক্ত করিতে মোক্ষদ্বার,
আজিও জুড়িয়া অর্ধ-জগৎ ভক্তিপ্রণত চরণে যাঁর;
অশোক যাঁহার কীর্তি ছাইল গান্ধার হতে জলধি শেষ,
তুই কি না মা গো তাঁদের জননী! তুই কি না মা গো তাঁদের দেশ?

একদা যাহার বিজয় সেনানী হেলায় লঙ্কা করিল জয়,
একদা যাহার অর্ণব-পোত ভ্রমিল ভারতসাগরময় ;
সন্তান যার তিব্বত-চীন-জাপানে গঠিল উপনিবেশ,
তার কি না এই ধূলায় আসন, তার কি না এই ছিন্ন বেশ !

উঠিল যেখানে মুরজমন্দ্রে নিমাই-কণ্ঠে মধুর তান,
স্থায়ের বিধান দিল রঘুমণি চণ্ডীদাসও গাইল গান ;
যুদ্ধ করিল প্রতাপাদিত্য তুই ত না সেই ধন্য দেশ !
ধন্য আমরা, যদি এ শিরায় থাকে তাঁদের রক্তলেশ ।

যদিও মা তোর দিব্য-আলোকে ঘেরে আছে আজ আঁধার ঘোর
কেটে যাবে মেঘ নবীন গরিমা ভাতিবে আবার ললাটে তোর ;
আমরা ঘুচাব মা তোর দৈন্য ! মানুষ আমরা নহি ত মেষ !
দেবি আমার ! সাধনা আমার ! স্বর্গ আমার ! আমার দেশ !

কিসের দুঃখ, কিসের দৈন্য, কিসের লজ্জা, কিসের ক্লেশ !
সপ্ত কোটি মিলিত কণ্ঠে ডাকে যখন "আমার দেশ" !

সাধের বীণা

ওরে আমার সাধের বীণা, ওরে আমার সাধের গান,
(তোর ঐ) কোমল সুরে ব্যথা ঝ'রে আকুল করে আমার প্রাণ !
(ও তোর) শত তানে একই কথা, শত লয়ে একই ব্যথা,—
(শুধু) নিরাশার কাতরতা, হতাশার অপমান ।

(কোরাস্)—
পারো যদি জাগো বীণা, ধর আরও উচ্চ তান,
গাইব আমি নূতন গানে—নূতন প্রাণে কম্পমান।

(যখন) বীণার সুরে গলা সেধে, গাইতে যাই রে ফেলি কেঁদে,
(শুধু) মিশে যায় সে মনের খেদে—আঁখির জলে অবসান ;
(কোথায়) আনন্দেতে উঠ্‌বো নেচে, মরা মানুষ উঠ্‌বে বেঁচে,
(আমি) পাই না সুধা-সাগর ছেঁচে—ভাগ্যে শুধুই বিষপান !
(কোরাস্)—
পারো যদি জাগো বীণা, ধর আরও উচ্চ তান,
গাইব আমি নূতন গানে—নূতন প্রাণে কম্পমান।

(বীণা) পারো যদি জাগো তবে, বেজে ওঠো উচ্চ রবে,
(আজ) নূতন সুরে গাইতে হবে, আমি সঙ্গে ধরি তান ;
(ছেড়ে) লোক-লজ্জা, সমাজ-ভয়—যাতে, সবাই আবার মানুষ হয়,
(এম্‌নি) গাইতে পারি দয়াময়—কর এই বরদান।
(কোরাস্)—
পারো যদি জাগো বীণা, ধর আরও উচ্চ তান,
গাইব আমি নূতন গানে—নূতন প্রাণে কম্পমান।

ভারতবর্ষ

ইমন্-ভূপালী—একতালা

যে দিন সুনীল জলধি হইতে উঠিলে জননি ! ভারতবর্ষ !
উঠিল বিশ্বে সে কি কলরব, সে কি মা ভক্তি, সে কি মা হর্ষ !
সেদিন তোমার প্রভায় ধরার প্রভাত হইল গভীর রাত্রি ;
বন্দিল সবে, "জয় মা জননি ! জগত্তারিণি ! জগদ্ধাত্রি !"

সদ্যঃস্নান-সিক্তবসনা চিকুর সিন্ধুশীকরলিপ্ত !
ললাটে গরিমা, বিমল হাস্যে অমল কমল-আনন দীপ্ত ;
উপরে গগন ঘেরিয়া নৃত্য করিছে—তপন তারকা চন্দ্র ;
মন্ত্রমুগ্ধ, চরণে ফেনিল জলধি গরজে জলদমন্দ্র।

শীর্ষে শুভ্র তুষারকিরীট, সাগর-উর্মি ঘেরিয়া জঙ্ঘা,
বক্ষে তুলিছে মুক্তার হার—পঞ্চসিন্ধু যমুনা গঙ্গা।
কখন মা তুমি ভীষণ দীপ্ত তপ্ত মরুর উষর দৃশ্যে ;
হাসিয়া কখন শ্যামল শস্যে, ছড়ায়ে পড়িছ নিখিল বিশ্বে।

উপরে, পবন প্রবল স্বননে শূন্যে গরজি অবিশ্রান্ত,
লুটায়ে পড়িছে পিক-কলরবে, চুম্বি তোমার চরণ-প্রান্ত,
উপরে, জলদ হানিয়া বজ্র, করিয়া প্রলয়-সলিল-বৃষ্টি—
চরণে তোমার, কুঞ্জকানন কুসুমগন্ধ করিছে সৃষ্টি !

জননি, তোমার বক্ষে শান্তি, কণ্ঠে তোমার অভয়-উক্তি,
হস্তে তোমার বিতর অন্ন, চরণে তোমার বিতর মুক্তি ;
জননি ! তোমার সন্তান তরে কত না বেদনা কত না হর্ষ ;
জগৎপালিনি ! জগত্তারিণি ! জগজ্জননি ! ভারতবর্ষ !

ধন্য হইল ধরণী তোমার চরণ-কমল করিয়া স্পর্শ ;
গাইল, "জয় মা জগন্মোহিনি ! জগজ্জননি ! ভারতবর্ষ !"

ইমন্—একতালা।

তুমি ত মা সেই তুমি ত মা সেই চির-গরীয়সী ধন্যা অয়ি মা !
আমরা শুধুই হয়েছি মা-হীন, হারায়েছি সব বিভব, গরিমা ;
তুমি ত মা আছ তেমতি উচ্চ, আমরা শুধুই হয়েছি তুচ্ছ,
তোমারি অঙ্কে লভিয়া জনম, জানি না কি পাপে এ তাপ সহি মা
এখনো তোমার গগন সুনীল, উজল তপন তারকা চন্দ্রে,
এখনো তোমার চরণে ফেনিল, জলধি গরজে জলদ-মন্দ্রে ;
এখনো ভেদি হিমাদ্রি-জঙ্ঘা, উছলি পড়িছে যমুনা গঙ্গা,
ঢালিয়া শতধা পীযূষ পুণ্য, তোমার ক্ষেত্রে যাইছে বহি মা !
তুমি ত মা সেই সুজলা সুফলা, এখনও হরষে ভাসায় নেত্রে,
পুষ্প তোমার নিবিড় কুঞ্জে, শস্য তোমার শ্যামল ক্ষেত্রে ;
তোমার বিভব পূর্ণ বিশ্ব, আমরা দুঃখী আমরা নিঃস্ব,
তুমি কি করিবে তুমি ত মা সেই মহিমা-গরিমা-পুণ্যময়ী মা !

ইমন্ কল্যাণ—একতালা।

আজি গো তোমার চরণে, জননি ! আনিয়া অর্ঘ্য করি মা দান ;
ভক্তি-অশ্রু-সলিল-সিক্ত শতেক ভক্ত দীনের গান !
মন্দির রচি মা তোমার লাগি, পয়সা কুড়ায়ে পথে পথে মাগি,
তোমারে পূজিতে মিলেছি জননি, স্নেহের সরিতে করিয়া স্নান !

জান কি জননি জান কি কত যে আমাদের এই কঠোর ব্রত !
হায় মা ! যাহারা তোমার ভক্ত, নিঃস্ব কি গো মা তারাই যত !

তবু সে লজ্জা তবু সে দৈন্য, সহেছি মা সুখে তোমারি জন্য,
তাই দু'হস্তে তুলিয়া মস্তে ধরেছি যেন সে মহৎ মান,

নয়নে বহেছে নয়নের ধারা জলেছে জঠরে যখন ক্ষুধা,
মিটায়েছি সেই জঠর-জ্বালায় পিইয়া তোমার বচন-সুধা,
মরুভূমে সম যখন তৃষায়, আমাদের মা গো ছাতি ফেটে যায়,
মিটায়েছি মা গো সকল পিপাসা তোমার হাসিটি করিয়া পান।

পেয়েছি যা কিছু কুড়ায়ে তাহাই তোমার কাছে মা এসেছি ছুটি,
বাসনা, তাহাই গুছায়ে যতনে সাজাব তোমার চরণ দুটি।
চাহি না ক কিছু, তুমি মা আমার,—এই জানি শুধু নাহি জানি আর,
তুমি গো জননি হৃদয় আমার, তুমি গো জননি আমার প্রাণ!

জননি বঙ্গভাষা, এ জীবনে চাহি না অর্থ চাহি না মান,
যদি তুমি দাও তোমার ও দুটি অমল-কমল-চরণে স্থান।

একতালা

জাগো জাগো পুরনারী।
জিনিয়া সমর আসিছে অমর—
বীরকুল তোমারি!
যদি, এসেছিল তারা করিতে ধ্বংস
মেবার চন্দ্র সূর্যবংশ;
গেছে তারা শুধু রঞ্জিত করি
মেবারের তরবারি।

তারা যবনদর্প করিয়া খর্ব,
দীপ্ত করিয়া মেবার-গর্ব,
এসেছে মেবার-ললাট হইতে
ঘন মেঘ অপসারি।
আজি মেবারের মহামহিম অঙ্ক,
কর বিঘোষিত, বাজাও শঙ্খ,
বরিষ পুষ্প সৌধমঞ্চে—
দাঁড়াইয়া সারি সারি
আরো, যারা প'ড়ে আছে সমরক্ষেত্রে,
তাদের জন্য ভিজাও নেত্রে—
তাদের জন্য দাও গো—দুইটি
বিন্দু অশ্রুবারি।

মেবার

মেবার পাহাড় মেবার পাহাড়—যুঝেছিল যেথা প্রতাপবীর,
বিরাট দৈন্য দুঃখে, তাহার শৃঙ্গের সম অটল স্থির।
জ্বালিল সেথানে যেই দাবাগ্নি সে রূপবহ্নি পদ্মিনীর,
ঝাঁপিয়া পড়িল সে মহা আহবে যবন সৈন্য, ক্ষত্রবীর।

মেবার পাহাড় মেবার পাহাড়—রঞ্জিত করি' কাগার তীর,
দেশের জন্য ঢালিল রক্ত অযুত যাহার ভক্তবীর।
চিতোর দুর্গ হইতে খেদায়ে ম্লেচ্ছ রাজায় গজনীর,
হরিয়া আনিল কন্যা তাহার বিজয়-গর্বে বাপ্পা বীর।

মেবার পাহাড় মেবার পাহাড়—গলিয়া পড়িছে হইয়া ক্ষীর ;
সবার—সবার হইতে মধুর যাহার শস্য যাহার নীর।
যাহার কুঞ্জে বিহগ গাইছে গুঞ্জরি' স্তব যাহার শ্রীর;
যাহার কাননে বহিয়া যাইছে সুরভি স্নিগ্ধ পবন ধীর।

মেবার পাহাড় মেবার পাহাড়—ধূম্র যাহার তুঙ্গ শির ;
স্বর্গ হইতে জ্যোৎস্না নামিয়া ভাসায় যাহার কাননতীর।
মাধুরী বন্য কুসুমে জাগিয়া ঘুমায় অঙ্গে রমণী শ্রীর ;
শৌর্যে স্নেহে ও শুভ্রচরিত্রে কে সম মেবার-সুন্দরীর।

মেবার পাহাড়—উড়িছে যাহার রক্তপতাকা উচ্চশির—
তুচ্ছ করিয়া ম্লেচ্ছদর্প দীর্ঘ সপ্ত শতাব্দীর।

পরাজয়

১

ভেঙে গেছে মোর স্বপ্নের ঘোর, ছিঁড়ে গেছে মোর বীণার তার।
এ মহা শ্মশানে ভগ্ন পরাণে আজি মা কি গান গাহিব আর !
মেবার পাহাড় হইতে তাহার নেমে গেছে এক গরিমা হায় !
ঘন মেঘরাশ, ঘেরিয়া আকাশ, হানিয়া তড়িৎ চলিয়া যায়।

গাহে নাকো আর কুঞ্জে তাহার পিকবর আজ হরষগান ;
ফোটে নাকো ফুল, আসে না আকুল ভ্রমর করিতে সে মধুপান ;
আর নাহি বয় শিহরি' মলয় ; আর নাহি হাসে আকাশে চাঁদ ;
মেবার নদীর ম্লান দুটি তীর, করে নাকো আর সে কলনাদ।

মেবারের বন বিষাদ মগন ; আঁধার বিজন নগর গ্রাম ;
পুরবাসী সব মলিন নীরব ; বিষাদ মগন সকল ধাম ;
নাহি করে আর খর তরবার, আস্ফালন সে মেবার বীর ;
নাহি আর হাসি, ম্লান রূপরাশি, ত্রস্ত মেবার সুন্দরীর ।

এ ঘন আঁধার ! কিবা আছে তার ! সান্ত্বনা আর কে করে দান,
চারণ কবির বিনা সে গভীর অতীত মেবার মহিমা-গান !
গেছে যদি সব সুখ কলরব, অতীতের বাণী বাঁচিয়া থাক্ ।
চারণের মুখে সান্ত্বনা সুখে শূন্য মেবারে ধ্বনিয়া যাক্ ।

মেবার পাহাড়—শিখরে তাহার রক্ত নিশান উড়ে না আর,
এ হীন সজ্জা—এ ঘোর লজ্জা—ঢেকে দে গভীর অন্ধকার !

ইমন্—একতালা ।

সেথা, গিয়াছেন তিনি সমরে, আনিতে জয়গৌরব জিনি ;
সেথা, গিয়াছেন তিনি মহা আহ্বানে—
মানের চরণে প্রাণ বলিদানে,
মথিতে অমর মরণসিন্ধু, আজি গিয়াছেন তিনি ।

সেথা, গিয়াছেন তিনি করিতে রক্ষা শত্রুর নিমন্ত্রণে ;
সেথা, বর্মে বর্মে কোলাকুলি হয়,
খড়্গে খড়্গে ভীম পরিচয়,
ভ্রূকুটির সহ গর্জ্জন মিশে, রক্ত রক্ত সনে ।

সেথা, নাহি অনুনয়, নাহি পলায়ন—সে ভীম সমর মাঝে ;
সেথা, রুধিররক্ত অসিত অঙ্গে,
মৃত্যু নৃত্য করিছে রঙ্গে,
ভীরু আর্তনাদের সঙ্গে বিজয়-বাদ্য বাজে ।

সেথা, গিয়াছেন তিনি সে মহা আহবে জুড়াইতে সব জ্বালা ;
হেথা, হয়ত ফিরিতে জিনিয়া সমর,
হয়ত মরিয়া হইতে অমর,
সে মহিমা ক্রোড়ে ধরিয়া হাসিয়া তুমিও মরিবে বালা !

সধবা, অথবা বিধবা, তোমার রহিবে উচ্চ শির ;—
উঠ বীরজায়া, বাঁধো কুন্তল, মুছ এ অশ্রুনীর ।

মিশ্র কেদারা—একতালা ।

ধনধান্য পুষ্পভরা আমাদের এই বসুন্ধরা,
তাহার মাঝে আছে দেশ এক—সকল দেশের সেরা ;—
ও সে, স্বপ্ন দিয়ে তৈরি সে দেশ স্মৃতি দিয়ে ঘেরা ;

চন্দ্র সূর্য গ্রহ তারা, কোথায় উজল এমন ধারা !
কোথায় এমন খেলে তড়িৎ, এমন কালো মেঘে !
তার পাখীর ডাকে ঘুমিয়ে উঠি, পাখীর ডাকে জেগে ;

এত স্নিগ্ধ নদী কাহার, কোথায় এমন ধূম্র পাহাড় !
কোথায় এমন হরিৎক্ষেত্র আকাশতলে মিশে !
এমন ধানের উপর ঢেউ খেলে যায় বাতাস কাহার দেশে

পুষ্পে পুষ্পে ভরা শাখী ; কুঞ্জে কুঞ্জে গাহে পাখি ;
গুঞ্জরিয়া আসে অলি পুঞ্জে পুঞ্জে ধেয়ে—
তারা, ফুলের উপর ঘুমিয়ে পড়ে ফুলের মধু খেয়ে ;

ভা'য়ের মায়ের এত স্নেহ কোথায় গেলে পাবে কেহ !
—ওমা তোমার চরণ দুটি বক্ষে আমার ধরি,
আমার এই দেশেতে জন্ম—যেন এই দেশেতে মরি—

এমন দেশটি কোথায় খুঁজে পাবে নাক তুমি,
সকল দেশের রাণী সে যে—আমার জন্মভূমি ।

(লঘুগুরু ছন্দে)

ধাও ধাও সমরক্ষেত্রে—গাও উচ্চে রণজয়গাথা !
রক্ষা করিতে পীড়িত ধর্মে—শুন ঐ ডাকে ভারতমাতা !
কে বল' করিবে প্রাণে মায়া—
যখন বিপন্না জননী জায়া ?
সাজ' সাজ' সকলে রণসাজে :
শুন ঘন ঘন রণভেরী বাজে !
চল' সমরে—দিব জীবন ঢালি' :
জয় মা ভারত, জয় মা কালী !

সাজে শয়ন কি হীন বিলাসে—শত্রুবিদগ্ধ যখন পুরপল্লী ?
অরাতি-চরণ-বিচিহ্নিত বক্ষে সাজে প্রেয়সীর ভুজবল্লী ?
কোষনিবদ্ধ রবে তরবারি—
যখন বিলাঞ্ছিত ভারতনারী !
সাজ' সাজ'......কালী !

সমরে নাহি ফিরাইব পৃষ্ঠে, শত্রুকরে কভু হব না বন্দী ।
তরি না থাকে যাই অদৃষ্টে—অধর্ম সঙ্গে করি না সন্ধি ।
রব' না হব না দস্যুর ভৃত্য
সম্মুখ-সমরে জয় বা মৃত্যু !
সাজ' সাজ'……কালী !

ধাও ধাও সমরক্ষেত্রে—শত্রুসৈন্যদল করিব বিভিন্ন ;
পুণ্য সনাতন আর্যাবর্তে রাখিব না রিপুদলপদচিহ্ন ।
অরাতি-রক্তে করিব স্নান,
করিব বিরঞ্জিত হিন্দুস্থান !
সাজ' সাজ'……কালী !

গান

কিসের শোক করিস্ ভাই—আবার তোরা মানুষ হ' ।
গিয়েছে দেশ দুঃখ নাই,—আবার তোরা মানুষ হ' ॥
পরের 'পরে কেন এ রোষ, নিজেরাই যদি শত্রু হ'স্ ?
তোদের এ যে নিজেরই দোষ—আবার তোরা মানুষ হ' ।

ঘুচাতে চাস্ যদি রে এই হতাশাময় বর্তমান ;
বিশ্বময় জাগায়ে তোল্ ভায়ের প্রতি ভায়ের টান ;
ভুলিয়ে যা রে আত্মপর, পরকে নিয়ে আপন কর্ ;
বিশ্ব তোর নিজের ঘর—আবার তোরা মানুষ হ' ।

শত্রু হয় হোক্ না, যদি সেথায় পাস্ মহৎ প্রাণ,
তাহারে ভালবাসিতে শেখ্, তাহারে কর্ হৃদয় দান ।
মিত্র হোক্—ভণ্ড যে—তাহারে দূর করিয়া দে ;
সবার বাড়া শত্রু সে,—আবার তোরা মানুষ হ' ।

জগত জুড়ে দুইটি সেনা পরস্পরে রাঙায় চোক্ ;
পুণ্য সেনা নিজের কর্, পাপের সেনা শত্রুর হোক্ ;
ধর্ম যথা সেদিকে থাক্,—ঈশ্বরেরে মাথায় রাখ্ ;
স্বজন দেশ ডুবিয়ে যাক্—আবার তোরা মানুষ হ' ॥

প্রেম

জয়জয়ন্তী—একতালা।

(মোর) হৃদয়ের আলো তুই রে সতত থাকিস্ হৃদয়ে ভাসি রে ;
(মোর) বিরাগে বাসনা, ব্যথায় বিস্মৃতি, অশ্রুতে উজল হাসি রে ;
লোকালয় বন, বিহনে লো তোর ;
গৃহে আমি রে উদাসী ;
তোরে সাথে লয়ে সংসার ছাড়িয়ে
বনে আমি গৃহবাসী রে।

গরিমা আমার, গৃহিণী আমার, আমার কুটীর-রাণী,
প্রণয়ের খনি, প্রীতির নির্ঝর, আশার প্রতিমাখানি ;
মলয়ের মত কি মধু ঢালিয়ে
দিস্ রে পরাণে আসি ;
কোথা চলে যাস্ উদাস করিয়ে
কাড়ি কি রতনরাশি রে।

কীর্তন—একতালা।

চাহি অতৃপ্ত নয়নে তোর মুখপানে,
ফিরিতে চাহে না আঁখি ;
আমি আপনা হারাই সব ভুলে যাই,
অবাক্ হইয়ে থাকি।
ভুলি দুখ পরিতাপ যাতনা, যখন
রহি লো তোমারি কাছে ;
ওই মুখপানে চাই ; ও মুখকমলে
জানি না কি মধু আছে।

আমি প্রভাতের ফুলে, সাঁঝের মেঘেতে,
হেরি তোর রূপরাশি ;
আমি চাঁদের আলোকে, তারার হাসিতে
নিরখি তোমার হাসি ;—

সখি তোমারি কারণে দুখময় ধরা
সুখভরা সম দেখি ;
আমি আপনা হারাই, সব ভুলে যাই,
তোমারে হৃদয়ে রাখি।

আশাবরী—চৌতাল।

কি দিয়ে সাজাব মধুর মুরতি, কি সাজ মিলিবে উহারি সাথ রে !
কঠিন হীরা-হেম-রজতে সাজায়ে পূরে না মনের সাধ রে।
তবে, আয় দি' প্রভাত-কনক-কিরণে অতুল, উজল মুকুট গড়ায়ে,
স্নিগ্ধ বিজলী ঘন হ'তে পাড়ি', গাঁথি' হার গলে দি' পরায়ে।

জলধিনীলে অঞ্জন করি' দি' ও আঁখি-অপাঙ্গে বুলায়ে,
কুড়ায়ে তারা-হীরা-ভাতি চারু কর্ণে তুল দি' তুলায়ে ;
পূর্ণচন্দ্ররেখারচিত, কোমল করে বলয় রাজিবে ;
বিহগ-কুজন-গঠিত নূপুর চুম্বি' যুগল চরণে বাজিবে।

মেখলা—দিব ভানুলেখা আনি' নবঘন স্নেহে সিনায়ে ;
দিব রে বসন—সান্ধ্য মেঘে রঞ্জিত রবির ঘুমটি বিনায়ে ;
চরণের তলে দিব অলক্তক—কবির গীত ভকতি রাশি ;
দিব ও অধরে অধররাগ—কিশোর প্রেমস্বপন হাসি।

সিন্ধু—একতালা।

কেন দুরাশ ছলনে ভুলি' হইনু হৃদয়হারা,
কেন মানব হইয়ে চাহি পিয়িতে অমিয়ধারা ?
অবোধ কুমুদ কাঁদে, কেন লো চুমিতে চাঁদে ?
যখন অযুত তারা শশিপ্রেমে মাতোয়ারা।
সমানে সমানে হয়, প্রণয়েরি বিনিময়,
মেঘ কি বিজলী ছাড়ি' ধরে হৃদে দীপজ্বালা ?
রাজা কে কিসের আশে, ভিখারী-দুয়ারে আসে ?
জোনাকীর প্রেমে কভু নেমে কি আসে লো তারা ?

কীর্তন

ছিল বসি সে কুসুমকাননে ;
আর অমল অরুণ উজল আভা ভাসিতেছিল সে আননে।
ছিল, এলায়ে সে কেশরাশি (ছায়াসম হে,)

ছিল, ললাটে দিব্য আলোক, শান্তি অতুল গরিমা ভাসি ;
তার কপোলে সরম, নয়নে প্রণয়,
অধরে মধুর হাসি ।

সেথা ছিল না বিষাদভাষা (অশ্রুভরা গো,)
সেথা বাঁধা ছিল শুধু সুখের স্মৃতি—হাসি, হরষ, আশা ;
সেথা, ঘুমায়ে ছিল রে পুণ্য, প্রীতি;
প্রাণভরা ভালবাসা ।—

তার সরল সুঠাম দেহ (প্রভাময় গো, প্রাণভরা গো) ;
যেন যা কিছু কোমল, ললিত, তা দিয়ে রচিয়াছে তাহে কেহ ;
পরে সৃজিল সেথায় স্বপন সঙ্গীত,
সোহাগ, সরম, স্নেহ ।

যেন পাইল রে ঊষা প্রাণ (আলোময়ী রে,)
যেন জীবন্ত কুসুম, কনকভাতি সুমিলিত সমতান ;
যেন সজীব—সুরভি, মধুর মলয়,
কোকিলকূজিত গান ।

শুধু চাহিল সে মোর পানে (একবার গো,)
যেন বাজিল বীণা, মুরজ, মুরলী, অমনি অধীর প্রাণে ;
সে—গেল কি দিয়া, কি নিয়া বাঁধি মোর হিয়া
কি মন্ত্রগুণে, কে জানে ।

মূলতানী—একতালা।

তোর, কি মোহ কুহক এ খেলাস্ পলকে নয়নে বিজলি হাসি ;
রাখিস্ কোন্ মায়াবলে, অধরযুগলে লুকায়ে অমিয়রাশি।
তুই দিস্ মায়াময়ি, বিরাগিণী রহি
দিনকে করিয়ে রাতি ;
পুন হাসিরাশি দিয়ে, আঁধার দলিয়ে,
আনিস্ অরুণভাতি।

তুই এ হৃদয়ে জাগি, র'স্ দূরে থাকি ; নিকটে রহিয়া দূরে ;
সদা খেলিস্ চাতুরীময় লুকাচুরী হৃদয়ের অন্তঃপুরে।
তুই করিস্ দিবায় গতিহীন প্রায়,
যখন বিরহী আমি ;
তোর মিলন হরষে, করিস্ বরষে
পলসম দ্রুতগামী।

তোর করস্পর্শে চিনি মলয় কাহিনী, ভাষায় কূজনরাশি ;
তোর নিঃশ্বাসের কাছে কত শুয়ে আছে মন্দারসুরভি আসি।
হেরি বসিয়ে একেলা, তোর মায়াখেলা ;
অবুঝ সমান সব এ ;
মানি প্রেমের পাশায়, নিতি তোর পায়
সুমধুর পরাভবে।

ঝিঁঝিট—খং।

আজি তোমার কাছে ভাসিয়া যায় অন্তর আমার,
আজি সহসা ঝরিল চোখে কেন বারিধার ?

স্মৃতি জোয়ারে দুকূল ছেয়ে,
দশ বরষ উজান বেয়ে,
চলেছে প্রাণ তোমারই কাছে মানে না বাধা আর।
আজি আমার কাছে বর্তমান ভেঙ্গে ও ভেসে যায়,
আজি আমার কাছে অতীত হয় নূতন পুনরায়;
আজি আমার নয়ন পাশে,
এ কি আঁধার ঘেরিয়া আসে,
পাষাণ ভার চাপিয়া ধরে হৃদয়ে বার বার।

ভৈরবী—কাওয়ালী।

এ জীবনে পূরিল না সাধ ভালবাসি'—
এ ক্ষুদ্র হৃদয় হায়! ধরে না ধরে না তায়—
আকুল অসীম প্রেমরাশি।
তোমার হৃদয়খানি আমার হৃদয়ে আনি',
রাখি না কেনই যত কাছে;
যুগল হৃদয়-মাঝে, কি যেন বিরহ বাজে,
কি যেন অভাবই রহিয়াছে?
এ ক্ষুদ্র জীবন মোর, এ ক্ষুদ্র ভুবন মোর,
হেথা কি দিব এ ভালবাসা।
যত ভালবাসি তাই, আরও বাসিতে চাই,
দিয়া প্রেম মিটে নাক আশা।
হউক অসীম স্থান, হউক অমর প্রাণ,
ঘুচে যাক্ সব অবরোধ,
তখন মিটাব আশা, দিব ঢালি' ভালবাসা,
জন্ম-ঋণ করি পরিশোধ।

ইমন্ কল্যাণ—তেওরা।

যাও হে সুখ পাও যেখানে সেই ঠাঁই, আমার এ দুখ আমি দিতে ত পারি না;
(তুমি) রহিলে সুখে নাথ পূরিবে সব সাধ, নিরাশা কভু যদি ললাট ঘিরে—
তখনই এই বুকে আসিও ফিরে।

হয়ত ধন দিবে সে সুখ আনি', দিতে যা পারে নি এ হৃদয়খানি,
তাহাতে সুখী হও আমারে ভুলে যাও, নিরাশ হও যদি ধনে কি সুখে—
তখনই ফিরে এস আমার বুকে।

অথবা ধন চেয়ে তুমি বা যশ চাও তাহাতে সুখী হও ফিরিয়া চেয়ো নাও,
(যদি) না পূরে অভিলাষ, অথবা মিটে আশ, পরি' সে গরিমার মুকুট শিরে—
যদি বা প্রাণ চায় এস হে ফিরে।

হয়ত দিতে পারে অপর কেহ, আমার চেয়ে যদি মধুর স্নেহ,
মিটিলে সব সাধ, ভাঙ্গিলে অবসাদ প্রাণের নিরাশায় গভীর দুখে—
যদি বা প্রাণ চায় এস এ বুকে।

এ হৃদি যাও চলি, চরণে দলি' তায়, অথবা তুলে ধর আমার বলি' তায়,
রবে সে চিরদিন, তোমারি পরাধীন, যখনই মনে পড়ে অভাগিনীরে—
তখনি এই বুকে আসিও ফিরে।

মিশ্র ঝিঁঝিট—আড়খেম্‌টা।

হেসে নেও—এ দু'দিন বই ত নয়;
কার কি জানি কখন সন্ধ্যে হয়।
ফোটে ফুল, গন্ধ ছোটে তায়,
তুলে নেও—এখনই সে ঝ'রে যাবে হায়;

গা ঢেলে দাও মধুর মলয় বায়,
এলে মলয় পবন ক'দিন রয়।
আসে যায় আসে ফের জোয়ার,
যৌবন আসে যায়, সে কিন্তু ফেরে নাক আর;
পিয়ে নেও যত মধু তার।
—আহা যৌবন বড় মধুময়।
আছে ত জীবন-ভরা দুখ,
আসে তায় প্রেমের স্বপন—দু'দণ্ডেরই সুখ;
হারায়ো না হেলায় সে টুক,—
ভালবাস ভুলে ভাবনা ভয়।

কীর্তন—একতালা।

ভালবাসি যারে সে বাসিলে মোরে আমি চিরদিন তারি;
চরণে ধূলি ধুয়ে দিতে তার দিব নয়নের বারি।
(তারে) দেবতা করিয়া হৃদয়ে রাখিব, রব তারি অনুরাগী;
মরুভূমে জলে কাননে অনলে পশিব তাহার লাগি।
ভালবাসি যারে সে না বাসে যদি তাহে অভিমান নাই রে;
সুখে সে থাকুক চিরদিন তবু হবে দু'জনার ঠাঁই রে;
নিরবধি কাল—হয়ত কখনও ভুলিব সে ভালবাসা;
বিপুল জগৎ হয়ত কোথাও মিটিবে আমার আশা।

মিশ্র ভৈরবী—ঢিমা তেতালা।

সে মুখ কেন অহরহ মনে পড়ে, পড়ে মনে।
নিখিল ছাড়িয়ে কেন, কেন চাহি সেই জনে?
এ নিখিল স্বর মাঝে, তারি স্বর কানে বাজে,
ভাসে সেই মুখ সদা স্বপনে কি জাগরণে।

বেহাগ খাম্বাজ—মধ্যমান।

তুমি, বাঁধিয়া কি দিয়ে রেখেছ হৃদি এ,
(আমি) পারি না যে যেতে ছাড়ায়ে ;
এ যে বিচিত্র নিগূঢ় নিগড় মধুর—
(কি) প্রিয় বাঞ্ছিত কারা এ।
এ যে, চলে যেতে বাধে চরণে,
এ যে, বিরহে বাজে স্মরণে,
কোথা, যায় মিলিয়া সে মিলনের হাসে,
চুম্বনের পাশে হারায়ে।

কীর্তন।

সে কে ? এ জগতে কেহ আছে, অতি উচ্চ মোর কাছে
যার প্রতি তুচ্ছ অভিলাষ ;
সে কে ? অধীন হইয়ে, তবু রহে যে আমার প্রভু ;
প্রভু হয়ে আমি যার দাস ;

সে কে ? দূর হ'তে দূরাত্মীয়, প্রিয়তম হ'তে প্রিয়,
আপন হইতে যে আপন !
সে কে ? লতা হ'তে ক্ষীণ তারে বাঁধে দৃঢ় যে আমারে,
ছাড়াতে পারি না আজীবন ;

সে কে ? দুর্বলতা যার বল ; মর্মভেদি অশ্রুজল ;
প্রেম-উচ্চারিত রোষ যার ;
সে কে ? যার পরিতোষ, মম সফল জনম সম ;
সুখ—সিদ্ধি সব সাধনার ;

সে কে ? হ'লেও কঠিনচিত শিশু সম স্নেহভীত
যার কাছে পড়ি গিয়া নুয়ে,
সে কে ? বিনা দোষে ক্ষমা চাই যার ; অপমান নাই
শত বার পা দুখানি ছুঁয়ে ;

সে কে ? মধুর দাসত্ব যার, লীলাময় কারাগার ;
শৃঙ্খল নূপুর হ'য়ে বাজে ;
সে কে ? হৃদয় খুঁজিতে গিয়া, নিজে যাই হারাইয়া
যার হৃদি প্রহেলিকামাঝে।

মিশ্র ইমন্—কাওয়ালী।

যদি এসেছো এসেছো এসেছো বঁধু হে—
দয়া করি' কুটীরে আমারি ;
আমি কি দিয়ে তুষিব ভূষিব তোমারে
—বুঝিতে না পারি।
আমি যাব কি ও হৃদি' পর ছুটিয়া ?
আমি পড়িব কি পদতলে লুটিয়া ?
হাসিব, সাধিব, ঢালিব চরণে
—নয়নের বারি ?
যদি পেয়েছি তোমায় কুটীরে আমার, আশার অতীত গণি ;
আজি আঁধারে পথের ধূলার মাঝারে, কুড়ায়ে পেয়েছি মণি ;
যদি এসেছ দিব হৃদয়াসন পাতি' ;
দিব গলে নিতি নব প্রেমহার গাঁথি' ;
রহিব পড়িয়া দিবস রাতি হে
—চরণে তোমারি।

ছায়ানট—ঝাঁপতাল।

হৃদয় আমার গোপন করে', আর ত লো সই রৈতে নারি।
ভরা গাঙে ঝড় উঠেছে, থর থর থর কাঁপ্‌ছে বারি।
ঢেউয়ে ঢেউয়ে নৃত্য তুলে, ছাপিয়ে উঠে কূলে কূলে,
বাঁধ দিয়ে এ মত্ত তুফান আর কি ধরে' রাখ্‌তে পারি।
মানের মানা শুন্‌বো না আর মান অভিমান আর কি সাজে,
মানের তরী ভাসিয়ে দিয়ে ঝাঁপ দেবো এই তুফান মাঝে;
যাবো তার তরঙ্গে চড়ি', দেখ্‌বো গিয়ে কোথায় পড়ি;
জীবন যখন করেছি পণ সরমের ধার আর কি ধারি।

ভৈরবী—ঢিমা তেতালা।

এসো এসো বঁধু, বাঁধি বাহু-ডোরে, এসো বুকে করে' রাখি।
বুকে ধরে' মোর আধ ঘুমঘোরে সুখে ভোর হ'য়ে থাকি।
মুছে যাক্ চোখে এ নিখিল সব,
প্রাণে প্রাণে আজ করি অনুভব,
মিলিত হৃদির মৃদু গীতিরব—আধ নিমীলিত আঁখি।
বহুক্ বাহিরে পবন বেগে,
করুক্ গর্জন অশনি মেঘে,
রবি শশী তারা হ'য়ে যাক্ হারা, আঁধারে ফেলুক্ ঢাকি'।
আমি তোমার বঁধু, তুমি আমার বঁধু, এই শুধু নিয়ে থাকি;
বিশ্ব হ'তে সব লুপ্ত হ'য়ে যাক্—আর যা রহিল্ বাকি।

নটমল্লার—যৎ

মলয় আসিয়া ক'য়ে গেছে কানে, প্রিয়তম তুমি আসিবে ।
মম তৃষিত অন্তরব্যথা সযতনে তুমি নাশিবে ।
রবি শশী তারা সুনীল আকাশ,
সকলে দিয়েছে তোমার আভাস,
গোপনে হৃদয়ে ক'রেছে প্রকাশ, তুমি এসে ভালবাসিবে ॥
মম মর্ম্মমুকুরে দূর হ'তে সখা পড়েছে তোমার ছায়া,
সেথা অন্তরলোকে প্রেমপুলকে গড়েছি স্বপন কায়া ।
আমার সকল চিত্ত প্রণয়ে বিকশি,
তোমারই লাগিয়া উঠেছে উছসি,
কবে তুমি আসি অধর পরশি,
মুখপানে চেয়ে হাসিবে ।

সিন্ধুড়া—রূপক ।

আইল ঋতুরাজ সজনি, জ্যোৎস্নাময় মধুর রজনী,
বিপিনে কলতান মুরলী উঠিল মধুর বাজি' ।
মৃদুমন্দসুগন্ধপবনশিহরিত তব কুঞ্জভবন,
কুহু কুহু কুহু ললিততানমুখরিত বনরাজি ।
পর সখি পর নীলাম্বর, পর সখি ফুলমালা ;
চল সখি চল কুঞ্জে চল, বিরহবিধুরা বালা ।
করিগে চল কুসুম চয়ন, রচিগে চল পুষ্পশয়ন,
ফিরিবে তব নাথ সজনি, হৃদয়ে তব আজি !

খাম্বাজ—একতালা।

আয় রে বসন্ত ও তোর কিরণমাখা পাখা তুলে।
নিয়ে আয় তোর নূতন গানে, নূতন পাতায়, নূতন ফুলে
শুনি, পড়ে প্রেমফাঁদে, তারা সব হাসে কাঁদে,
আমি শুধু কুড়োই হাসি সুখ-নদীর উপকূলে।
জানি না ত প্রেম কি সে, চাহি না সে মধুবিষে ;
আমি শুধু বেড়িয়ে বেড়াই, নেচে গেয়ে প্রাণ খুলে।
নিয়ে আয় তোর কুসুমরাশি,
তারার কিরণ, চাঁদের হাসি ;
মলয়ের ঢেউ নিয়ে আয়, উড়িয়ে দে এই এলোচুলে।

ইমন্ ভূপালি—একতালা।

আমি সারা সকালটি বসে' বসে' এই সাধের মালাটি গেঁথেছি।
আমি, পরাব বলিয়ে তোমারি গলায় মালাটি আমার গেঁথেছি।
আমি, সারা সকালটি করি নাই কিছু, করি নাই কিছু বঁধু আর ;
শুধু বকুলের তলে বসিয়ে বিরলে মালাটি আমার গেঁথেছি।
তখন গাহিতেছিল সে তরুশাখা 'পরে স্থললিত স্বরে পাপিয়া ;
তখন দুলিতেছিল সে তরুশাখা ধীরে, প্রভাত-সমীরে কাঁপিয়া ;
তখন প্রভাতের হাসি, পড়েছিল আসি কুসুমকুঞ্জভবনে ;
আমি তারি মাঝখানে, বসিয়া বিজনে মালাটি আমার গেঁথেছি।
বঁধু মালাটি আমার গাঁথা নহে শুধু বকুল কুসুম কুড়ায়ে ;
আছে প্রভাতের প্রীতি সমীরণ গীতি, কুসুমে কুসুমে জড়ায়ে ;
আছে, সবার উপরে মাখা তায় বঁধু তব মধুময় হাসি গো ;
ধর, গলে ফুলহার, মালাটি তোমার, তোমারই কারণে গেঁথেছি।

কাওয়ালী।

আজি এসেছি—আজি এসেছি, এসেছি বঁধু হে,
নিয়ে এই হাসি, রূপ, গান।
আজি, আমার যা কিছু আছে, এনেছি তোমার কাছে,
তোমায় করিতে সব দান।
আজি তোমার চরণতলে রাখি এ কুসুমহার,
এ হার তোমার গলে দিই বঁধু উপহার,
সুধার আধার ভরি, তোমার অধরে ধরি, কর বঁধু কর তায় পান ;
আজি হৃদয়ের সব আশা, সব সুখ, ভালবাসা,
তোমাতে হউক অবসান।
ঐ ভেসে আসে কুসুমিত উপবন-সৌরভ,
ভেসে আসে উচ্ছলজলদলকলরব,
ভেসে আসে রাশি রাশি জ্যোৎস্নার মৃদু হাসি,
ভেসে আসে পাপিয়ার তান ;
আজি, এমন চাঁদের আলো—মরি যদি সেও ভাল,
সে মরণ স্বরগ সমান।
আজি, তোমার চরণতলে লুটায়ে পড়িতে চাই,
তোমার জীবনতলে ডুবিয়ে মরিতে চাই,
তোমার নয়নতলে শয়ন লভিব ব'লে, আসিয়াছি তোমার নিধান ;
আজি সব ভাষা সব বাক্,—নীরব হইয়া যাক্,
প্রাণে শুধু মিশে থাক্—প্রাণ।

বাগেশ্রী কানাড়া—আড়া।

এ জগতে আমি বড়ই একা, আমি বড়ই দীনা।
বিদেশিনী আমি হেথা, তোমা বৈ কারেও চিনি না।
দীর্ঘ দিবা অবসানে, ক্লান্ত দেহে শ্রান্ত প্রাণে,
তোমার কাছে ধেয়ে আসি, কে আছে আর তোমা বিনা।
ল'য়ে শত প্রাণের ক্ষত তোমার কাছে ছুটে আসি,
তোমার বুকে রাখতে মাথা, তোমার মুখে দেখতে হাসি;
শুষ্ক ধরা, শূন্য ধরা, অসীম তাচ্ছিল্য ভরা,
তুমিও মুখ ফিরায়ো না, তুমিও কোরো না ঘৃণা।

কীর্তন—একতালা।

আর, কেন মিছে আশা, মিছে ভালবাসা, মিছে কেন তার ভাবনা।
সে যে, সাগরের মণি, আকাশের চাঁদ—আমি ত তাহারে পাব না।
আজি, তবু তারে স্মরি', সতত শিহরি কেন আমি হতভাগিনী;
কেন, এ প্রাণের মাঝে নিশিদিন বাজে, সেই এক মধুরাগিণী।
শুনি,—উঠে সেই গান নীরব মহান্, যায় সে আকাশ ছাপিয়া;
দেখি, শুনি' সেই ধ্বনি, শিহরে ধরণী, তারাকুল উঠে কাঁপিয়া;
আমি, চেয়ে থাকি—স্থির নীরব গভীর নির্মল নীল নিশীথে;
কেন—রহি' এ মহীতে সসীম হইতে চাহি সে অসীমে মিশিতে।
আমি পারি না ত হায়, ধূলায় গড়ায় তপ্ত অশ্রুবারি গো;
তবে, কেন হেন যেচে, দুখ লই বেছে কেন না ভুলিতে পারি গো;
—না না, তবু সেই দুখ জাগিয়া থাকুক্ আমরণ মম স্মরণে;
আমি, লভেছি যদি এ বিরস জীবন, লভিব সরস মরণে।

ইমন্—একতালা।

যখন সঘন গগন গরজে, বরিষে করকাধারা ;
সভয়ে অবনী আবরে নয়ন, লুপ্ত চন্দ্রতারা ;
দীপ্ত করি' সে তিমির জাগে কাহার আননখানি—
আমার কুটীররাণী সে যে গো—আমার হৃদয়রাণী।
জ্যোৎস্নাহসিত নীল আকাশে যখন বিহগ গাহে ;
স্নিগ্ধ সমীরে শিহরি' ধরণী মুগ্ধনয়নে চাহে ;
তখন স্মরণে বাজে কাহার—মৃদুল মধুর বাণী—
আমার কুটীররাণী সে যে গো—আমার হৃদয়রাণী।
আঁধারে আলোকে, কাননে কুঞ্জে, নিখিল ভুবন মাঝে,
তাহারই হাসিটি ভাসে হৃদয়ে, তাহারই মুরলী বাজে ;
উজল করিয়া আছে দূরে সেই আমার কুটীরখানি—
আমার কুটীররাণী সে যে গো—আমার হৃদয়রাণী।
বহুদিন পরে হইব আবার আপন কুটীরবাসী,
দেখিব বিরহবিধুর অধরে মিলনমধুর হাসি,
শুনিব বিরহনীরব কণ্ঠে মিলনমুখর বাণী,—
আমার কুটীররাণী সে যে গো—আমার হৃদয়রাণী।

ছায়ানট্—ঢিমা তেতালা।

কেন এত সুন্দর শশধর ? (ও সে)—তারই মুখ-অনুকারী।
কেন এত সুবর্ণ শতদল ? (ও সে) তাহারই বর্ণ-হারী।
কেন এত সুললিত পিকসঙ্গীত ?—তারই কলবাণী করে ঝঙ্কৃত।
এত সুগন্ধ স্নিগ্ধ মলয় ?—পরশ বহিয়া তারই।
আকাশে ভুবনে ব্যাপ্ত শুধুই তাহারই রূপেরই আলো,
তারই পদযুগ ধরে হৃদে ব'লে ধরায়ে বেসেছি ভালো ;

জীবনের যত দুঃখ ও ত্রুটি, নিয়তির যত ছলনা ভ্রূকুটি
ও দুটি আঁখির কিরণেরই তবে সকলই ভুলিতে পারি।

ছায়ানট্—একতালা।

হৃদয় আমার গোপন ক'রে, আর ত লো সই রৈতে নারি।
ভরা গাঙে ঝড় উঠেছে, থর থর থর কাঁপ্‌ছে বারি।
ঢেউয়ে ঢেউয়ে নৃত্য তুলে, ছাপিয়ে উঠে কূলে কূলে,
বাঁধ দিয়ে এ মত্ত তুফান আর কি ধ'রে রাখ্‌তে পারি।
মানের মানা শুন্‌ব না আর মান অভিমান আর কি সাজে,
মানের তরী ভাসিয়ে দিয়ে ঝাঁপ দেবো এই তুফান মাঝে;
যাব তার তরঙ্গে চড়ি, দেখ্‌ব গিয়ে কোথায় পড়ি;
জীবন যখন করেছি পণ সরমের ধার আর কি ধারি।

বাহার—কাওয়ালী।
(লঘুগুরু ছন্দ)

এস প্রাণসখা এস প্রাণে,
মম দীর্ঘ বিরহ অবসানে।
কর, তৃষিত প্রাণ অভিষিক্ত, তব প্রেমসুধারসদানে।
বন আকুল বন-ফুলগন্ধে, বন মুখরিত মর্মর ছন্দে,
বহে শিহরি পবন মৃদুমন্দ গাহে আকুল কোকিল কুহু কুহু তানে।
এ কি জ্যোৎস্না-গর্বিত শর্বরী; এ কি পাণ্ডুর তারাপুঞ্জ;
এ কি সুন্দর নীরব মেদিনী; এ কি নীরব নিভৃত নিকুঞ্জ;
ব'সে আছি পাতি মম অঞ্চল, অতি শঙ্কিত কম্পিত চঞ্চল,
এস হে প্রিয় হে চিরবাঞ্ছিত!—মম প্রাণ অধীর
প্রবোধ না মানে।

ইমন্—একতালা।

আমি, চেয়ে থাকি দূর সান্ধ্য গগনে
—ধীরে দিবা হয় অবসান।
আমি, নিভৃতে নয়ন-নীরে করি অভিষিক্ত নৈশ-উপাধান।
উষা অনাদরে এসে ফিরে যায়,
লাগে এসে বায়ু কিরণের গায়,
তন্দ্রাজড়িত অলস শ্রবণে পশে প্রভাতের পিকগান।
আমি, জানি না কাহারে বলিতে আপন,
তারা এসে হেসে চ'লে যায় ;—
আমি, অপর কাহার জীবন যাপন
করি যেন এসে বসুধায়—
আমি, বেঁচে আছি—নাহি জানি কি কারণ,
—জীবন শুধুই জীবনধারণ :
আমি, চাপিয়া চক্ষে রাখি আঁখিবারি,
চাপিয়া বক্ষে অপমান !

ঝিঁঝিট খাম্বাজ—যৎ।

আমি র'ব চিরদিন তব পথ চাহি,
ফিরে দেখা পাই আর না পাই।
দূরে থাক কাছে থাক, মনে রাখ নাহি রাখ,
আর কিছু চাহি না ক, আর কোনও সাধ নাহি।
অবহেলা অপমান, বুক পেতে লব, প্রাণ !
ভালবেসেছিলে, জানি, মনে শুধু রবে তাই ;
আমি তবু তব লাগি, নিশি নিশি র'ব জাগি,
এমনই যুগ যুগ জনম জনম বাহি।

পূর্ণিমা

গগন ভূষণ তুমি জনগণ মনোহারী।
কোথা যাও নিশানাথ হে নীল নভোবিহারী।
হেসে হেসে, ভেসে ভেসে,
চলি' যাও কোন্ দেশে,
চারিধারে তারাহারে রহে ঘেরে সারি সারি।
হেলে দুলে, ঢলে ঢলে,
পড়িছ গগন তলে,—
কি মধুর মনোহর শশধর বলিহারি।

খাম্বাজ—ঝাঁপতাল।

কি বিষম মরুভূমি হোত জীবন, বৃথাই হোত ভবে আসা—
যদি না রৈত হেথা প্রাণের ভিতর ভুবনভরা ভালোবাসা!
প্রকৃতি, কুঞ্জে গাছে, লতায় পাতায় ছড়িয়ে আছে,
শুধু এক, নানা বর্ণে, নানা গন্ধে ফুটে আছে ভালোবাসা।
ও শুধু, চিন্তা করা, হিসাব করা, অঙ্ক কসা, টাকা গোণা
এ শুধু, চক্ষু মুদে হেলান দিয়ে বিভোর হ'য়ে বাঁশী শোনা।
ও শুধু, তর্ক করা, এ গলা জড়িয়ে ধরা,
এ শুধু, বুকে রাখা, চেয়ে থাকা—শুধু হাসা, শুধু হাসা।
ও শুধু, তুষ্ট করে, পুষ্ট করে—ক্ষুধায় শুধু খেতে পাওয়া
এ শুধু, মধু খাওয়া, মধু খাওয়া, চক্ষু মুদে মধু খাওয়া।
ও শুধু, ধূলায়, কাঁটায়, শুধু তাড়ায়, শুধু হাঁটায়;
এ শুধু, জ্যোৎস্নালোকে মৃদুল হাওয়ায় নৌকা ক'রে জলে ভাসা।

টোড়ী—একতালা।

এখনও তপন উঠেনি গগনে পূরব ভাগে ;
এখনও ধরণী চেয়ে আছে পথ তাহার লাগি'।
এখনও নীরব তিমির জড়িত নিবিড় কুঞ্জ,
এখনও ঘুমায় শাখায় শাখায় মধুপপুঞ্জ,
শুধু আছে চাহি' মেঘকুল, সাজি' ভূষিত অরুণকিরণ-রাগে।
ধীরে ধীরে ঐ উঠিল গগনে দিবসরাজ ;
ছড়ায়ে পড়িল মহিমার ছটা ভুবন মাঝ ;
অমনি উঠিল কাননে কাননে বিহগ ছন্দ,
অমনি ছুটিল কুঞ্জে কুঞ্জে কুসুম গন্ধ,
ঢুলিল চামর শীতল সমীর পরশে ভুবন উঠিল জাগি'।

মেঘমল্লার—জলদ্ কাওয়ালী।

ঘন ঘোর মেঘ আই', ঘেরি' গগন,
বহে শীকরস্নিগ্ধ'চ্ছুসিত পবন,
নামে গভীর মন্দ্রে, গুরু গুরু গরজন
ছুটি উন্মাদিনী ঝঞ্ঝা, এসে
বিশ্বতলে পড়ে—লুণ্ঠিত কেশে
—মুখে হা হা স্বন ?
পিঙ্গল দামিনী মুহুর্মুহু চমকে
ধাঁধি নয়ন—কড় কড় কড়কে
বজ্র সঘন।

গান

এ কি মধুর ছন্দ, মধুর গন্ধ, পবন মন্দ মন্থর—
এ কি মধুর মুঞ্জরিত নিকুঞ্জ পত্রপুঞ্জ মর্মর।
এ কি নিখিল বিশ্বহাসি,—
এ কি সুরভি, স্নিগ্ধশিশিরসিক্ত কুসুম রাশি রাশি—
এ কি শ্যাম হসিত নব বিকশিত ঘন কিশলয় পল্লব—
এ কি সরিৎ রঙ্গ, শত তরঙ্গ নৃত্যভঙ্গ নির্ঝর।
কভু কোকিল মৃদুগীতে—
উঠে জাগি শব্দ বিনিস্তব্ধ স্বপ্নময় নিশীথে—
উঠে বেণুগান মধুরতান করি বিলাপ কম্পিত—
ঘন অবিশ্রান্ত—বিমলকান্ত নীল শান্ত অম্বর।
এ কি কোটি মুগ্ধ তারা!
এ কি মধুর দৃশ্য—প্লাবি বিশ্ব চন্দ্রকিরণ-ধারা—
এ কি স্তিমিত নয়ন, শিথিল শয়ন, অলসবিভল শর্বরী—
শশী বাহুলগ্ন মুগ্ধ মগ্ন সুপ্ত স্বপ্ন সুন্দর।

ঝিঁঝিট—একতালা।

আমরা—মলয় বাতাসে ভেসে যাবো
শুধু কুসুমের মধু করিব পান;
ঘুমাবো কেতকী-সুবাস-শয়নে, চাঁদের কিরণে করিব স্নান।
কবিতা করিবে আমাকে বীজন, প্রেম করিবে—স্বপ্ন সৃজন,
স্বর্গের পরী হবে সহচরী, দেবতা করিবে হৃদয় দান।
সন্ধ্যার মেঘে করিব দুকূল, ইন্দ্রধনু চন্দ্রহারের;
তারায় করিব কর্ণের দুল, জড়াবো গায়েতে অন্ধকার;
বাষ্পের সনে আকাশে উঠিব, বৃষ্টির সনে ধরায় লুটিব,
সিন্ধুর সনে সাগরে ছুটিব, ঝঞ্ঝার সনে গাহিব গান।

মিশ্র সিন্ধু—একতালা।

যাচ্ছে ভেসে সাদা সাদা নীরদ সাঁঝের কিরণমাখা।
উড়্‌ছে যেন বিশ্বশোভায় শুভ্ররঙিন জয়-পতাকা।
আয় লো মোরা সঙ্গে ভেসে, চলে' যাই ঐ পরীর দেশে ;
মলয় হাওয়ায় গা ঢেলে দেই, নীল আকাশে মেলিয়ে পাখা।
দেখ্‌না কেমন দেখ্‌তে মানুষ, দেখ্‌না কেমন দেখ্‌তে ধরা।
জীবনটা কি শুধুই ভাবা, শুধুই নীরস কার্য করা ?
কি হবে রে সে সব জেনে, নে রে জীবন ভোগ করে' নে,
নৈলে জগৎ শুধুই ধূলো, জীবন শুধুই বেঁচে থাকা।

ভৈরবী—জলদ্ কাওয়ালী।

আজি, নূতন রতনে, ভূষণে যতনে,
প্রকৃতি সতীরে সাজায়ে দাও গো !
আজি, সাগরে, ভুবনে, আকাশে, পবনে,—
নূতন কিরণ ছড়িয়ে দাও গো !
আজি, পুরানো যা কিছু, দাও গো ঘুচিয়ে ;
মলিন যা কিছু ফেল গো মুছিয়ে ;
—শ্যামলে, কোমলে, কনকে, হীরকে,
ভুবন ভূষিত করিয়ে দাও গো।
আজি, বীণায় মুরজে, স্বননে গরজে,
জাগিয়া উঠুক গীতি গো।
আজি, হৃদয় মাঝারে, জগত বাহিরে,
ভরিয়া উঠুক প্রীতি গো।
আজি, নূতন আলোকে, নূতন পুলকে,
দাও গো ভাসায়ে ভূলোকে দ্যুলোকে

নূতন হাসিতে বাসনারাশিতে,
জীবন মরণ ভরিয়ে দাও গো।

খাম্বাজ—চৌতাল।

আজি গাও মহাগীত মহা আনন্দে,
বাজাও মৃদঙ্গ গভীর ছন্দে,
পাল তুলে দাও, ভেসে যাক শুধু সাগরে জীবন-তরণী।
উলসি উছলি উঠুক নৃত্য,
করুক সন্ধি জীবন মৃত্যু,
স্বর্গ নামিয়া আসুক মর্ত্যে, স্বর্গে উঠুক ধরণী।
চঞ্চল-চল-চরণভঙ্গে
উঠুক লাস্য অঙ্গে অঙ্গে,
ফুটুক হাস্য সরস অধরে; ছুটুক ভাতি নয়নে;
উঠিয়া গীতি-মধুর-মন্দ্র
লুঠিয়া নিউক সূর্য চন্দ্র,
অসহ পুলকে উঠুক শিহরি ধরণী অরুণবরণী।

ভৈরবী—কাওয়ালী।
(লঘুগুরু ছন্দ)

আনন্দময়ী বসুন্ধরা
চির-অভিরামা, তরুণী শ্যামা, সুহাসিনী পিককলস্বরা।
গহন কুন্তলা, কুসুম আরক্তিম শ্যামা, সুশ্যামলাম্বরা,
তটিনী-হার-বিলম্বিত হৃদয়া তুষার-হীরক-মুকুট-পরা।
জলধিনীলে বক্ষোনিমগ্না সূর্যো মাতা বন্দে,
বিহঙ্গ ছন্দে মন্দ সমীরণ সিঞ্চিত কুসুম সুগন্ধে,
তরুণ উষায় অরুণ মৃদুরক্তিম তরুণী প্রণয়স্মিতাধরা
ভানুনিলীন নয়ন নলিনী কি প্রেম বিমুগ্ধ, কি ভক্তিভরা।

বিবিধ

বাগেশ্রী—আড়া।

কোথা তুমি কোথা তুমি বিশ্বপতি বৃথা বিশ্বময় খুঁজে বেড়াই ;
তারা বলে সব দেখেছে তোমারে আমি কই নাহি দেখিতে পাই !
সিংহশিশু করে মেষরক্ত পান, বলী বলহীনে করে অপমান,
তুমি সর্বশক্তি তুমি ন্যায়বান্, দূরে কি বসিয়া দেখিছ তাই ?
ধনীর আস্পর্ধা কপটের জয়, ধর্মের পতন তবে কেন হয় ?
তুমি যদি প্রভু দেব দয়াময়, এ নিয়ম তরে তবে কে দায়ী ?
তার চেয়ে বলি শোক, দুঃখ, জরা, পীড়ন, পেষণ, অবিচার ভরা,
আপনি চলেছে অরাজক ধরা, এ রাজ্যের রাজা কেহ ত নাই।

ভৈরবী—ঝাঁপতাল।

একই ঠাঁই চলেছি ভাই ভিন্ন পথে যদি,
জীবন, জল-বিম্ব-সম, মরণ, হ্রদ-হ্রদি ;
দুঃখ মিছে কান্না মিছে, দু'দিন আগে দু'দিন পিছে,
একই সেই সাগরে গিয়ে মিশিবে সব নদী।
একই ঘোর আঁধারে আছে ঘেরিয়া চারিধারে,
জ্বলিছে দীপ নিভিছে দীপ সেই অন্ধকারে,
অসীম ঘন নীরবতায়, উঠিয়া গীত থামিয়া যায়,
বিশ্ব জুড়ি' একই খেলা চলেছে নিরবধি !

বাউল—একতালা।

আমারি আমার বলে' ডাকি, আমার এ ও আমার তা ;
তোমার নিয়ে তুমি থাক, নিও নাক আমার যা।

আমার বাড়ি আমার ভিটে, আমার যা তা বড়ই মিঠে ;
আমার নিয়ে কাড়াকাড়ি, আমার নিয়ে ভাবনা।
আমার ছেলে, আমার মেয়ে, আমার বাবা আমার মা,
আমার পতি, আমার পত্নী ;—সঙ্গে ত কেউ যাবে না।
আমার যত্নের দেহ ভবে তাও রেখে যেতে হবে ;
আমার বলে' কারে ডাকি ?—চোখ বুজ্‌লে কেউ কারো না।

ভৈরবী—কাওয়ালী।

শুধু দু'দিনেরই খেলা।
ঘুম না ভাঙিতে, আঁখি না মেলিতে,
দেখিতে দেখিতে ফুরায় বেলা।
আশার ছলনে কত উঠি পড়ি,
কত কাঁদি হাসি, কত ভাঙি গড়ি,
না বাঁধিতে ঘর হাটের ভিতর
ভেঙে যায় এই সাধের মেলা।
আমাদেরও এই দেহ, প্রাণ, মন,
সুখ, দুঃখ, এই জীবন, মরণ,
—এও বিধাতার পুতুল খেলা,
—শুধু গড়া আর ভাঙিয়া ফেলা !

শঙ্করা—জলদ্‌ একতালা।

সুখের কথা বোলো না আর, বুঝিছি সুখ কেবল ফাঁকি,
দুঃখে আছি, আছি ভাল, দুঃখেই আমি ভাল থাকি।
দুঃখ আমার প্রাণের সখা, সুখ দিয়ে যা'ন চোখের দেখা,
দু'দণ্ডের হাসি হেসে, মৌখিক ভদ্রতা রাখি।
দয়া করে' মোর ঘরে সুখ পায়ের ধূলা ঝাড়েন যবে,
চোখের বারি চেপে রেখে মুখের হাসি হাস্‌তে হবে ;

চোখে বারি দেখ্‌লে পরে, সুখ চলে' যা'ন বিরাগভরে ;
দুঃখ তখন কোলে ধরে' আদর করে' মুছায় আঁখি।

মিশ্র ভূপালী—ত্রিতাল।

ঘন তমসাবৃত অম্বর ধরণী—
গর্জে সিন্ধু ; চলিছে তরণী !—
গভীর রাত্রি, গাহিছে যাত্রী,
ভেদি সে ঝঞ্ঝা উঠিছে স্বর !—
"ওঠ্‌ মা ওঠ্‌ মা দেখ্‌ মা চাহি
এই ত এসেছি আর চিন্তা নাহি—
জননী হীনা কন্যা দীনা
ওঠ্‌ মা ওঠ্‌ মা প্রদীপটি ধর।
লঙ্ঘি বনানী পর্বতরাজি,
তোর কাছে এই আমি এসেছি ত আজি।
কোথায় জননী ? গভীর রজনী,
গর্জে অশনি, বহিছে ঝড়।
এ কি !—কুটীর যে মুক্তদ্বার !
নির্বাণ দীপ !—গৃহ অন্ধকার—

কোথায় জননী ! কোথায় জননী !
শূন্য যে শয্যা—শূন্য যে ঘর।"—
সে ধ্বনি উঠিয়া আর্তনিনাদে,
বিধাতৃচরণে পড়িয়া কাঁদে,
চরণাঘাতে বজ্র-নিপাতে
মূর্ছিয়া পড়িল সে অবনী'পর।

বসন্ত মালকোষ—তেতাল।

জগত যা নিয়ে যায় একবার ফিরায়ে দেয় না আর তায়,
নিয়ে যায় সব ভেঙে চুরে শুধু স্মৃতিটুকু তার রেখে যায়।
একবারই আসে বসন্তে তেমনি স্নিগ্ধ মধুর মৃদু বায়,
একবারই হাসে তেমতি ধরণী বিমল শারদ জ্যোছনায়।
যৌবন জীবনে একবারই আসে, ফিরে সে কভু না আসে হায়,
বিবাহের নিশি তেমনি করিয়ে একবারই শুধু বাঁশি গায়;
নিয়ে যায় চলি নবীন শৈশবে নবীন উদ্যম প্রতিভায়,
নিয়ে যায় চলি তরুণ যৌবনে আকুল উন্মাদ বাসনায়।
গরবিণী ধরা হাসে ফুলভরা সৌরভটি শুধু রেখে যায়,
যে ফুলটি হায় ঝ'রে গেছে শুধু ফোটে না সে ফুল পুনরায়।

বাউল—একতালা।

জীবনটা ত দেখা গেল শুধুই কেবল কোলাহল।
এখন যদি সাহস থাকে, মরণটাকে দেখ্‌বি—
ওরে মরণটাকে দেখ্‌বি, ওরে মরণটাকে দেখ্‌বি চল্!
প'ড়ে আছে অসীম পাথার, সবাই তাতে দিচ্ছে সাঁতার;
অঙ্গ এলে অবশ হ'য়ে সবাই যাবে রসাতল।
উপরে ত গর্জে ঢেউ, সে দণ্ডমাত্র নয় ক স্থির;
নীচে প'ড়ে আছে অগাধ স্তব্ধ শান্ত সিন্ধুনীর—
এতদিন ত ঢেউয়ে ভেসে দিলি সাঁতার উপর দেশে—
ডুব দিয়ে আজ দেখব নীচে কতখানি গভীর জল।

ছায়ানট—একতালা।

ভিতরে হাসিছে মুখরা যামিনী দীপমালা সুখে গলায় পরিয়া;
বাহিরে শিশিরঅশ্রুনয়না বিষাদিনী নিশা কাঁদে গুমরিয়া।

—ভিতরে আলোকশিখা চারি দিকে, ঠিকরিয়া পড়ে
মুকুরে স্ফটিকে ;
বাহিরে পড়িয়া অসীম আঁধার—বনপ্রান্তর ঘন আবরিয়া।
উছলে কক্ষে সঙ্গীতরব নৃত্যলহরী, রহিয়া রহিয়া ;
সুদূর মলয়ে নিঠুর শীতের কঠোর বাতাস যাইছে বহিয়া ;
তোরণস্তম্ভশিরে দোলে যবে গোলাপমালিকা কুলটা গরবে ;
—বিজন বিপিনে নিভৃতে নীরবে তিমিরে শেফালি
পড়িছে ঝরিয়া।
আমরা এম্‌নিই এসে ভেসে যাই।
আলোর মতন, নেশার মতন, কুসুম-গন্ধ-রাশির মতন,
হাওয়ার মতন, নেশার মতন, ঢেউয়ের মতন এসে যাই।
আমরা অরুণ কনক কিরণে চড়িয়া নামি,
আমরা সান্ধ্য রবির কিরণে অস্তগামী ;
আমরা শরত ইন্দ্রধনুর বরণে, জ্যোৎস্নার মত অলস চরণে,
চপলার মত চকিত চমকে চাহিয়া ক্ষণেক হেসে যাই।
আমরা স্নিগ্ধ, কান্ত, শান্তি, সুপ্তি ভরা,
আমরা আসি বটে তবু কাহারে দিই না ধরা,
আমরা শ্যামলে, শিশিরে, গগনের নীলে,
গানে, সুগন্ধে, কিরণে—নিখিলে,
স্বপ্নরাজ্য হ'তে এসে ভেসে স্বপ্নরাজ্য দেশে যাই।

খাম্বাজ—কাওয়ালী।

আয় রে আমার সুধার কণা আয় রে ননীর ছবি
আয় রে নিশার সোনার চাঁদ আয় রে উষার রবি ;—
উড়ে উড়ে বনে বনে তুই বেড়াস্ বনের পাখী,—
যাস্ নে ওরে, আয় রে তোরে বুকে ক'রে রাখি।

উঠায়ে তোর হাসির লহর কোথায় যাস্ রে চ'লে,
পাষাণ-ভাঙ্গা নির্ঝরিণী—ভাঙ্গা ভাঙ্গা বোলে ;—
ঘাড়ের কাছে সোনার বরণ—চুলগুলি তোর দোলে ;
—যাস রে কোথা—আয় রে যাদু, ঘুমা আমার কোলে।
তুই রে শিশু দুষ্ট বড় আসিস্ না ক কাছে,
ভাবিস্ কি রে অশ্রুনীরে ভিজে যাস্ রে পাছে ?
না যাদু তোর হাসিতে মোর দুঃখ যাবে দূরে,
ফুটবে মধুর চাঁদের আলো এ আঁধার পুরে !

তবে যদি তোর সুখে সুখী আমার অশ্রু ঝরে,
—আমার স্বভাব কেঁদে ফেলি রে হাস্তে হৃদয় ভ'রে—
চোখের নীচে হাসিস্ শিশু জড়িয়ে আমার গলে,
রচিস্ তাহে ইন্দ্রধনু—আমার অশ্রুজলে।
ভোরে উঠে ছুটে ছুটে খেলিস্ মনের সুখে,—
ছেড়ে খেলা সন্ধ্যেবেলা আসিস্ আমার বুকে ;
এমনি ক'রে পাড়াব ঘুম দিয়ে শত চুমো
সোনা আমার মানিক আমার, যাদু আমার ঘুমো।

পিলু—যৎ।

একি রে তা'র ছেলেখেলা বকি তায় কি সাধে,—
যা দেখ্‌বে বল্‌বে "ওমা এনে দে ওমা দে"।
'নেবো নেবো' সদাই কি এ ?—
পেলে পরে ফেলে দিয়ে
কাঁদ্‌তে গিয়ে হেসে ফেলে, হাস্‌তে গিয়ে কাঁদে।

এত খেলার জিনিস ছেড়ে,—
বলে কিনা দিতে পেড়ে,—
—অসম্ভব যা—তারার, মেঘে, বিজলিয়ে, চাঁদে।
শুনলো কারো হবে বিয়ে,
ধর্‌ল ধুয়ো অমনি গিয়ে—
"ওমা আমি বিয়ে কর্‌ব"—কান্নার ওস্তাদ এ।
শোনে কারো হবে ফাঁসি,—
অমনি আঁচল ধর্‌ল আসি—
"ওমা আমি ফাঁসি যাব"—বিনি অপরাধে।

নাট্যকাব্য

নাট্যকাব্য

দ্বিজেন্দ্রলালের কবিত্বের পরিচয় পূর্ণাঙ্গ করতে তাঁর চারটি নাট্যকাব্য থেকে কিছু কিছু অংশ এখানে সংযুক্ত হ'ল—এজন্যে কাব্যরসিকরা আনন্দিতই হবেন।

এর মধ্যে "সীতা" নাটকটির সম্বন্ধে কিছু না বললেও চলবে, কেন না রামায়ণের কাহিনী সবাই জানে।

"পাষাণী সম্বন্ধে" একটু ভূমিকার প্রয়োজন আছে। ক্ষত্রিয় রাজা বিশ্বামিত্র তপোবলে ব্রাহ্মণত্ব লাভ ক'রে সাহংকারে জনককে বলেন ব্রাহ্মণ হবার গৌরব সুলভ্য। উত্তরে জনক বলেন :

বিশ্বামিত্র ঋষি !
করিও না অহংকার। লভিয়াছ যদি
ব্রাহ্মণত্ব তুমি—তাহা বিপ্রের বিনয়ে,
আপনার গুণে নহে। জানিও তথাপি—
যদিও ব্রাহ্মণ তুমি, তোমার আসন
ব্রাহ্মণের বহু নিম্নে······প্রমাণ··· ?
যাও ঋষি একদিন গৌতম আশ্রমে
পাইবে প্রমাণ।

বিশ্বামিত্র রোখ ক'রে গৌতমকে পরীক্ষা করতে যান। গৌতম-আশ্রমে গিয়ে তিনি দেখেন গৌতম স্ত্রী অহল্যাকে ভালোবাসলেও সে-প্রেম উদার অনাসক্ত। তপস্যার জন্যে গৌতম এককথায় পরমাসুন্দরী স্ত্রীকে ছেড়ে গেলেন। তখন ইন্দ্র গৌতম-আশ্রমে এলে অহল্যাকে মুগ্ধ ক'রে ভ্রষ্টা পরে পরিত্যাগ করেন। অহল্যা সন্তান ও স্বামী ছেড়ে পরিত্যক্তা হ'য়ে ক্ষোভে পাষাণী হন। রামচন্দ্রের স্পর্শে তাঁর মুক্তি হয়। পরে অহল্যা গৌতমের কাছে ক্ষমা চাইতে গৌতম তাঁকে সাদরে পুনর্গ্রহণ করেন। সমস্ত নাটিকাটি উদ্ধৃত করা সম্ভব নয় ব'লে সংক্ষেপে এই মূল কাহিনীটি বলতে হ'ল। বাকিটুকু দ্বিজেন্দ্রলালের কবিত্বময় অমিত্রাক্ষরে উদ্ধৃত দৃশ্য কয়টিতে ফুটে উঠেছে।

সোহ্‌রাব-রুস্তমের কাহিনী নিয়ে ম্যাথিউ আর্নল্ড্‌ তাঁর বিখ্যাত কবিতা লেখেন। রুস্তম স্ত্রী ও শিশুপুত্রকে ছেড়ে নিরুদ্দেশ হন। বীরপুত্র সোহ্‌রাব সাবালক হ'য়ে তাঁকে খুঁজতে গিয়ে বিদেশে রুস্তমের সঙ্গে যুদ্ধ ক'রে তাঁকে পরাজিত ক'রেও তাঁকে না চিনতে পেরে তাঁর হাতেই নিহত হন। এ-করুণ কাহিনীটি দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁর গীতিনাট্যে অপরূপ ক'রে ফুটিয়েছেন।

ভীষ্ম ও অম্বালিকার কাহিনী পৌরাণিক। কেবল অম্বালিকার ভীষ্মকে প্রলুব্ধ করার প্রয়াস দ্বিজেন্দ্রলালের কল্পিত। ইতি—

দ্বি. কু. রা.

সীতা

প্রথম অঙ্ক

দ্বিতীয় দৃশ্য

শান্তা। এমনি—
সদা চিন্তাকুলা, সীতা, সদা অন্যমনা,
চাহে চারিদিকে মুগ্ধকুরঙ্গনয়না,
সপ্রশ্ন বিস্ময়ে; সদা আতঙ্ক-বিহ্বল;
মুহূর্তে পাণ্ডুরা; চক্ষু দুটি ছল ছল
ভরে' আসে জলে; হাসি মিলাইয়া যায়
গভীর বিষাদে। যেন পূর্ণিমা নিশায়
মরণের চিন্তা; যেন পুষ্পিত কাননে
ভুজঙ্গম; উৎসবমন্দিরে আর্তধ্বনি;
যেন মূর্চ্ছা সৌন্দর্যের; চিন্তার কালিমা
শিশুর ললাটে; যেন পাষাণ-প্রতিমা
হাস্যের; পদ্মের পত্রে নিশার নীহার;
অথবা তমিস্রাগর্ভে সুন্দরী সন্ধ্যার
আত্মহত্যা।—লো মাণ্ডবি! কী চিন্তা সীতার
বুঝিতে কি পার বোন্?

মাণ্ডবী। বুঝিব কি আর!
বনবিহঙ্গিনী কভু সোনার পিঞ্জরে
সুখে থাকে দিদি?

ঊর্মিলা ভিন্ন সকলের প্রস্থান

ঊর্মিলা। সূর্য অস্ত যায়! দূরে, অনিমেষে চাহে
রঞ্জিত প্রান্তর। স্তব্ধ সরযূ প্রবাহে

রবির কনক-রশ্মি ঘুমাইছে আসি'।
হস্তে দীপ, আরক্তিম মুখে মৃদুহাসি,
আসিছে আনতনেত্রে, ধূসর বসনে,
অর্ধাবগুণ্ঠনবতী সন্ধ্যা, সঙ্গোপনে,
ধীর পদক্ষেপে, এ বিশ্ব মন্দিরে !—অয়ি
স্মিতা, সুমধুরা লজ্জানম্র, প্রেমময়ি
সন্ধ্যা, এস ধরাতলে,—নিয়ে এস আর
প্রাণেশ লক্ষ্মণে সখি বক্ষে ঊর্মিলার।

প্রস্থান

তৃতীয় দৃশ্য

লক্ষ্মণ ও ঊর্মিলা

লক্ষ্মণ। কত দিন পরে ?
ঊর্মিলা। নাথ ! জানি না ; নাথের সাথ
মিলেছি যে ক্ষণে,
অতীত দিনের কথা অতীত বিরহ ব্যথা
পড়ে না'কি মনে।
নাই দুঃখ এতটুকু শুধু তৃপ্তি, শুধু সুখ,
শুধু দিব্যহাসি—
আলোকিত কুঞ্জভূমি ; শুধু ভালোবাসো তুমি,
আমি ভালোবাসি।
চক্ষু হ'তে লুপ্ত সব ; করি মাত্র অনুভব—
তুমি আছ কাছে ;

তুমি বিনা, মনোদৃশ্যে দেখিতে পাই না বিশ্বে
আর কিছু আছে।

লক্ষ্মণ। চতুর্দশ বর্ষ পরে—

ঊর্মিলা। পাইয়াছি প্রাণেশ্বরে
আজি যদি প্রভু;
নাহি ছিল অধীরতা হৃদয়ে বিরহ-ব্যথা
পাই নাই কভু।
জানিতাম, ঊর্মিলার তুমি, আর সে তোমার,
এ বিশ্বভিতরে;
জানিতাম, এই ভবে আবার মিলন হবে,
কিংবা জন্মান্তরে।

লক্ষ্মণ। তুমি এ অযোধ্যাপুরে, আর আমি সেথা দূরে,
গোদাবরী তীরে;
তবু কি আমারে প্রিয়ে, দুটি স্নেহ বাহু দিয়ে
থাকিতে না ঘিরে?
এই চতুর্দশ বর্ষ তোমার চাহনি, স্পর্শ,
তব কণ্ঠরব,
তব মুখ অভিরাম, এ হৃদয়ে করিতাম
নিত্য অনুভব।

ঊর্মিলা। জানি নাথ! তাহা জানি।

লক্ষ্মণ। আমার হৃদয়রাণী!
রহ জাগি' মনে
পূর্ণ করি' মম চিত্ত, জাগ্রতে, স্বপনে নিত্য,
বিরহে মিলনে।

ঊর্মিলা। দেখ কি মধুর দৃশ্য— আলোকিত শ্যাম বিশ্ব,
কি শান্তির ছবি!

লক্ষ্মণ। সত্য ; এ নদীর তট, এই ঘনচ্ছায় বট,
—মধুর অটবী।
ঊর্মিলা। শোনো ওই মৃদু ধীর, পল্লবিত অটবীর
পুষ্পিত অধরে,
অস্ফুট মর্মর বাণী— আকাশের মুখখানি
দিব্য স্নেহ ভরে,
হাসে শুভ্র রাশি রাশি আশীর্বাদভরা হাসি ;
মধ্যাহ্ন কিরণে,
ঘনশ্যাম কুঞ্জশাখে ওই শোনো পাখী ডাকে,
ঘন কুঞ্জবনে।
বনাবৃত শৈলগুলি, দূরে খর্ব শৃঙ্গ তুলি',
দাঁড়াইয়া আছে।
অপার আনন্দভরে, সমীরণ নৃত্য করে
ফুলে, ফলে, গাছে।—
কি দেখিছ একদৃষ্টি ?
লক্ষ্মণ। সৃষ্টির অতুল সৃষ্টি
তোমারে প্রেয়সী ;
ঊর্মিলা। (সলজ্জ) দেখ ওই মৃগী রঙ্গে খেলা করে সাথীসঙ্গে ;
ওই দূরে বসি',
কপোত কপোতী কিবা যাপন করিছে দিবা,
প্রচ্ছন্ন মিলনে ;
ওই নদীতট 'পরে দেখ কত গাভী চরে ;
ওই ঘন বনে
ময়ূর ময়ূরী ভ্রমে।
লক্ষ্মণ। দেখিতেছি প্রিয়তমে ;
কত নদী, কত হ্রদ, কত পুর, জনপদ,
অতিক্রম করি',

এসেছি অতিথি, প্রিয়ে, তোমার আশ্রম-গৃহে,
দাও প্রাণ ভরি',
তোমার প্রণয় সুধা, মিটাও প্রাণের ক্ষুধা,
—দাও ভালোবাসা।

উর্মিলা। হায় নাথ! তাহা যদি দিই নিত্য নিরবধি
মিটে না এ আশা।

পরস্পর আলিঙ্গন-বদ্ধ

চতুর্থ অঙ্ক

ষষ্ঠ দৃশ্য

স্থান—প্রাসাদশিখর। কাল—মধ্যরাত্রি

রাম একাকী

রাম। অস্তে গেছে চন্দ্র! দূরে সপ্তর্ষিমণ্ডল
পড়েছে ঢলিয়া। স্থির, নিস্তব্ধ, নির্মল
মসীময় দিগন্ত আকাশ।—লক্ষ লক্ষ
নিশ্চল নক্ষত্রপুঞ্জ নীলিমার বক্ষ
ছেয়ে আছে; অন্ধকার প্রগাঢ় অম্বরে
অন্তরে আলোকরাজ্য!—মৃত্যুর উপরে
বিজয়ী প্রেমের মত।
স্তব্ধ এ সংসার।
শুধু দূরে সরযূর অশ্রান্ত ঝঙ্কার,
অনন্ত বিলাপ সম, অস্ফুট কারুণ্যে
জাগাইছে প্রতিধ্বনি দূর স্তব্ধ শূন্যে।

জনশূন্য রাজপথ, চিত্রার্পিত প্রায়
হর্ম্যগুলি বদ্ধদ্বার। সুখে নিদ্রা যায়
পৌরজন। শুধু তার রাজার নয়নে
নাহি সুপ্তি।—চক্ষু ঢুলে আসে এইক্ষণে,
প্রগাঢ় আলস্যে।—সীতা! সীতা! এস নেমে;
আমার এ জাগ্রত তন্দ্রায়!—নহে প্রেমে,
এস করুণায়। আজি মৃতা কি জীবিতা—
নেমে এস। নেমে এস। (উচ্চৈঃস্বরে) সীতা! সীতা! সীতা!

স্বপ্নে সীতার প্রবেশ

সেই মূর্তি!—সেই নিষ্করুণ, সেই স্থির
পাষাণ-প্রতিমা! যেন নহে পৃথিবীর,
যেন নহে জীবিত জাগ্রত; সেই হিম
বিশুষ্ক হাস্যের রেখা অধরে অসীম
ঔদাস্যে; নয়নে, সেই নিষ্প্রভ, নিস্পন্দ
দৃষ্টি নিরাসক্তি, নির্বিরাগ, নিরানন্দ,—
স্থাপিত সুদূর শূন্যে। (জানু পাতিয়া) সীতা! প্রাণেশ্বরি!
যদি আসিয়াছ, আজি অনুকম্পা করি',
কথা কও প্রিয়ে!—আমি নিত্য নিরবধি
দগ্ধ হই তীক্ষ্ণ অনুতাপে—ক্ষমা করো
অপরাধ, কথা কও! এই ঘোরতর
অন্তর্দাহে এই অষ্টাদশ বর্ষ ধরি'
দগ্ধ হইয়াছি!—দেবি! প্রিয়ে! প্রাণেশ্বরি!
কোথায় চাহিয়া আছো দিগন্তের সীমা
লক্ষ্য করি' এক দৃষ্টে?—পাষাণ-প্রতিমা!

—চেয়ে দেখো! দেখো এই কৃশ, অস্থিসার
শীর্ণ দেহ।—কথা কও! শুদ্ধ একবার
বলো "ক্ষমা করিয়াছি"—একবার শুধু—

সীতার অপসার

—কোথা যাও—যাইও না—নিরন্তর ধূ ধূ
করিছে এ দীর্ঘকাল রাবণের চিতা
এই বক্ষে!—কও, কথা কও—সীতা
যাইও না—

সীতার অন্তর্ধান

ভাঙ্গিয়াছে স্বপ্ন! উঃ কী দাহ!
কি বেদনা শিরে। রক্তে অনল-প্রবাহ
ব'য়ে যায়।—একি? বহে ঝটিকার মত
আর্দ্র বায়ু অকস্মাৎ। দিগন্ত বিতত
মেঘরাশি ঘনীভূত সহসা অম্বরে?
খেলিছে বিদ্যুৎ। ঘন ঘন কড়কড়ে
বজ্রধ্বনি! গাঢ় গাঢ়তম অন্ধকার
ঢাকিয়াছে সৃষ্টি! বিশ্ব জুড়ি' চারিধার
উঠিয়াছে মরণ-কল্লোল।
—ভয়ঙ্করি
নিশীথিনি! এই ঠিক। অয়ি সহচরি!
ভীষণ প্রলয়ঙ্করি রাত্রি! অয়ি ভীমা
সঙ্গিনী! আমার বক্ষে যেরূপ অসীমা
অতৃপ্তি, অশান্তি, চিন্তা, অনন্ত তমসা,
ভীম হাহাকারপূর্ণ—তোরো সেই দশা।
দুজনে মিলেছি ভালো। আজি তোর সঙ্গে,

ঝাঁপ দিব ঝটিকার ভীষণ তরঙ্গে,
নৈরাশ্যের অন্ধকারে।
—কি গম্ভীর নিশি!
নামে জলধারা ব্যাপ্ত করি' দশদিশি।
মুহুর্মুহুঃ বিদ্যুৎবিদীর্ণ ঘনঘটা।
বৃষ্টির প্রপাত মাঝে সে বিদ্যুৎ ছটা
নেমে আসে পৃথিবীতে পিঙ্গল নিশীথে,
প্রলয়-দীপ্তির মত। প্রান্তর হইতে
প্রান্তরে দিতেছে লম্ফ বজ্র, হুহুঙ্কারি'
মৃত্যুর বিকট আর্তনাদ।—বলিহারি!
নাচ রে ভৈরবী রাত্রি প্রলয়ের ছন্দে
ভৈরব হুঙ্কারে ভীমা, উলঙ্গ আনন্দে।

পঞ্চম অঙ্ক

দ্বিতীয় দৃশ্য

বাল্মীকি। আর সীতা!
রাম। (অন্যমনে) সীতা সীতা আজি স্বপ্নবৎ মনে হয়।
বশিষ্ঠ। সীতা? ঋষিবর!—ধর্মমতে সীতা গ্রহণীয় নয়।
বাল্মীকি। কি হেতু বশিষ্ঠ? আমি মূর্খ ঋষি, বনমধ্যে থাকি,
আজীবন মহাভাগ! ধর্মাদির সংবাদ না রাখি।…
বশিষ্ঠ। কর্তব্যের জন্য; রাজধর্মরক্ষাহেতু মহামতি!
প্রেম না কর্তব্য বড়?
বাল্মীকি। কর্তব্য কি নাহি স্ত্রীর প্রতি,
মহাভাগ?—মহারাজ! শোনো তবে—নহে শাস্ত্র নব,

যদি অবজ্ঞাত আজি।—তুমি পতি—সীতা পত্নী তব ;
পতির কর্তব্য নহে, তাহারে আশ্রয়দান তবে ?
মেষ সম পত্নী নহে পতির সম্পত্তি মাত্র, যবে
বাসনা, রাখিবে ; যবে বাসনা, করিবে পরিহার ;
যেরূপ সুবিধা, রুচি, ইচ্ছা, কিংবা প্রবৃত্তি তোমার।
শোনো তবে, তোমার যতই, হায়, বক্ষের ভিতরে
তাহারও হৃদয়খানি, মহারাজ, অনুভব করে।
সীতা পত্নী ভুলে যাও—তুমি রাজা, তব প্রজা সীতা,
অপবাদ-অপমান-বিদ্ধা! যদি বিশ্বপ্রতাড়িতা,
নিরপরাধিনী আসি' মাগে তব শুদ্ধ সুবিচার,
তাহারে বিচারদান ন্যায়মতে কর্তব্য রাজার!
তাহাও কি দিতে অস্বীকৃত রাম আজি ?

রাম। অপারগ।—
অস্বীকৃত নহি।

বাল্মীকি। অপারগ ? রাম! তুমি বিচারক ;
তুমি মূর্তিমান ন্যায় ; তুমি রাজা ; রাজ-সিংহাসনে
বসিয়া নিঃশব্দে, অবলীলাক্রমে, অম্লান বদনে,
কহিলে এ কথা ?—শুষ্ক কৃপাহীন শুদ্ধ সুবিচার
দিতে অপারগ ?—যদি সত্য এই ; তবে কেন আর
বসি' রাম সিংহাসনে ? কেন এই রাজদণ্ড ?—শিরে
কেন এই উজ্জ্বল মুকুট ? আর কেন এ বাহিরে
বিচারের ব্যঙ্গ অভিনয় ? নেমে এস ; চলে যাও
বনগ্রামে ; দূর করো মাল্য ; রাজদণ্ড ফেলে দাও,
মুছে ফেল রাজটিকা অক্ষম ললাটে।—কেন আর
সিংহাসনে, দিতে অপারগ যদি শুদ্ধ সুবিচার ?
কাহার বিশ্বাস ধর্মমাহাত্ম্যে রহিবে, কহ রাম!

যদি তার এই পুরস্কার, এই পরিণাম ?
(বশিষ্ঠকে) করিয়াছ প্রশ্ন তুমি ঋষি !—কর্তব্য কি প্রেম বড় ?
আমি মূর্খ, আমি বুঝি, প্রেম উচ্চ, প্রেম শ্রেষ্ঠতর।
প্রেম পথ দেখায়, কর্তব্য চলে সেই পথ বাহি' ;
প্রেম দেয় বিধি, নিত্য কর্তব্য পালন করে তাহে।
প্রেম নহে ভ্রম, মহাভাগ ! বাতুলের স্বপ্ন নহে ;
প্রেম সত্য, প্রেম পুণ্য, প্রেম কভু, মিথ্যা নাহি কহে।
যেথা ধর্ম, সেথা প্রেম ; যেথা পাপ, প্রেম নাহি রহে।
প্রেম, প্রভু ; কর্তব্য, তাহার ভৃত্য। বিশ্বচরাচর
প্রেমের রাজত্ব নহে ? বিশ্বস্রষ্টা নিয়ন্তা ঈশ্বর
নহে প্রেমময় ?—প্রেমে সুগঠিত বিধি ও সমাজ।
প্রেমবদ্ধ পরিণয়ে নিত্য নব সৃষ্টি মহারাজ।
কর্তব্য, নির্জীব, মূক, হিম, অবসন্ন, নিরাকার
কঠিন পাষাণস্তূপ। তাহে শিল্পী ভাস্করের মত
প্রেম দেয় মূর্তি। শুষ্ক কর্তব্যকঙ্কালখানি ঘিরে
প্রেম দেয় মাংস পরিচ্ছদ। শুষ্ক তরুবরশিরে
প্রেম দেয় কুসুমপল্লব। রৌদ্রতপ্ত ধরাতলে
প্রেম আসে রাত্রিসম পবিত্রশিশিরস্নিগ্ধজলে
সুমন্দ পবনে। ধীরে, চিন্তার ললাটখানি ছেয়ে,
প্রেম আসে সুপ্তিসম।—কর্তব্য কি উচ্চ প্রেম চেয়ে ?
—চেয়ে দেখ মহারাজ, চেয়ে দেখ ঋষি, এ সুন্দর
বিশ্ব মুঞ্জরিত প্রেমে। দিগন্ত বিতত নীলাম্বর
প্রেমে উদ্ভাসিত। প্রেমে সূর্য উঠে, প্রেমে নীলাকাশে
পুঞ্জে পুঞ্জে জাগে লক্ষ নক্ষত্র ; চন্দ্রমা প্রেমে হাসে
প্রেমে বহে বারিধারা ; প্রেমে বিশ্বে নির্ঝরিণী ছুটে।
প্রেমে বিকশিত কুঞ্জে, প্রেমে রাশি রাশি পুষ্প ফুটে।

অন্ধকারে প্রেম দেয় আলো, বিশ্ব হাহাকার মাঝে
স্বর্গীয় সঙ্গীতে নিত্য নিয়ত প্রেমের বীণা বাজে।

বশিষ্ঠ। বাল্মীকি! বাল্মীকি! তুমি জয়ী। অবনত করি শির।
তোমার আদেশ শিরোধার্য। যাও রাম, বাল্মীকির
আজ্ঞামত কর কার্য। লও জানকীরে, মহীপতি!

রাম। অদ্য সুপ্রভাত মম এত দিনে।—কল্য সসংহতি
যাইব দণ্ডকে।—ত্বরা হউক প্রস্তুত পুষ্পরথ।—
যতদিন নাহি ফিরি, প্রতিনিধি রহিবে ভরত।—
সম্পূর্ণ হউক যজ্ঞ।—(বশিষ্ঠকে) গুরুদেব অতি শুভক্ষণে,
হ'য়েছিল অশ্বমেধমন্ত্রণা এ, মহর্ষির মনে।
—হৃদয়ের ধন্যবাদ লও দেব; সর্ব অপরাধ
ক্ষমা কর। আজ এই শুভদিনে, দাও আশীর্বাদ,
যেন পাই কুশলে কলত্র-পুত্রে।—পূর্ণ কর যাগ।
অকার্পণ্যে বিতর কাঞ্চন সবে।—আর (বাল্মীকিকে)
মহাভাগ!
লও হৃদয়ের শ্রদ্ধা, অন্তরের ভক্তি, কৃতজ্ঞতা;
দাও শান্তিবারি শিরে। দূরে যাক্ সর্ব ক্ষত ব্যথা,
অশান্তি ও দুঃখ।—করো আশীর্বাদ দুইজনে আজ।

বাল্মীকি। পূর্ণকাম হও বৎস!

বশিষ্ঠ। পূর্ণকাম হও মহারাজ!

রাম। লক্ষ্মণ! আদেশ করো—প্রতি গৃহচূড়ে, সৌধ-শিরে,
উড়ুক পতাকা বিরঞ্জিত, এই সুন্দর সমীরে,
বসন্তের। গাউক মঙ্গলগীতি, মনোহর ছন্দে
পুর ব্যাপ্ত করি'। নভ দীর্ণ করি' উন্মত্ত আনন্দে,
বাজুক মঙ্গল-বাদ্য। গৃহে গৃহে হোক্ শঙ্খধ্বনি।
আমি এবে যাই অন্তঃপুরে তবে, যথায় জননী।

পাষাণী

দ্বিতীয় অঙ্ক

দ্বিতীয় দৃশ্য

গৌতমের কুটির—সন্ধ্যাকাল

অহল্যা। আহা কী মধুর! (উপবেশন) মুঞ্জরিত নবশ্যাম
নিকুঞ্জ! গুঞ্জরে ভৃঙ্গ! রঞ্জিত সুন্দর
পল্লবিত বনবীথি সন্ধ্যার কিরণে!
সুদূরে তটিনী বহে ঘন তরুচ্ছায়ে,
অর্ধাবগুণ্ঠনবতী, ক্ষিপ্র পদক্ষেপে
বন্ধুর কান্তার দিয়া। স্তব্ধ অরণ্যানী।
শুধু দূর আম্রবনে ললিত উচ্ছ্বাসে
কুহরে কোকিল এক—করি' বিকম্পিত
পুষ্পিত অটবী। আসে মন্থর হিল্লোলে
বসন্তসমীর। চাহে নিস্পন্দ বিস্ময়ে
কুরঙ্গ-শাবক এক গ্রীবা বক্র করি'
স্তব্ধ অটবীর পানে। সবার উপরে
এক গাঢ় নীলাকাশ প্রশান্ত, নির্মল,
সদ্যোমেঘমুক্ত, নত চুম্বিতে ধরার
সুখস্মিত বিম্বাধর—রক্তিম লজ্জায়।
কে বলিবে—এ বরষা? কে বলিবে—ছিল
কাল সমাচ্ছন্ন করি' ও-নীল আকাশ
প্রাবৃটের ঘনঘটা? বসন্ত বরষা
মধুর মিশ্রণে যেন রচিয়াছে এক
অপরূপ স্বপ্নরাজ্য! আহা কী মধুর!...

উঠে চাঁদ! মরি মরি! বন-অন্তরালে
পূর্ণ জ্যোৎস্না! একদিকে শান্ত গরিমায়
সূর্য নামে অস্তাচলে। অপর আকাশে
চন্দ্রোদয় স্নিগ্ধ হাস্যে! লয়েছে উভয়ে
বিভাগ করিয়া যেন দিগন্তবিতত
উজ্জ্বল আকাশরাজ্য। দিবা-অবসানে
আসে ওই তারাময়ী কান্তা নিশীথিনী
শ্রান্তি 'পরে শান্তি সম—শুষ্ক কর্ম 'পরে
শিথিল স্বপ্নের ম'ত! ওই…ও কে গায়!

সজ্জিত তরণীতে আরূঢ়া অপ্সরাদিগের
গাহিতে গাহিতে প্রবেশ ও প্রস্থান:

বেলা ব'য়ে যায়…
ছোট্ট মোদের পান্‌শি তরী সঙ্গে কে কে যাবি আয়!
দোলে হার বকুল যূথী দিয়ে গাঁথা সে!
রেশমী পাইল উড়্‌ছে মধুর মধুর বাতাসে!
হেল্‌ছে তরী তুল্‌ছে তরী—ভেসে যাচ্ছে দরিয়ায়।
যাত্রী সব নূতন প্রেমিক, নূতন প্রেমে ভোর:
মুখে সব হাসির রেখা, চোখে ঘুমের ঘোর।
বাঁশির ধ্বনি, হাসির ধ্বনি উঠ্‌ছে ছুটে ফোয়ারায়।
পশ্চিমে জ্বল্‌ছে আকাশ সাঁঝের তপনে:
পূর্বে ঐ বুন্‌ছে চন্দ্র মধুর স্বপনে।
করছে নদী কুলুধ্বনি, বইছে মৃদু মধুর বায়।

তাপস বেশে ইন্দ্রের প্রবেশ

চতুর্থ দৃশ্য

অহল্যা। সত্য ক'য়ে বলো : ভালোবাসো অহল্যারে ?

ইন্দ্র। (কর দুটি ধরিয়া) অনিন্দ্য সুন্দরি !
আমার হৃদয়েশ্বরি !—নন্দন কাননে
কিশোর মন্দার পুষ্প বসন্ত সমীরে
ঢালে না সুগন্ধ এত—যে-গন্ধ তোমার
অস্ফুট-প্রণয়বাণীমিশ্রিত নিশ্বাসে।
ত্রিদিবভাণ্ডারে মোর এত সুধা নাই
ও-রক্ত অধরে যত। সজল বিদ্যুৎ
তত স্নিগ্ধ তীব্র নহে—তব আলিঙ্গন
যত স্নিগ্ধ প্রিয়তমে !...

অহল্যা। চলো, ঝাঁপ দিব
কলঙ্ক সমুদ্রে আজি।...

ইন্দ্র। চলো।

অহল্যা। কোথা যাব ?

ইন্দ্র। স্বর্গে।...

অহল্যা। না বল্লভ ! তার চেয়ে চলো
কোনো দূর নিরালয় দ্বীপে, উপকূল
অথবা পর্বতশৃঙ্গে—পশেনি যেখানে
মনুষ্যনিশ্বাস—নাহি পশিবে শ্রবণে
আপন অখ্যাতিগাথা—ভুঞ্জিব যেখানে
পরস্পরে নিত্য চির অতৃপ্ত বিলাসে
অলক্ষ্যে নিভৃতে সুখে। যেখানে বুঝিব
বিশ্ব জনশূন্য—শুধু তুমি আর আমি
ভাসায়ে যাইব যুগে যুগে নিরবধি

ক্ষুদ্র মিলনের তরী অকূল গভীর
প্রেমের সমুদ্রে—তার গাঢ় স্বচ্ছ নীল
ফেনিল হিল্লোলে

ইন্দ্র। অত্যুত্তম! চলো যাই

(অহল্যার হস্ত ধরিয়া আকর্ষণ করিয়া নিষ্ক্রমণ)

চতুর্থ অঙ্ক

চতুর্থ দৃশ্য

গৌতমের তপোবন—সন্ধ্যাকাল

বিশ্বামিত্র রাম লক্ষ্মণ

রাম। এই কি সে পুণ্যাশ্রম?

বিশ্বামিত্র। এই পুণ্যাশ্রম
গৌতমের। পরিত্যক্ত ভগ্নচূড় আজি,
আচ্ছন্ন উদ্ভিদে। ঋষি গিয়াছেন চলি'
সুদূর কৈলাসে—ছাড়ি' সংসার আশ্রম
অসীম বৈরাগ্যে। তাঁর প্রলুব্ধা পতিতা
প্রেয়সী অহল্যা নিরুদ্দিষ্টা।

লক্ষ্মণ। কী সুন্দর,
কী নির্জন, ঘনচ্ছায়, নীরব, গম্ভীর,
এই তপোবন প্রভু!

বিশ্বামিত্র। ছিল রম্যতর
সেই দিন এই তপোবন—যেই দিন
মহর্ষি গৌতম আর অহল্যা তাপসী

ছিল অবিচ্ছিন্ন সুখে মগ্ন তপস্যায়
এই বনগ্রামে।

লক্ষ্মণ। অতি করুণ কাহিনী
অহল্যার।

বিশ্বামিত্র। আজো মনে পড়ে সে নীরব
সুগভীর শান্তি—স্বচ্ছ সমুদ্রের ম'ত,
মিষ্ট নির্ঝরের ম'ত। আজো মনে পড়ে
সে-পবিত্র যুগ্ম মূর্তি—নীলাকাশ-বক্ষে
পূর্ণিমা-জ্যোৎস্নার ম'ত। আজো মনে পড়ে
সেই সম্মিলিত কণ্ঠে সমুত্থিত গীত
—মৃদঙ্গের সহ বীণাধ্বনি।

(নেপথ্যে যন্ত্রণাধ্বনি)

রাম ও লক্ষ্মণ (চমকিয়া)। ও কী শব্দ?

বিশ্বামিত্র। সত্যই তো!—যেন রমণীর কণ্ঠস্বর!
চলো দেখি গিয়া।

লক্ষ্মণ। ও কে বৃক্ষ-অন্তরালে
পাণ্ডুরা রমণী?

বিশ্বামিত্র। কই?

লক্ষ্মণ। ওই সন্নিকটে।

বিশ্বামিত্র। সত্য বটে! কে ও নারী
এ কী! হরি! হরি! এ কি অহল্যা?

অহল্যা (অগ্রসর হইয়া)। হাঁ, আমি
এখানে। কে তুমি ডাকো পরিচিত স্বরে
অহল্যার নাম ধরি'?

বিশ্বামিত্র। পারো না চিনিতে?
আমি বিশ্বামিত্র।

অহল্যা। তুমি বিশ্বামিত্র! বটে—
চিনেছি। কী প্রয়োজন?
বিশ্বামিত্র। অতিথি।
অহল্যা। অতিথি?
কাহার? গৌতম হেথা নাই। একা আমি।
ফিরে যাও, ফিরে যাও।—সে-ও এসেছিল
অতিথি বলিয়া। ঋষি! যাও, ফিরে যাও।
বিশ্বামিত্র। এ কী! তোমারে তো কভু হেন দেখি নাই!
অহল্যা! কোথা সে-সৌম্য বদনমণ্ডল
রক্তিম লজ্জায়? কোথা সে-হাস্য মধুর!
অহল্যা। নাই নাই—গেছে সব—সব সব সব
গণ্ডূষে করিয়া পান। যাও ঋষি, যাও।
কেন এ-নির্জনে এই দূর বনগ্রামে
এসেছ আবার ত্যক্ত করিতে আমারে!
বন্য পশু সম আমি হেথা বাস করি
একাকী নিঃসঙ্গ দূরে। রহি না কণ্টক
কাহারো সুখের পথে। এক কপর্দকও
কাহারো ধারি না। যাও মহর্ষি! তোমায়
একদিন করিতাম ভক্তি শ্রদ্ধা বটে,
কিন্তু আর শ্রদ্ধা নাই।
বিশ্বামিত্র। কী হেতু তাপসি?
কী দোষ আমার?
অহল্যা। দোষ? জানো না কী দোষ?
মহা দোষ। তুমি—তুমি—কপট পুরুষ!
এক মহা সত্য বিশ্বে জানিয়াছি প্রভু:
"লম্পট পুরুষ জাতি।" তুমি ঋষি বটে,

তথাপি বিশ্বাস নাই।—পুরুষ তো তুমি।
এসেছ আমার বুঝি রূপলালসায় ?
আর ভুলিব না।—ওই মিথ্যা প্রতারণা,
ওই মৃদু হাসি, ওই প্রলুব্ধ চাহনি,
ও-বঙ্কিম গ্রীবা—সব বুঝি, সব জানি।
বৃথা চেষ্টা মুনিবর!—গৃহে ফিরে যাও।

বিশ্বামিত্র। অহল্যা! কাহিনী তব জানি। প্রতারিতা
তুমি দেবি, তাহা জানি : পরিত্যক্তা তুমি—
তাহা নাহি জানিতাম। কিন্তু অভাগিনী,
আমি আসি নাই আজ এ-পুণ্য আশ্রমে
প্রতারণা করিতে তোমারে।

অহল্যা। কী বিশ্বাস ?
তুমি তো পুরুষ। সব পারে সে পুরুষ :
ঘুমন্ত পত্নীর গলে বসাইতে ছুরি,
কলঙ্কিতে পাতিব্রত্য পাশব বিক্রমে
নম্র নবোঢ়ার—ছুঁড়ে দিতে বালিকার
প্রস্ফুটিত প্রেমপুষ্প লোকাচার-পদে ;
বলি দিতে স্নেহ ভক্তি ; ক্ষুধার্তের মুখে
দিতে ভস্ম ; তৃষ্ণার্তের মুখে বিষ দিতে,
বিনাশিতে অনুকম্পা—বধিতে বিশ্বাস।
সব পারে।

রাম। মুগ্ধা, হতভাগিনী তাপসী!
হারায়েছ মনুষ্যে বিশ্বাস এতদূর ?
এতদূর পতিতা কি ? কিম্বা যন্ত্রণায়
হারায়েছ জ্ঞান ?—মূর্খ দোষে অন্যজনে
যবে সে বিবেকশূন্য, কর্তব্য-স্খলিত,

পড়ে গর্ত্তে!—মনুষ্যের জন্ম এ-জগতে
নহে ফুলখেলা দেবি!—সতীত্ব, জীবন
ব্রহ্মাণ্ডের আক্রমণ হইতে নিয়ত
করিতে হইবে রক্ষা।—শত প্রলোভনে
করিবেই আকর্ষণ তোমারে সবলে :
তোমারে রক্ষিতে হবে আপনারে বাঁধি।
বাধা ও বিপত্তি আসি' করিবে দুর্গম
জীবনের পথ সদা : তোমাকে তাহারে
লংঘন করিতে হবে আপনার বলে।
জীবন—সংগ্রাম। যদি নিষ্ঠুর জগৎ
তুমিও কঠিন হও।

অহল্যা। হায়! শক্তি নাই।

রাম। শক্তি নাই? মূঢ়! শক্তি আছে : ইচ্ছা নাই।
বিবেক উদ্যম নাই। প্রলোভনে নিজে
চরণ বাড়ায়ে দাও, পরে রুষ্ট হও—
বন্দী হও যবে সে-শৃঙ্খলে। সন্ধি করো
পাতকের সনে, পরে দেখ রুদ্ধ যবে
স্বর্গদ্বার—ক্রুদ্ধ হও। স্বহস্তে রোপণ
করো নিজে বিষবৃক্ষ, পরে দ্বন্দ্ব করো
বিধাতার সাথে—যদি না ফলে অমৃত।

অহল্যা। সব সত্য কথা—কিন্তু বহে কি নির্ঝর
শুষ্ক মরুভূমে? জন্মে পাষাণে কুসুম?
পশে কি সূর্যের জ্যোতি সাগর-কন্দরে?
আরম্ভ হইয়াছিল জীবন আমার
প্রকাণ্ড প্রমাদে। হায়, রাখিল বিধাতা
পূর্ণ জ্যোৎস্না কেন ভগ্ন গৃহে? পাপিয়ায়

অন্ধকারে ? ছড়াইল নির্জন বিপিনে
পুষ্পের সুগন্ধরাশি ?

রাম। হায় মূঢ় নারী !
এতদিনে চিনেছ কি শুধু প্রেমিকের
ঢল ঢল মুখখানি, কুঞ্চিত চিকুর,
আরক্তিম গণ্ড, দুটি লালসা-শিথিল
কৃষ্ণ চক্ষু, পূর্ণ পীন সরস অধর !
মূঢ় ! চিনিলে না তার গভীর হৃদয়,
প্রেমের নিহিত ব্যথা, সংযত আগ্রহ
—ছিল যাহা গৌতমের ? ঠেলিলে চরণে
সে সবে—অমূল্য রত্নহার কণ্ঠ হ'তে
উন্মোচন করি' ছুড়ে দিয়েছ তাপসি,
গভীর সাগরগর্ভে !

অহল্যা। (নীরবে ভাবিয়া) শিশু দার্শনিক !—
উদ্ভাসিত যাঁর সৌম্য পবিত্র আননে
নবীন বসন্ত—চক্ষু দুটি অবনত
ধরণীর 'পরে গাঢ় অনুকম্পাভরে,
বিনিঃসৃত যাঁর কণ্ঠে বীণার ঝংকার—
যেন বর্ষে বরিষার শ্যামল জলদে
স্নিগ্ধ বারিধারা—বলো কে তুমি সুন্দর ?

রাম। আমি রাম। দশরথ অযোধ্যার পতি,
আমি তাঁর পুত্র। ইনি কনিষ্ঠ আমার।

অহল্যা। রাজপুত্র তুমি ! রত্ন কাঞ্চন তোমার
অক্ষয় ভাণ্ডারে : কিন্তু হেন রত্ন নাই
সে-ভাণ্ডারে—তোমার এ উপদেশবাণী
মহার্ঘ যেরূপ। তুমি দেব নারায়ণ !

দাও শ্রীচরণধূলি—ক্ষমা করো প্রভু !

রাম। আমি কী করিব ক্ষমা ?—ক্ষমা চাহো তাঁর
যাঁহার অনন্ত প্রেম, অগাধ নির্ভর
বিনিময়ে আপনার নীচ হৃদয়ের
দিয়েছ কাঠিন্য—হানিয়াছ বজ্রশেল
যাঁহার কোমল বক্ষে তব ব্যভিচারে।
যাও মা, তাঁহার ক্ষমা চাহো। চাহো পরে
বিধাতার ক্ষমা—যাঁর মঙ্গল বিধান
তাচ্ছিল্যে দুরভিমানে ঠেলিয়াছ পদে
নবযৌবনের মদভরে।

অহল্যা। তিনি করিবেন ক্ষমা ?

রাম। জানি না তাপসি !
তথাপি চাহিয়া যাবো মৌন প্রার্থনায়।

অহল্যা। তাহাই হইবে। প্রভু ! করিলে উদ্ধার
এ-পাষাণী অহল্যারে। এসো দেবদেব !
করিব আতিথ্য-পূজা সানুজ তোমার
আমার আশ্রমে।—এসো মহর্ষি, কুটিরে।

পঞ্চম অঙ্ক

জনকের রাজসভা—প্রভাত

জনক, গৌতম, শতানন্দ ও বিশ্বামিত্র

গৌতম। ধন্য হইলাম আমি। মরি, কী মধুর
সজল-জলদ মূর্তি ! রাজর্ষি জনক !
যোগ্যতর পাত্রে ন্যস্ত হইত না কভু

সুন্দরী জানকী সীতা। শোভে কি তড়িৎ
বিনা নব জলধর। শোভে কি সুন্দর
শ্যামল পল্লব বিনা চম্পক লতিকা?

... ...

দশরথের প্রবেশ

জনক। (গৌতমকে) ইনি বৈবাহিক মম—অযোধ্যার পতি।

দশরথ গৌতমকে প্রণাম করিলে তিনি দশরথকে আশীর্বাদ করিলেন।

দশরথ। মহারাজ! এইক্ষণে
আসিতে প্রাসাদে সখে, দেখিলাম পথে
অত্যাশ্চর্য দৃশ্য এক: উন্মাদিনী নারী!
গৌতম। উন্মাদিনী?
দশরথ। উন্মাদিনী। রুগ্ন গৌর তনু,
আপাদলম্বিত শুভ্রকেশী। চক্ষু দুটি
জলভরে নত। স্বচ্ছ সুঠাম ললাটে
অঙ্কিত গভীর দুঃখ-কালিমা-কাহিনী।
গাহিছে কিন্নরী কণ্ঠে কী সঙ্গীত সে যে—
কী গূঢ় বেদনাপ্লুত—কী গাঢ় মধুর!...
সঙ্গে তার বিজড়িত...স্বর্গীয় হতাশা।
হেন মূর্তি দেখি নাই কভু!
গৌতম। (অর্ধ স্বগত) উন্মাদিনী!

(বাহিরে গীতের শব্দ)

দশরথ। ওই বুঝি—সেই নারী আসিছে এখানে!

গাহিতে গাহিতে অহল্যার প্রবেশ

আর একবার ভালোবাসো—বাসতে যেমন আগের দিনে।
ঘুমন্ত প্রাণের ব্যথা আবার জাগিছে প্রাণে।
একবার নাথ, তুলে ধরো হৃদয়ে হৃদয় 'পর হে,
শান্ত হোক প্রাণ—যাহে শত তীক্ষ্ণ শেল হানে।
তোমার হারানো বাঁশি লুটায় ধরণী 'পর ;
মলিন—তোমারি তবু—আদরে তুলিয়া ধরো।
ভাঙাচোরা প্রাণের বাঁশি তেমনি ক'রে আজ রে,
নাথের করে মধুর স্বরে বাজ রে, বাজ রে !

গৌতম। অভাগিনী ! এ-বেশ ! এ-দশা !

অহল্যা। অভাগিনী !
সত্য অভাগিনী আমি—বড় অভাগিনী,
বড় কলঙ্কিনী, বড পাপীয়সী, বড
পাতকিনী আমি প্রভু !

গৌতম। হায় প্রিয়তমে !

অহল্যা। প্রিয়তমে ! আজো মোরে এই সম্ভাষণ ?
এ কি উপহাস ? কিম্বা মহর্ষি, এখনো
চিন নি আমারে বুঝি ?

গৌতম। চিনি প্রাণেশ্বরি !

অহল্যা। না, চিন নি—ডাকিতেছ তাই সে-মধুর
স্নেহের গদ্‌গদ স্বরে ! তাই প্রেমভরে
প্রসারিছ বাহু।—যদি চিনিতে—ঘৃণায়
ফিরাইতে মুখ, মোরে কহিতে কর্কশ,
কিম্বা দিতে খেদাইয়া দূরে—পদাঘাতে।

গৌতম। অহল্যা—

অহল্যা। অহল্যা নহি—পাষাণী পাষাণী,
ব্যভিচারিণী, পুত্রহন্ত্রী, ঘাতকী, পিশাচী।

শোনো ইতিহাস—এমনি সে-ইতিহাস—
যার ছত্রে ছত্রে গাঢ় কলঙ্কের রাশি,
অক্ষরে অক্ষরে শুধু পুঞ্জীভূত পাপ।
পূর্বে শোনো ইতিহাস—

গৌতম। শুনিতে চাহি না,
সব জানি—প্রতারিতা, প্রলুব্ধা, পতিতা
প্রেয়সী আমার! এই শীর্ণ তনুলতা,
এ-পাণ্ডুর মুখ, এই কোটর-নিহিত
চক্ষুর অপাঙ্গে ঘন গভীর কালিমা
কহিছে সে ইতিহাস—

অহল্যা। নরকের জ্বালা—
নরকের জ্বালা প্রভু কত বর্ষ ধরি'
সহিয়াছি দিবানিশি। তীব্র যন্ত্রণায়
পাষাণী হইয়া গেছি অন্তরে অন্তরে।
একদা সহসা শেষে বিষ্ণুর কৃপায়
হইল চৈতন্য। শুষ্ক পাষাণ ভেদিয়া
ঝরিল নির্ঝর, বজ্রদগ্ধ দীর্ণ তরু
মুঞ্জরিল পত্রপুষ্পে। কী আর বলিব?
জানো যবে সব নাথ, কী বলিব আর?
জীবনসর্বস্ব! আমি বুঝিয়াছি ভ্রম
এতদিনে। ক্ষমা করো। ধর্মের প্রতিমা,
পুণ্যের কাহিনী তুমি, দয়ার সাগর,
স্বর্গের দেবতা!—আর আমি পাপীয়সী
মূঢ়, ক্ষুদ্র, ঘৃণ্য নরকের কীট। আমি
ভেঙেছি বিশ্বাস নাথ, ঠেলেছি চরণে
কর্তব্য—প্রেমের পাত্রে ঢালিয়াছি বিষ।

আজি বুঝিয়াছি ভ্রম। ক্ষমা করো—

শতানন্দ। ক্ষমা!

যে-নারী বিনাশ করে বিশ্বাস, প্রণয়,
সে ক্ষমার যোগ্য নহে।—হায় পিতৃদেব!
যে-দাম্পত্য প্রেম ভিত্তি সমাজের—মূল
সর্ব কর্তব্যের—যে সে দাম্পত্য প্রেমেরে
স্বহস্তে নির্মূল করে—সেই পাপীয়সী
ক্ষমাযোগ্য নহে। পিতা, ভৃগুর বিধান:
যোগ্য শাস্তি প্রাণদণ্ড—কুলটা নারীর—
হোক সে দুহিতা, জায়া অথবা জননী।

গৌতম। ক্ষান্ত হও প্রিয়তম! শাস্তি দিব? হায়!
আকণ্ঠ নিমগ্ন পাপে আমি মূঢ়মতি
দুর্বল মানব নিজে—সাধ্য কী আমার—
কর্তব্যস্খলিত মূঢ় অপরের 'পরে
বসিব বিচারাসনে?
(অহল্যার প্রতি) এসো অভাগিনী!
বিধির সুবিধি এই—আজ পাইলাম
যাহা পূর্বে পাই নাই কভু প্রিয়তমে!—
তোমারে প্রথম দিন অন্তরের পুরে।
এসো প্রপীড়িতা, পরিত্যক্তা প্রাণেশ্বরি!
এসো বাণবিদ্ধা হৃদিপিঞ্জরের পাখি,
হৃদয়-পিঞ্জরে ফিরে এসো।

(অহল্যাকে আলিঙ্গন)

বিশ্বামিত্র। এত উচ্চে?

এত উচ্চে তুমি? এত পবিত্র, মহৎ?

এত ক্ষমাশীল? এত উদার? ব্রাহ্মণ!
অবনত করি শির।—রাজর্ষি জনক!
বলেছিলে অতি সত্য কথা, বুঝিয়াছি—
লভি নাই ব্রাহ্মণত্ব। জেনেছি—তাহার
বহু নিয়ে প'ড়ে আছি। বিশ্বামিত্রে ধিক্!
লব্ধ ব্রাহ্মণত্বে ধিক্! তপস্যায় ধিক্!

জনক। ধন্য এ-চরিত্র—যার সংস্পর্শ-কুহকে
বারাঙ্গনা সতী হয়, দস্যু সাধু হয়,
পঙ্কিল পবিত্র হয়, কামুক লম্পট
জিতেন্দ্রিয় হয়, গর্বী নত করে শির:
যে স্পর্শমণির ম'ত পথের কর্দমে
স্বর্ণে পরিণত করে, পাবকের ম'ত
ভস্ম করে আবিল দুর্গন্ধ, পুণ্যতোয়া
জাহ্নবীর ম'ত ধৌত করে আবর্জনা।

অহল্যা। নাথ! তব পুণ্যতেজে আজ অন্ধ আমি।
কোথা তুমি? কত দূর? সঙ্গে ক'রে লও।

তৃতীয় অঙ্ক

অষ্টম দৃশ্য

স্থান—নদীতীরে সমরাঙ্গন। কাল—প্রভাত

সোরাব একাকী

সোরাব। বুঝিতে না পারি।—সেই বীর;—প্রসারিত
বক্ষ, সমুদ্রের মত, পর্বতের মত
গর্বসমুন্নত দেহ; চক্ষে বজ্রজ্বালা,
কণ্ঠস্বরে স্নিগ্ধ সুগম্ভীর মেঘধ্বনি;
কাহার সম্ভবে আর—যদি নয় তিনি
রুস্তম—আমার পিতা?
এক মহাদ্বিধা
আমারে করিছে ভিন্ন আমা হ'তে আজি।
আজি যেন আমি আর আমি নহি: যেন
বোধ হয় শূন্যগর্ভ বিজয়গৌরব।
শ্লথ শৌর্য অঙ্গ হ'তে পড়িছে খসিয়া
জীর্ণ বাস সম!—পিতা! পিতা! পিতা! পিতা!

রুস্তমের প্রবেশ

সোরাব। কে বীর! এসেছো তুমি!
রুস্তম। আসিয়াছি আমি।
সোরাব! বালক! শেষ যুদ্ধ হবে আজি।
লুটাইবে ভূমিতলে, সোরাব,—তোমার
অথবা আমার শব আজি।—যুদ্ধ কর।

সোরাব। ক্ষান্ত হও বীরবর! পরিত্যাগ কর
অস্ত্র। এসো, বীর! আজি তুমি আর আমি
দুই জনে বসি' এইখানে, করে কর,
বক্ষে বক্ষ, প্রিয়বর, ঊর্দ্ধমুখে মাগি
বিধাতার ক্ষমা! ডুবাইয়ে দেই
অতীত বিদ্বেষ মহা স্নেহের প্লাবনে।
তোমারে করিতে বধ উঠিছে না বাহু,
চাহিছে না প্রাণ।—আজি কি যেন টানিছে
দুর্নিবার স্রোতে আমারে তোমার পানে।
যেন তুমি বৈরী নহ; যেন—যেন তুমি
বন্ধু—বহু দিবসের বন্ধু পুরাতন।
মম অন্তস্তল হ'তে উঠিছে গভীর
করুণ ক্রন্দন এক—কি হেতু? জানি না।
—এস বন্ধু প্রিয়তম! আলিঙ্গন কর।

রুস্তম। কখন না। স্নেহ, অনুকম্পা, সর্ববিধ
কোমল প্রবৃত্তি আজি, এ হৃদয় হ'তে
নির্বাসিত করিয়াছি। সর্ব সাধনাকে
কেন্দ্রীভূত করিয়াছি একটি ইচ্ছায়,
সে তোমার বধ; পরাজয় অপমান
জর্জরিত করিয়াছে চিত্ত। সেই মহাজ্বালা
ব্যাপ্ত হইয়াছে দেহে, মস্তিষ্কে, শোণিতে!
জ্বলিতেছি, পুড়িতেছি আমি।—অস্ত্র নাও।

সোরাব। এই মাত্র? পরাজয় অপমান তবে
আমি লইতেছি মাগি'। এসো বন্ধুবর!
আজি আমি তব সর্ব সৈনিক সম্মুখে,
আমার জীবন ভিক্ষা লব জানু পাতি',

মাগিয়া তোমার কাছে।—বন্ধু! অস্ত্র রাখো।

রুস্তম। চাহি না শুনিতে নারীসুলভ কাকুতি।
আজি যুদ্ধে নামিয়াছি ভীম রুদ্র তেজে,
বাঁধিয়াছি আপনাকে ভীম প্রতিজ্ঞায়,
তোমারে করিব বধ অথবা মরিব;
এই শির, হয় আজি লোটাবে ভূতলে
তোমার চরণতলে, অথবা গৌরবে
উন্নত, বিজয়গর্বে ফিরিবে শিবিরে।

সোরাব। শোন বন্ধু।

রুস্তম। কোন কথা শুনিতে চাহি না;
আপনার সন্তানের মরণকাকুতি
টলাইতে পারে না এ প্রতিজ্ঞা আমার!
রক্ষা কর আপনাকে। (আক্রমণ)

সোরাব। তবে তাই হোক।

উভয়ের যুদ্ধ। ক্ষণেক পরে সোরাবের তরবারির
আঘাতে রুস্তমের তরবারি ভূপতিত হইল

রুস্তম। ক্ষুব্ধ নহি। রিক্ত হস্তে করিব সংগ্রাম।
—যুদ্ধ কর। দীপ্ত তব খর তরবারি
নামুক আমার স্কন্ধে;—ভীত নহি আমি।
মরিব বীরের মত।

সোরাব। কখন না—আমি
তরবারি করিলাম ত্যাগ। (তরবারি ত্যাগ) যুদ্ধ হোক
তবে বাহুবলে বাহুবলে (মল্লযুদ্ধ)

দ্রুতবেগে আফ্রিদের প্রবেশ

আফ্রিদ। ধন্য ধন্য—
এই ত উদার চির মহৎ সোরাব!
—তথাপি সোরাবে ছাড়িও না। বধ কর—
বধ কর তব সিংহবিক্রমে, রুস্তম।
সোরাব। কই পিতা। (ভূপতিত হইলেন)

রুস্তম তাহার উপরে হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া,
ছুরিকা উত্তোলন করিলেন

রুস্তম। সোরাব! স্মরণ কর তবে
পিতা মাতা—যে যেখানে আছে, এই শেষ
—মুহূর্তে তোমার।
সোরাব। এ প্রথম বার বীর!
তোমার দেশের প্রথা—
রুস্তম। এ প্রথম বার,
এই শেষবার—(বক্ষে ছুরিকাঘাত)
সোরাব। ওঃ—মরি, আমি মরি—মা! মা!—পিতা! পিতা!
রুস্তম। মর তুমি! আমার সে বিজয়গৌরব
বালক!—করিবে খর্ব তুমি!—মর তবে।

পুনরায় অস্ত্রাঘাত ও প্রস্থান

আফ্রিদ। মর মর পিতৃঘাতী! এ হস্ত দুখানি
করি বিরঞ্জিত তবে রুধিবে তোমার

হস্ত রঞ্জিত করিয়া

এই রক্ত—এই রক্ত, এখনও কবোষ্ণ
জীবন-উত্তাপে তব, এই রক্তে আজি
পিতার মৃত্যুর হোক পূর্ণ প্রতিশোধ।

সোরাব। আফ্রিদ!—করিও ক্ষমা।

আফ্রিদ। সোরাব! সোরাব!
বীরচূড়ামণি তুমি! উদার মহৎ।
পড়িয়াছ তুমি আজ অন্যায় সমরে;
তুমি যাইতেছ—যাও!—আমিও সোরাব!
আফ্রিদে চাহিয়া দেখ।

নিজ বক্ষে ছুরিঘাঘাত করিয়া পতন

তব পদতলে।

সোরাব। কি করিলে আফ্রিদ?

আফ্রিদ। উচিত করিয়াছি।
—সোরাব! তোমারে ভালবাসিয়াছি, বাসি।
তোমার আমার মধ্যে মহা ব্যবধান
ছিল—সে পিতার মৃত্যু; জীবনসঙ্গিনী
হইতে না পারিতাম কদাপি তোমার।
সেই মহা ব্যবধান আজি গেছে সরে,
আজি আমি তাই, তব—মরণসঙ্গিনী!
এসো বক্ষে প্রিয়তম—এসো একবার!
এ প্রথম, এই শেষ।

সোরাব। এসো প্রিয়তমে!
এসো বক্ষে আজি এই জীবনসন্ধ্যায়।

আফ্রিদ। প্রিয়তম! বিশ্ব অন্ধকার হয়ে আসে—
হস্ত দাও প্রাণাধিক! আমাদের এই
সাধের বাসর। (মৃত্যু)

সোরাব। বীরনারী! প্রাণাধিকে!
দাঁড়াও আমিও যাই।

কৈকায়ুশ ও সৈনিকগণ সহ রুস্তমের প্রবেশ

রুস্তম। এই সেই বীর
লুটায়ে ভূতলে।
কৈকায়ুশ। ধন্য ধন্য বীরবর !
নিরাপদ আজি পারস্যের সিংহাসন।
হে বীর ! বীরেন্দ্র ! আজি আলিঙ্গন দাও।

আলিঙ্গন করিয়া সসৈনিক প্রস্থান

সোরাব। হে বীর ! জানি না আমি, কে তুমি। জানিও—
আমায় অন্যায় যুদ্ধে বধিয়াছ তুমি ;
জানিও—তুমিও রক্ষা পাইবে না কভু
রুস্তম আমার পিতা শুনিবেন যবে,
এ হত্যাকাহিনী।—থাকো তুমি অন্ধকারে,
ভূগর্ভে, আকাশে, কিংবা জলধি-কন্দরে,
রুস্তম আমার পিতা শুনিবেন যবে,
এ অন্যায় হত্যা তাঁর পুত্রের—রবে না
তোমার উদ্ধত শির স্কন্ধের উপরে।
রুস্তম। সে কি ? কে তোমার পিতা ?
সোরাব। কে আমার পিতা ?
—ভুবনবিখ্যাত বীর রুস্তম।
রুস্তম। কে মাতা ?
সোরাব। তুরানের রাজকন্যা।—মা—মা—এ মরণে,
তোমার না পাইলাম দেখা।—হায় আমি
আসিয়াছি নিজ পিতৃ-অন্বেষণে,
কিন্তু দেখা পাইবার পূর্বে অবসান
হ'ল দিবা।

রুস্তম। অসম্ভব! এ পুত্র আমার!
আমার ত পুত্র হয় নাই!—অসম্ভব!

সোরাব। কে তুমি?

রুস্তম। আমিই সেই রুস্তম।

সোরাব। রুস্তম!—
আমার হৃদয় তবে মিথ্যা বলে নাই।
উঠিতেছিল না তাই, এ বাহু আমার
তোমারে করিতে বধ!—পিতা!—পিতা!—পিতা!

রুস্তম। বালক তোমার কোন নিদর্শন আছে?

সোরাব। খুলে দেখ এই বর্ম।

রুস্তম কম্পিতহস্তে সোরাবের বাহুর বর্ম উন্মোচন করিলেন

রুস্তম। এই সে কবচ।
কি করেছি, আমি পুত্রহত্যা করিয়াছি—
অন্যায় সমরে?—পুত্র! সোরাব—সোরাব!

সোরাব। পিতা! পিতা!

দ্রুতবেগে তামিনার প্রবেশ

তামিনা। কই পুত্র!

সোরাব। মা—মা—মা—আমার! (হস্ত বাড়াইলেন)

তামিনা। তাহাই ঘটিল পুত্র!—সোরাব! সোরাব!
—কোথা যাও বৎস!

রুস্তম। আমি হত্যা করিয়াছি
তামিনা তোমার পুত্র।

সোরাব। দাও পদধূলি;
মা আমার! বাবা!—যাই অতি দূরদেশে—
অতি ঘন-অন্ধকারে। দাও মা বিদায়। (মৃত্যু)

তামিনা। বৎস! বৎস! প্রাণাধিক! সোরাব আমার। (মূর্ছিতা)

রুস্তম প্রস্তরমূর্তিবৎ দণ্ডায়মান রহিলেন

তৃতীয় অঙ্ক

শেষ দৃশ্য

পুনরায় অষ্টম দৃশ্য—রাত্রি, ঝড়, বৃষ্টি, বিদ্যুৎ, বজ্রাঘাত। শীর্ণমুখ, শুভ্রকেশ পাণ্ডুর রুস্তম, সেইরূপ ভাবে দাঁড়াইয়া;—সম্মুখে জানু পাতিয়া তামিনা অবস্থিত; অদূরে পূর্ববৎ সোরাব ও আফ্রিদের মৃতদেহ

তামিনা। যা হবার হইয়াছে—ঘরে ফিরে চলো।
প্রভু! দীর্ঘ রাত্রিকাল আসিয়া নীরবে
প্রভাত হইয়া গেছে।—তথাপি নিশ্চল।
সে প্রভাত ক্রমে ক্রমে জ্বলিয়া জ্বলিয়া
আবার নিভিয়া গেছে গাঢ় অন্ধকারে।—
তথাপি নিশ্চল! সেই গাঢ় অন্ধকার
এখন ঘেরিয়া, বৃষ্টি, ঝঞ্ঝা ও বিদ্যুৎ
করে পৈশাচিক নৃত্য, সঙ্গে বাদ্য বাজে
ঘন ঘন বজ্রধ্বনি—তথাপি নিশ্চল—
নির্নিমেষ—চেয়ে আছো কেন?—ফিরে চলো।

হাত ধরিলেন

—হায় এ পাষাণ মূর্তি—অটল অসাড়,
শুনিছে না দেখিছে না, শুদ্ধ চেয়ে আছে,

চেয়ে—চেয়ে—চেয়ে—আছে—স্তব্ধ নির্নিমেষ।
প্রভু! প্রভু! প্রাণেশ্বর!

পা জড়াইয়া ধরিলেন

সদাজী, গুরাজ ও তুশের সহিত কৈকায়ুশের প্রবেশ

তুশ। দেখো মহারাজ!
ঐ দেখো—এই ঘন গাঢ় অন্ধকার,
যাহে ভিন্ন করে শুধু পিঙ্গল বিদ্যুৎ,
এই ঝঞ্ঝা, বৃষ্টি, বজ্রপাত; তার মাঝে
এখনও দাঁড়ায়ে বীর রুস্তম তেমতি!
অঙ্গে ঝরে বৃষ্টিধারা, শুভ্র কেশরাশি;—
যেন সে প্রস্তরীভূত, বাক্যের অতীত,
এক মহা পরিত্যাগ—তাহার চরণে
পতিত রোরুদ্যমানা, সতী, পতিব্রতা,
অভাগিনী পুত্রহারা।

কৈকায়ুশ। রুস্তম! রুস্তম!!—
শুনিছে না দেখিছে না—শুদ্ধ চেয়ে আছে।

তথাপি রুস্তম সেইরূপ প্রস্তরমূর্তিবৎ দাঁড়াইয়া রহিলেন

যবনিকা

ষষ্ঠ দৃশ্য

স্থান—হস্তিনার প্রাসাদ অন্তঃপুরে ভীষ্মের কক্ষ।

কাল—জ্যোৎস্না রাত্রি

অম্বা ও সুনন্দা

অম্বা। কাঁপিছে চরণ, সখি!
সুনন্দা। দৃঢ় কর মন।
অম্বা। কি কহিব যুবরাজে?
সুনন্দা। প্রাণ যাহা চায়!
অবলা নারীর ধর্ম—'গোপন' সতত
'সংযম' তাহার দুর্গ, আত্মরক্ষা হেতু।
কিন্তু যবে এই নারী আক্রমণকারী
বিপরীত জাতিধর্ম রমণীর, সখি!
অম্বা। কিন্তু লজ্জা রমণীর ধর্ম চিরদিন।
সুনন্দা। অতীত প্রহর তার। কি না করিয়াছ?
হইয়াছ শাল্বগৃহে যাচিকা, রূপসী।
নামিয়াছ নরহত্যা-গভীরগহ্বরে।
আর কেন, রাজকন্যা? আক্রমণ কর,
এ যুদ্ধে জীবন পণ।—মন্ত্রের সাধন
অথবা নিধন, সখি।—অন্য পথ নাই।
অম্বা। কিন্তু দেবব্রত ব্রহ্মচারী।
সুনন্দা। সংসারীর
ব্রহ্মচর্য! সারশূন্য সৌখীন সন্ন্যাস;

মাতালের সুরাপানপরিহার, সখি ;
মার্জারের নিরামিষ ব্রত ; কয়দিন
টিঁকে সহচরী !—ঐ আসে দেবব্রত ।
আমি যাই ।

প্রস্থান

অম্বা । সত্য কথা বলিয়াছ, সখি—
সংসারীর ব্রহ্মচর্য ! যদি নাহি পারি
টলাইতে এ প্রতিজ্ঞা, আমি নহি নারী ।

ভীষ্মের প্রবেশ ও অম্বাকে দেখিয়া ভীষ্ম গমনোদ্যত

অম্বা । কোথা যাও, দেবব্রত ? দাঁড়াও । কি হেতু
পলাইছ, দেবব্রত, দর্শনে আমার,
রজনীর আগমনে আদিত্যের ম'ত ?
আমি ঘাতক না দস্যু ? সর্প না শার্দূল ?
ব্যাধি না দুর্ভিক্ষ ?—প্রিয়তম !—ওকি ? কেন
বদনমণ্ডল তব মুহূর্তে সহসা
কালীবর্ণ হ'য়ে গেল ; যেন কোন মহা
আতঙ্কে বিহ্বল !—কেন ? বল, দেবব্রত !
ক'রেছি কি আমি ? কোন্ মহা অপরাধ ?
ভালোবাসিয়াছি মাত্র—আর কিছু নহে ।
ভীষ্ম । কাহিনী তোমার আমি শুনিয়াছি, দেবী—
কিন্তু ক্ষমা কর, দেবী ! আমি ব্রহ্মচারী ।
অম্বা । মিথ্যা কথা, দেবব্রত । তুমি সুকুমার,
তুমি জ্ঞানী, তুমি বীর । কিন্তু তুমি নহ
ব্রহ্মচারী । কেন মিথ্যা বল, দেবব্রত ।

ভীষ্ম। ধরিয়াছি ব্রত।

অম্বা। ভঙ্গ কর। কত ঋষি
মহর্ষি ব্রহ্মর্ষি যুগে যুগে, দেবব্রত,
ঢালিয়াছে নারীর চরণে অনায়াসে
অর্জিত তপস্যা তার। তুমি ঋষি নহ।
মদনবিজয়ী এক শিব শম্ভু—তিনি
মহেশ্বর। তুমি ত ঈশ্বর নহ, প্রভু।
কেহ যাহা পারে নাই তুমি করিয়াছ ?
কামজয় করিয়াছ তুমি, দেবব্রত ?

ভীষ্ম। কামজয় করি নাই। করিতাম যদি,
তোমারে এতই ভালবাসি, কামজয়ী
হইতাম যদি, তবে তোমারে সবলে
আঁকড়িয়া ধরিতাম নিজ বক্ষ মাঝে,
দুগ্ধপোষ্য শিশু সম নিশ্চিন্ত নির্ভয়ে।
হায়, যে নারীর বক্ষ পবিত্র শিশুর
ক্ষারিত পীযূষ উৎস, তাহাই বরিষে
যুবার তৃষিত নেত্রে তীব্র হলাহল।
যাহা দেয় প্রাণ, তাহা প্রাণনাশ করে,
যাহাই প্রচার করে মাতৃত্ব নারীর,
তাহাই কামের দুর্গ! যাহা সৌন্দর্যের
দেবালয়, ভকতির প্রার্থনা-মন্দির,
তাহা লালসার গৃহ—দস্যুর বিবর।
না, না! আমি নহি কামজয়ী। তাই ডরি
আপনারে তাই, ডরি রমণীরে, তাই
মা মা বলে' যার পানে ছুটে যেতে চাই,
স্নেহের পবিত্র তীর্থে তীর্থযাত্রীসম ;

তাহা হ'তে উর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন্ করি,
পলায় যেমতি নর অজগর হ'তে।

প্রস্থানোদ্যত

অম্বা। কোথা যাও, প্রিয়তম! দিও না ভাসায়ে
আমারে অকূল জলে—

জানু পাতিয়া উপবেশন

ভীষ্ম। কাঁদিও না দেবী!
বক্ষ পেতে নিতে পারি বজ্রের আঘাত,
তুচ্ছ করি ক্ষুধাতুর ব্যাঘ্রের গর্জন,
কিন্তু অশ্রুজলে আমি ডুবে গ'লে যাই।
অম্বা—এ কি! আবার এ হৃদয় চঞ্চল!
না, এ প্রবৃত্তিকে আজি করিব নিধন,
তবে আজি ভগিনেরে বসায়ে আমার
হৃদয়ের সিংহাসনে—এ সুলগ্নে আজি
বরিব জননী পদে। উচ্চারিব আজি
মৃত্যুদণ্ড অন্ধ বাসনার; কামনার
করিব নিশ্বাসরোধ; আসক্তির শিখা
নির্বাণ করিয়া দিব—করিব নির্মূল
পাপের কণ্টকতরু!— জননী আমার!

অম্বা। (চমকিয়া) কি করিলে! কি করিলে! নিষ্ঠুর! ঘাতক!
না, না, মানিব না আমি! আমি মানিব না!

পতনোন্মুখী অম্বাকে ধরিয়া

আমি পড়ে' যাই—ধর, ধর, প্রিয়তম।

ভীষ্ম। একি! কাশিরাজ-কন্যা তুমি! শিশু নহ,

তোমারে কি সাজে এই হীন আচরণ!
ফিরে যাও প্রাণাধিকা দুহিতা আমার!
তোমারে জননী পদে ক'রেছি বরণ।
করিও না কলুষিত হীন উচ্চারণে
সংসারের সব চেয়ে পবিত্র বন্ধন এই—
জননী সন্তান।

অম্বা। মিথ্যা কথা, দেবব্রত,
আমি নহি মাতা তব, জননীর
কোন কার্য করি নাই আমি! উচ্চারণে
এমন কি মোহ আছে, যাহা শক্তিবলে
সত্যকে বিলুপ্ত করে?

ভীষ্ম। তুমি কি বুঝিবে?
মাতৃনামে কত শক্তি তুমি কি বুঝিবে?
কত অর্থ—যাহা কোন অভিধানে নাই,
কত সুধা—যাহা নাই ইন্দ্রের ভাণ্ডারে;
কণ্টকশয্যায় রোগী তীব্র যন্ত্রণায়,
যবে 'মা' বলিয়ে ডাকে—অর্ধেক যন্ত্রণা
যেন সে অমৃতহ্রদে ডুবে গলে' যায়।
মাতৃনামে পশু বশ হয়। মাতৃনাম
শোকতপ্ত বক্ষঃস্থল সুশীতল করে;
শ্রবণ-বিবরে বর্ষে স্বর্গের সঙ্গীত।
মাতৃনাম আনন্দে বিহ্বল রসনায়
জড়াইয়া যায়। ইহা তপ্ত ওষ্ঠাধরে
বিকম্পিত হয়। ইহা বায়ুর উপরে
নৃত্য করে। মাতৃনামে ধরণী পবিত্র।
মাতৃনামে ধন্যা হন স্বয়ং ঈশ্বরী।

—মা, দমন কর আজি কামিনীত্ব তব,
দেবী হও। শৃঙ্খলিত কর, মা, দুর্বল
এই স্বেচ্ছাচার তব। ধরায় বরিষ
শান্তির পীযূষধারা। দেখ মা জননী—
তোমার বক্ষের 'পরে জগৎ ঘুমায়!

অম্বা। না, বধির আমি। কিছু পাইনি শুনিতে।
না, না, যাইব না। আজি ডুবিব ডুবিব
অতল নরকে। তবে দেখি শেষবার।
—ঢাকো মুখ অন্ধকারে বিমল চন্দ্রমা।
নক্ষত্র নিভিয়া যাও। বিপুলা মেদিনী
রুদ্ধ কর শ্রবণের দ্বার।

ভীষ্ম। কি বলিছ?

অম্বা দীপ উজ্জ্বল করিয়া দিলেন, পরে অবগুণ্ঠন
উন্মোচন করিয়া দিলেন

অম্বা। চেয়ে দেখ, দেবব্রত।—দেখ।

ভীষ্ম। দেখিতেছি।

অম্বা। কি দেখিছ?

ভীষ্ম। এ ত তুমি নহ। দেখিতেছি
কোন এক উন্মাদিনী সুন্দরী রমণী।
আরক্তিম শুভ্রবর্ণ পূর্ণ গণ্ড দুটি
কামনামদিরা পানে। চক্ষুর জ্বালায়
জ্বলিছে নিরয়বহ্নি। বিম্ব-ওষ্ঠ দুটি
সগরল হাস্যরসে—লালসা—শিথিল।
অভিশপ্ত শ্বেত বক্র গ্রীবা 'পরে আসি',
পড়িয়াছে অলস বিভ্রমে কেশরাশি।

দেখিতেছি যেন এক কাল-ভুজঙ্গিনী
ধরিয়া মানবী মূর্তি। এক প্রলোভন।
রক্তমাংসে আচ্ছাদিত এক সর্বনাশ।
জীবন্ত জাগ্রত এক মহা অভিশাপ।

অম্বা। এসো, প্রিয়তম!—এই দুঃখের সংসার
দুদিন বই ত নয়। ভোগ করো সার।

করধারণ

ভীষ্ম। (হাত ছাড়াইয়া) রমণী! তোমার এই নিষ্ফল প্রয়াস!
ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা এই—অটল অচল।
নহে ইহা ভীরুর ভঙ্গুর অঙ্গীকার।
নহে ইহা যাজ্ঞার তপস্যা সকাম।
ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা ইহা, ত্যাগীর শপথ।
গ্রহ যদি কক্ষচ্যুত হয়; চন্দ্র যদি
অগ্নিবৃষ্টি করে; নক্ষত্র নিভিয়া যায়;
পর্বত ভাঙিয়া পড়ে বালুস্তূপ সম;
শুষ্ক হয় সিন্ধুবারি গোষ্পদের মত;
ভীষ্মের প্রতিজ্ঞাভঙ্গ হবে না কদাপি।
ব্রহ্মাণ্ডের বিবর্তন মাঝে, বিক্ষোভিত
সংসারের আলোড়ন মাঝে, মানুষের
মিথ্যাবাদ মাঝে, এই ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা
অটল উজ্জ্বল, সব নক্ষত্রের মাঝে
যেমতি ভাস্বর স্থির ঐ ধ্রুবতারা।

LYRICS OF IND

দ্বিজেন্দ্রলাল ইংরাজি কবিতাকে আকৈশোর ভালোবেসে এসেছেন। লণ্ডনে গিয়ে তিনি দিনরাত পড়তেন শেলি, বাইরন, টেনিসন ও ওয়ার্ডসওয়ার্থ। বিশেষ ক'রে শেলির প্রেমের স্বপ্ন ও অন্তরাত্মার মুক্তির অভীপ্সা তাঁকে মুগ্ধ করেছিল। এখানে Psalm of Life কবিতাটিতে শেলির শৈলীর প্রভাব খুবই স্পষ্ট। Krishna to Radha কবিতাটিতে খানিকটা ওয়ার্ডসওয়ার্থের ছাপ পড়লেও এখানেও শেলির প্রভাব অনস্বীকার্য—বিশেষ ক'রে তাঁর free love-এর বিদ্রোহী বিষাদ। কিন্তু সেই সঙ্গে ফুটে উঠেছে কৃষ্ণের রাধাপ্রেম—কামগন্ধহীন—যাকে য়ুরোপ অবাস্তব মনে করে। এইখানেই তিনি ভারতীয় আত্মধর্মী। এ-কবিতাদুটির ভাব সম্বন্ধে আর কিছু বলা অনাবশ্যক—কাব্যরসিক সহজেই তার রসগ্রহণ করতে পারবেন ব'লে—কেবল ছন্দ সম্বন্ধে একটি কথা বলব সংক্ষেপে।

এই দুটি কবিতা থেকেই আশা করি ছন্দোবিৎদের কাছে প্রতীয়মান হবে—মাত্র বাইশ বৎসর বয়সেই দ্বিজেন্দ্রলাল ইংরাজি কাব্যভঙ্গি ও ছন্দোরীতিকে আয়ত্ত করেছিলেন কেমন অবলীলাক্রমে—যার ফলে ১৮৮৬ সালে সুদূর লণ্ডনে এক অখ্যাতনাম বিদেশী যুবক ইংরাজি কবিতা লিখে বই ছাপিয়ে Lyrics of Ind নাম দিয়ে Edwin Arnold-কে উৎসর্গ করতে কুণ্ঠিত হয় নি। এ-আত্মবিশ্বাস তাঁর ছিল সহজাত—যেকথা রবীন্দ্রনাথ পরে বলেছিলেন 'মন্দ্র' কাব্যের প্রসঙ্গে।

এডুইন আর্নল্ড্ তাঁর Lyrics of Ind প'ড়ে শুধু যে প্রীত হয়েছিলেন তাই নয়, বলেছিলেন যে ইংরাজি কবিতায় হাত পাকালে দ্বিজেন্দ্রলাল ইংরাজি কাব্যসাহিত্যে স্থায়ী সৃষ্টি করতে পারবেন। কিন্তু স্বয়ং আর্নল্ডের কাছে এত বড় অভিনন্দন পেয়েও দেশে ফিরে যে তিনি ইংরাজি কবিতা লেখা ছেড়ে দিলেন একজন্যে আমার মনে আজও খেদ আছে, কারণ তাঁর ছিল সেই অনন্যতন্ত্র, বলিষ্ঠ প্রতিভা যে স্বভাবে অঘটন-ঘটন-পটীয়সী।

Krishna to Radha ছন্দের অনুভাবেই তিনি পরে মন্দ্রে "রাধার প্রতি কৃষ্ণ" কবিতাটি রচনা করেন। কাব্যরসিকেরা এ দুটি কবিতা পাশাপাশি পড়লে বুঝতে পারবেন কী ভাবে ইংরাজি প্রবহমান মুক্তক ছন্দ তিনি বাংলা অক্ষরবৃত্তে এনেছিলেন—কত সহজে—আর এমন সময়ে যখন মুক্তক ছন্দে কেউই কবিতা রচনা করেন নি।

তাঁর Psalm of Life কবিতাটির মধ্যে যৌবনসুলভ উচ্ছ্বাস একটু বেশি প্রকট হ'লেও এটির মধ্যে দেখা যায় ইংরাজী ছন্দ ও মিলের স্রোতে তিনি কেমন তরতর ক'রে চলতে পারতেন। কিন্তু তাছাড়া আরো দুটি গুণে এ-কবিতাটি উজ্জ্বল—এর বলিষ্ঠ আদর্শবাদ ও আবেগময়ী চিন্তা। পরজীবনে এই আদর্শবাদপ্রবুদ্ধ হ'য়েই তিনি লেখেন তাঁর "ভারত আমার ভারত আমার" গানে—

চোখের সামনে ধরিয়া রাখিয়া অতীতের সেই মহা আদর্শ
জাগিব নূতন ভাবের রাজ্যে—রচিব প্রেমের ভারতবর্ষ।

Lyrics of Ind-এর ভূমিকায় তিনি লিখেছিলেন তাঁর আর একটি আদর্শের কথা :

"My principal object in the composition of the following verses has been to harmonise English poetry with the Indian as they ought to be. Both are beautiful · but while the one is visionary and sensuous, the other is vigorous and chaste ; while the one dreams, the other soars ; whereas the one makes a poetry of religion, the other makes a religion of poetry."

কবিতার মধ্য দিয়ে তিনি বরাবরই চেয়েছিলেন বড় স্বপ্ন, বড় আদর্শকে ফুটিয়ে তুলতে। তাই তো ইংরাজ কবিদের মধ্যে শেলি তাঁর এত প্রিয় ছিল এবং তিনি বিলেতে যেতে না যেতে ইংরাজিতে কবিতা রচনা করতে ব্রতী হয়েছিলেন তাঁর যৌবনের নবীন উত্তম ও উচ্ছ্বাস নিয়ে। তাঁর কবিত্বের যে একটি মূল প্রেরণা ছিল আদর্শবাদ একথাটি বুঝলে তাঁর কবিতার রসগ্রহণ করা একটু সহজ হবে বলেই তাঁর কবিজীবনের প্রথমাধ্যায়ে লেখা ও নিবেদনের

সঙ্গে এ-দুটি মনোজ্ঞ কবিতা পেশ করলাম—আরো এই বিশ্বাসের জোরে যে তাঁর মতন ওজস্বী কবিপ্রতিভার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় বাঙালির ম্লানায়মান মনঃশক্তির দুর্দিনে খানিকটা টনিকের কাজ করবে।

তাঁর নানা গদ্য রচনার মধ্যেও তাঁর স্বতঃস্ফূর্ত কবিশক্তি কী ভাবে আত্ম-প্রকাশ করেছে ভবিষ্যতে তার একটি সংকলনে বাংলার পাঠকগোষ্ঠীর কাছে উপস্থাপিত করার ইচ্ছা রইল। ইতি—

দি. কু. রা.

THE PSALM OF LIFE

No, tell us not, thou dark-browed prophet !
There is a Hell beyond the grave,
Where icy torments glare and torture,
And fiery furies hiss and rave.

After our long and dreary troubles,
After our mortal cares and pain,
O tell us not—more woes are coming,
And we must sigh and groan again.

We are our Father's blessed children,
We shall not taste His vengeful curse :
To blast and doom His own creation
He did not make this universe.

We have above no cruel despot,
To hold in awe a slavish race ;
We have 'midst us a loving Mother,
Clasping all men in her embrace.

Then cringe no more with fawning faces,
Come, with your shivering fears away !
This world with woes is still a garden,
Make life itself a holiday.

Let Love o'erflow your cares and sorrows,
And over the sandy banks the Nile ;
See Holiness in Beauty's glances,
Feel music in the children's smile.

There are no storms in the great blue heavens,
No burning anger scowls above ;
There are but moon and sun and starlight
Radiant with eternal love.

We shall be just through smiles and sorrows,
We shall be loving as we can ;
No iron rule, dictate or justice,
Our law be : "Love for Fellow-man."

No deluge, plague, no snake, no famine,
Frowns, nor vindictive glares above
Can win our love, though they may menace :
Love only can command our love.

Come, let us make our brethren happy,
And they will make us happy then ;
Come, let us make the earth a heaven,
Make angels of our fellow-men.

No better heaven, than when men love us,
And when we love our brethren well ;
A life both hating and deserted,
Why, that is torment—that is Hell !

We, armed with love, in justice armoured,
Defy hell-fires, plagues and dearth ;
Whilst Science triumphs, Beauty blazes,
We all can make a heaven of earth.

KRISHNA TO RADHA

Forget ?—can I forget the ambrosial love
That gleams even as a star through the haze of years ?
Forget the love more precious than the wreath,
Strung with a starlight out of Angels' tears ?

Can I forget life's proudest, sweetest hours ?
Ah no, although to remember them would cost me
many a tear ;
Oh still it is a luxury to weep,
When I recall that music of our souls
Careering through the golden atmosphere.

Why did I love thee ?—when I knew too well
There was a gulf between us and that thou couldst
never be mine !
O chide me not—for wert thou not to me
Sweet as a dew-drunk rose, so charming, beautiful, divine ?

Should Dawn forget her beauty and complain
That the clouds, blest with her smile, should stay
rapt in her maddening glance ?
And should the *champak* frown that murmurous bees
Should still besiege her with their tales of love's romance ?

O chide me not ! Didst thou not love me, too,
And say I would be thy soul's star, thy joy for ever ?
Whenever we would part, didst thou not weep,
Turn pale ?—did not thy voice, love, with a poignant
sorrow quiver ?

—Why did we love, and drink the honeyed poison ?
Why did the sunlight stream into Hope's cottage
and with dreams the hamlet fill ?
Why did the thrush make music through the
woodlands ?—
If 'twas to plunge them back into a deeper,
gloomier silence still ?

Do we complain ?—do not the sun-lit hours
Of our speechless love still shine out through
our gloomy vacancy ?
Ah, yes ! I yet could build a palace high
With their diffused, reflected rays, and dream away
a life of care and misery.

We love, we weep !—Are not our very tears
Luminous with the beams—now withered, dead
—whereon they lay ?
Are not the sighs still redolent of the rose
They kissed before it died away ?

Still, still I think—was it a dream ?—
thou by my side,
The glistening dew, the perfumed jasmines,
smiled o'er by the benignant heavens above ?—
A thousand harps vibrating through the calm
With the united beating of our hearts, and a whole
Paradise concentrated in a kiss of love ?

Oh, I was sailing on a golden cloud
Woven out of the perfumed mist
and sunshine, music and delight ;

But the tyrant Wind swept it away :
Hushed was the sylvan song, the transport died,
and ebbed the orient light ;

Ah ! weepest thou ?—yes, thou hast cause to weep,
As I have too—it is a sin to cause thy tears, meseems ;
Yet weep : thy fertile tears will sow the earth
With fragrance, felicity and dreams.

—I only loved thee ; for that they have flung
At me their poison-darts of slanderous lies ;
Because my love has not been of the flesh,
Because it has not been enslaved by marriage-ties.

Love is not marriage, for it soars above
The worldly, finds a heaven in the radiant clouds of Dawn ;
Love breaks the social bars of wealth and rank,
Brings near the sundered souls, and harmonises all
she smiles upon.

She binds the distant ages, distant climes ;
She blends the races and faiths remote
as Pole from Pole ;
Repeals all thoughts of wedded interests :
Love is the concord of the heart, the music of the soul.

—Come, come my love ! my own sweet Radha ! come
The evening melts away ; hushed is the distant chant
of the woodland choristers ;
The roseate clouds have darkened : come to me !
Earth is being strewn with rare and lucid pearls,
and the heavens with stars.